প্রকাশ করেছেন—
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস, (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ১৩৬২

ছেপেছেন—
পি. কে. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস, (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

বৈষ্ণব পদাবলী

বৈষ্ণব পদাবলীর সংজ্ঞা

চতুর্দশ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া দীর্ঘ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব ধর্মভিত্তিক যে বিপুল গীতি সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারকে রঙে রসে বর্ণে গন্ধে পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাকে সাধারণভাবে বৈষ্ণব পদাবলী বলা যেতে পারে। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া এই আশ্চর্য পদাবলী সাহিত্য বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ইহার স্বর্গীয় সুরের ইন্দ্রজাল স্পর্শে তাহাদের দেহমন যে ভাবে মাতাইয়া রাখিয়াছে, তাহা বাস্তবিক তুলনারহিত। অন্য কোন সাহিত্য এইরূপ জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বজন মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় নাই। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় "বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য। পূর্বরাগ, উক্তি প্রত্যুক্তি, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান, নির্হেতুমান, প্রেমবৈচিত্র্য, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাসন্তীলীলা, বিরহ, পুনর্মিলন, প্রেমের এই বহুবিভাগের পর্যায়ে পর্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস; ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ, বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী সাহিত্য তাহাদের অশ্রুর ইতিহাস।"

"বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে। তাহা ভক্ত সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা নদীর মোহনার সহিত তুলিত হইতে পারে, এই গীতি কুলকুল স্বরে মানবজগতের সুখ দুঃখের কথা গাহিতে গাহিতে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পৌছায় যেখানে সমস্ত সীমার বাঁধ চলিয়া যায়। সীমাবদ্ধ দুই পারের মধ্যে চলিয়া এমন স্থানে উপস্থিত হয়, যাহা একেবারে অসীম।"

গীত অর্থে 'পদ' শব্দটির ব্যবহার বেশ প্রাচীনকাল হইতেই করা হইতেছে। আচার্য ভরত-মুনির নাট্যশাস্ত্রে গীত অর্থে পদ শব্দটি ব্যবহৃত। মহাকবি কালিদাস ও তাঁহার 'মেঘদূত' কাব্যে গীতার্থে এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। 'পদাবলী' শব্দটি আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শে 'পদ সমুচ্চয়' বা অনেকগুলি পদ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, মহাকবি জয়দেবই সর্বপ্রথম তাঁহার গীতগোবিন্দম্ কাব্যে 'গীতসমূহ' এই অর্থে পদাবলী শব্দটি ব্যবহার করেন।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥"

মহাকবি জয়দেব শুধু যে এই 'পদাবলী' শব্দটি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে, সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ভাষা ধ্যান-ধারণা ও রূপবর্ণনের গতি-প্রকৃতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট সমগ্র ভারতীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য সাধনার ঋণ অপরিসীম ও অপরিশোধ্য।

বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়বস্তু

প্রধানত যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বিপুল বিরাট বিচিত্র গীতি-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতেছে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। রাধা কৃষ্ণের অমর প্রেমকাহিনী প্রাচীনকাল হইতে বাঙলাদেশের সঙ্গীতে, তাম্রপটে ও বিভিন্ন শিল্পে আপন আসন পাতিয়া লইয়াছিল। ধর্ম সাধনার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া রাধা এবং কৃষ্ণ ধীরে ধীরে কিরূপে সাধারণ মানুষের চারণভূমিতে জাগতিক সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে তাহার পরিচয় আছে। [ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার ঐশ্বর্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া শ্যামস্নিগ্ধ মধুর রূপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, তাহা গীতগোবিন্দের বিখ্যাত পদ 'দেহিপদ পল্লবমুদারং'—ইহার মধ্য দিয়াই প্রতিভাত।] বৈষ্ণব পদাবলী রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার রসভাষ্য। রাধাকৃষ্ণের এই যে প্রেমলীলা-বৈচিত্র্য, ইহাকে অবিমিশ্র মানবিক ভাবিলে ভুল করা হইবে। বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সৎচিৎ ও আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ। তিনিই ঈশ্বর। সৎ, চিৎ ও আনন্দের তিনটি শক্তি আছে। ইহারা যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সন্ধিনী-শক্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। সম্বিৎ-শক্তির দ্বারা তাঁহার চৈতন্যময় সত্তা প্রকাশিত হয়, হ্লাদিনী-শক্তির সাহায্যে তিনি আপন সৃষ্টি-বৈচিত্র্য-আনন্দ আস্বাদন করেন। রাধিকা এই হ্লাদিনী-শক্তির শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাববৃন্দাবনে তাঁহার আনন্দশক্তি রাধিকার সহিত নিরবচ্ছিন্ন প্রেমলীলায় নিমগ্ন। এই প্রেমলীলার মধ্য দিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের আনন্দ-আস্বাদ পান। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও রাধা জীবাত্মা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনে দ্বৈতভাব সম্পূর্ণভাবে কিরূপে বিলুপ্ত হয়, তাহার পরিচয় আছে নিম্নলিখিত বৈষ্ণব পদে—

"ন সো রমণ, ন হাম রমণী—
দুহু মন মনোভাব পেষল জানি॥"

অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের এই নিত্য-প্রেমলীলা ইহারই মানবিক আধারে বিপুল বৈষ্ণব পদাবলী গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বৈষ্ণব পদসাহিত্যে এই হিসাবে অসীম রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সসীম রূপায়ণ। বৈষ্ণব সাধকগণ হৃদয়ের চক্ষু উন্মোচন করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস দর্শন করিয়া অপূর্ব সুন্দর পদাবলীর মধ্যে নিজেদের জীবনমুক্তি ঘটাইয়াছেন। এখানে তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে তাঁহারা একটি কঠিন দার্শনিক তত্ত্বকে অলৌকিক কাব্যের রসবস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্মদর্শন

রসতত্ত্ব বৈষ্ণব কবিদের আশ্চর্য প্রতিভার স্পর্শে সর্বজন আস্বাদ্য অলৌকিক কাব্যরসে পরিণত হইয়াছে। দর্শনতত্ত্বের সুকঠিন তুষার পর্বত অতিক্রম করিয়া অনন্ত রসসমুদ্রের তীরে উত্তরণ—ইহাই বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর স্বরূপ নির্ণয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন "অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও অসীম, এবং আকাশেই সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়া অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানব মনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই অসীম প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভব নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমও নাই। সঙ্গীহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করিতে চায়—প্রেমের জন্য। ব্রহ্মের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে—সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।"

বৈষ্ণব পদাকর্তাগণ অপ্রাকৃত ভাববৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণন করিয়া কাব্যে তাহার রসরূপ দিয়াছেন। সেই জন্য বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য উপজীব্য প্রেম। বৈষ্ণব কবিগণের প্রধান ধর্ম প্রেমধর্ম। যে প্রেম জগৎ ও জীবনের সুনির্দিষ্ট ছকবদ্ধ বাঁধাধরা পথে অগ্রসর হয় না, যে প্রেম কোন জাগতিক বাধাবিঘ্ন মানে না, যে প্রেম একান্ত অবহেলায় স্বর্গের বিপুল সুখসম্ভোগ ঐশ্বর্য পায়ে দলিয়া চলিয়া যায়, যে প্রেমে আত্মসুখের সামান্যতম আভাষ নাই, যে প্রেম প্রতিদানের আশা না করিয়া অবিরত শুধু দান করিয়া চলে, বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম সেই প্রেম। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এই প্রেমই নিজেকে শত সহস্র রূপে অবিরত প্রকাশ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর এই ভাবময় প্রেমরস আস্বাদনে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে—

> "সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
> রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।"

বৈষ্ণব সাধকগণ ভগবানকে ঐশ্বর্যশালী সর্বশক্তিমান ভাবিয়া তাঁহাকে শুধু পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে প্রেমের মধ্য দিয়া হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া লইতে চাহিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই ভক্তের সহিত অভিন্ন। বৈষ্ণবভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের মধ্য দিয়া নানা লীলায় নিরত। বিভিন্ন লীলারসের মধ্যে কান্তা প্রেমাশ্রয়ী মধুর রসের সাধন-ভজনই বৈষ্ণবধর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এখানে ভগবান কান্ত, এবং ভক্ত কান্তা। পতি-পত্নীর সুনিবিড় প্রেমের আলোকে ভগবান ভক্তের সম্পর্কের মূল্যায়ন বৈষ্ণবভক্তগণের এক

আশ্চর্য অভিনব আবিষ্কার। প্রেমের মধ্য দিয়াই তাঁহারা অনন্তকে আস্বাদন করিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের নিঃশেষে নিবেদন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভক্ত ও ভগবানের নিবিড়তম সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সার্থকভাবে বলিয়াছেন "যাহাকে আমরা ভালবাসি তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্যনাম ভালবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।"

বৈষ্ণব পদাবলী ও ধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

বৈষ্ণব পদাবলী রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বৈচিত্র্য প্রকাশক গীতিকাব্য। ইহা একান্তভাবে বৈষ্ণবধর্মভিত্তিক। বৈষ্ণব কবিগণ ছিলেন একাধারে ভক্ত-সাধক ও কবি। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা দর্শন ও ভজন তাঁহাদের ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ। ভক্ত হৃদয়ের আকূতি লইয়া তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেম-লীলা দর্শন করিয়া কবিত্ব প্রতিভার আলোকে স্বকীয় উপলব্ধি পদাবলীর আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পদাবলী আলোচনায় বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহাসিক পট-ভূমিকা ও ইহার প্রধান বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাবের বাস্তব উৎস সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ঋক্‌বেদে বিষ্ণুর নাম পাওয়া যায় সূর্যদেবতা অর্থে। সেখানে বিষ্ণু ও সৌরদেবতা অভিন্ন। নিরুক্তভাষ্যে দুর্গাচার্য লিখিয়াছেন: বিষ্ণুরাদিত্যঃ। শতপথ ব্রাহ্মণেও বিষ্ণু ও সূর্য এক। ঋকবেদের বহু স্থানে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। যথা—

"ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রিধানিদধেপং সমূলহমস্য পাংসুরে
ত্রীনি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্মানি ধারয়ন॥"

শতপথ ব্রাহ্মণে ইহাও বলা হইয়াছে যে ত্রিপাদ অতিক্রম করিবার জন্য বিষ্ণুর ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। তাহার ফলে ক্রুদ্ধ দেবতাদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও দেবতারা কৌশলে তাঁহাকে হত্যা করেন। তাঁহার বিচ্ছিন্ন মস্তক আকাশে সূর্যরূপে শোভমান। তৈত্তিরীয়, আরণ্যক ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে এইরূপ উপাখ্যান আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিষ্ণুকে দেবতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারীরূপে দেখা যায়। এই উত্তরীয় আরণ্যকে বাসুদেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাসুদেব আর বিষ্ণু কিন্তু এক নহেন। বাসুদেব বৃষ্ণি বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইনিই কৃষ্ণ। পাতঞ্জলের মহা-ভাষ্যেও কৃষ্ণের অপর নাম বাসুদেব "অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ এবং জঘান কংসম্ কিল বাসুদেবঃ।"

বেদে 'বিষ্ণু'র নাম পাওয়া গেলেও 'বৈষ্ণব' কথাটি নাই। মহাভারতের শেষ পর্বেই বৈষ্ণব শব্দটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই শব্দটি দ্বারা বিষ্ণুভক্তকে বুঝানো হইয়াছে। অধ্যাপক ভিনটারনিজের মতে, মহাভারত খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে সম্পাদিত। মনে হয়, সুপ্রাচীন ভাগবত

ধর্ম এই সময়ে বৈষ্ণব ধর্মে রূপান্তরিত হয়। গুপ্তযুগে গুপ্ত সম্রাট্‌গণ নিজেদের 'পরম ভাগবত' নামে অভিহিত করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে তাহাদের 'পরম বৈষ্ণব' উপাধির অধিকারী দেখা যায়।

ভাগবত ধর্মের মূল উৎস অস্পষ্ট। এই ধর্মের অন্য নাম সাত্বত বা একান্তিক ধর্ম। দৈবকীপুত্র এবং ঋষি ঘোর আঙ্গিরস শিষ্য কৃষ্ণ-বাসুদেব যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই—ভাগবত ধর্ম। এই ধর্মের মূল প্রেরণা যে সূর্যোপাসনা, মহাভারতের শান্তিপর্বে তাহার উল্লেখ আছে :

"সাত্বতম্ বিধিমাস্থায়
প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্ ॥"

সর্বপ্রথম মথুরাতে এই ধর্ম খৃষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে প্রচারিত হয়। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' রচিত হয়। ইহার মধ্যে 'বাসুদেবক' ও ভাগবত ধর্মের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে গুপ্ত যুগে ভাগবত ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। তবে দক্ষিণ ভারতে এই ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল বেশী। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে তৃতীয় শতক পর্যন্ত ভাগবত ধর্মের ইতিহাস অস্পষ্ট। গুপ্ত রাজত্ব হইতেই ভাগবত ধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ভাগবত ধর্ম প্রচারে গুপ্ত রাজাদের বিরাট ভূমিকা ছিল। গুপ্তযুগে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর্ মধ্যে অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়া বিষ্ণুকে ভগবান এবং কৃষ্ণকে তাঁহার অবতাররূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা ও পূজা পদ্ধতি এই সময়ে প্রচলিত হয়। পঞ্চম শতকে গুপ্তরাজত্বের পতন হয়। এই সময়ে ভাগবত ধর্ম বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। নবম শতকের প্রারম্ভে ভাগবত ধর্ম বেশ শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা শুধু পশ্চিম ও মধ্য ভারতে নহে, দক্ষিণ ভারতেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের আলবার সম্প্রদায়ের আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভাগবত ধর্ম এখানে বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে। কালক্রমে ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। যথা—ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্মহীন। ইহাদের সকলের উপাস্য দেবতা বাসুদেব, নারায়ণ ও বিষ্ণু। কৃষ্ণ ইহাদের কাহারও উপাস্য নহে। পরবর্তীকালে ভাগবত ধর্ম প্রধান চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। যথা, শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও সনক। পদ্মপুরাণে ইহাদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকো বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥"

কৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ। বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার উল্লেখ আছে। সুপ্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, কৃষ্ণ ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। তিনি দেবকী পুত্র। এখানে কৃষ্ণ মানব মাত্র। জৈন উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে ও ঘত জাতকে কৃষ্ণকে মানবরূপে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গীতায় তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়াই বৃষ্ণি রাজপুত্র বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণ আঙ্গিরসের নিকট হইতে যে সাত্বতবিধি-শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাই তিনি গীতায় অর্জুনকে শিক্ষা দিয়া দেন।

এখন প্রশ্ন ওঠে: উপনিষদের কৃষ্ণ এবং পরবর্তীকালের পুরাণ মহাকাব্যের লীলাময় কৃষ্ণ কি এক? ম্যাক্সমুলার ইহাদের অভিন্নত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। ম্যাকডোনেল ও কীথ এই মতের পরিপোষক। তাহাদের মতে উভয় কৃষ্ণের চরিত্র ও আচার আচরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। উপনিষদে কৃষ্ণ মানব, কিন্তু পুরাণ মহাকাব্যে কৃষ্ণ ঈশ্বরীয় সত্তার প্রকাশ। কিন্তু তাহাদের মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ প্রথমত উপনিষদ ও কাব্য উভয়-স্থানেই কৃষ্ণ দেবকী পুত্র। দ্বিতীয়ত উপনিষদে কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরসের নিকট হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, গীতায় তাহাই অর্জুনকে শিক্ষা দিয়াছেন। তৃতীয়ত পুরাণ ও কাব্যের স্থানে স্থানে কৃষ্ণের আদি মানব পরিচয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। চতুর্থত উভয় ক্ষেত্রে কৃষ্ণের অপর নাম অচ্যুত। এই সমস্ত এবং অন্যান্য আরও নানাভাবে প্রমাণ করা যায় উপনিষদের মানব কৃষ্ণ ও পুরাণ কাব্যের ঈশ্বর কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। কৃষ্ণ আদিতে মানব ছিলেন। পরবর্তীকালে তাহার উপর দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছিল।

কৃষ্ণের আবির্ভাবকালের জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদের বিবরণ গ্রহণ করাই শ্রেয়। প্রাক্-বুদ্ধ গ্রন্থ কৌষীতকি ও কথক সংহিতায় আঙ্গিরসের উল্লেখ আছে। জৈন ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী কৃষ্ণ দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমির সমসাময়িক। অরিষ্টনেমি ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের পূর্ববর্তী। পার্শ্বনাথ খ্রীঃ পূঃ ৮১৭ অব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহারও পূর্ববর্তী সময়ে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। এই সম্পর্কে যে কাহিনীগুলি প্রচলিত সেগুলি মনে হয় বৈদিক সাহিত্য হইতে আহৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণ ভাগবত বা একান্তিক ধর্মতত্ত্ব আঙ্গিরসের নিকট শিক্ষা করিয়া পরবর্তীকালে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম সাত্বত বংশ এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে যাদব নামে উপজাতির মধ্যে ইহার ব্যাপক প্রচার হয়। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আগমন করিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহা হইতে জানা যায়, পুরাকালে শৌরশেনোই নামে ভারতীয় একদল উপজাতি হেরাক্লাশ নামে এক ব্যক্তিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। 'মেথোরা' ও 'ক্লেইশোবরা' নামে তাহাদের দুইটি বৃহৎ নগর ছিল। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন 'শৌরশেনোই' বলিতে সাত্বতদের বোঝানো হইয়াছে। হেরাক্লাশ সম্ভবত বাসুদেব কৃষ্ণ। মেথোরা মথুরা এবং ক্লেইশোবরা কেশবদেব যাহা কৃষ্ণের জন্মস্থান বলিয়া অনুমিত হয়।

কৃষ্ণ ও বাসুদেব যে অভিন্ন ছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে। বাসুদেব প্রকৃত নাম, কৃষ্ণ গোত্র উপাধি। বাসুদেব কৃষ্ণ কবে যে নারায়ণ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন হইয়া গেলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছু জানা যায় না। ইহাদের সম্মিলনের বিবরণ সর্বপ্রথম তৈত্তিরীয় আরণ্যকে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানি সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে রচিত। মনে হয় ঐ সময়েই নারায়ণ বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ এক হইয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইহা

হইয়াছে। মহাভারতে ইহার পরিচয় আছে। এখানে সভাপর্বে প্রকাশ্যভাবে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক সত্তা অস্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের শেষপর্ব—বনপর্বে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক সত্তা স্বীকৃত। এখানে কৃষ্ণ কপট নহেন। এখানে তিনি ব্রাহ্মণবন্ধু। ব্রাহ্মণগণ যেরূপ কৃষ্ণকে স্বীকার করিয়া লইলেন, ভাগবতগণও সেইরূপ নারায়ণ বিষ্ণুকে ঈশ্বররূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কুষাণ প্রস্তরলিপি ও গুপ্ত সম্রাটদের বিভিন্ন শিলালিপি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

[রাধার আবির্ভাব সম্পর্কে 'রাধাতত্ত্বে' ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে]

বৈষ্ণব পদাবলী বিবর্তনের ধারা

বৈষ্ণব পদাবলীর বিবর্তন ধারা অনুসারে ইহাকে প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবসাহিত্যরূপে চিহ্নিত করা যায়। উভয় যুগের বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রাক—চৈতন্য ধারা : জয়দেব : বড়ু চণ্ডীদাস

প্রাক-চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের উৎস অনুসন্ধান নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। বাঙলাদেশে যথার্থ কোন্ সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। আর্যেতর বাঙালী বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, প্রস্তর, বা প্রাণীকে দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানে পূজা করিত। প্রধানতঃ ভয় হইতেই বাঙালীর এই ধর্ম-মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বাঙলা-দেশে আর্য-সংস্কার প্রবর্তিত হইবার পর হইতে তাহার ধর্ম-বিশ্বাসের রূপ-পরিবর্তনের ইশারা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে, চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্তের (৩৪৯—৩৭৫ খৃঃ) বিজয়াভিযানের ফলে বাঙালাদেশে 'ভাগবত' ধর্মের বীজ রোপিত হয়। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্বতে প্রাপ্ত লিপিতে জানা যায়, চতুর্থ শতাব্দীর বাঙালী রাজা চন্দ্রবর্মা বিষ্ণু পূজক ছিলেন। তবে এই বিষ্ণু সম্ভবতঃ বৈদিক বিষ্ণু। সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙলা দেশে কৃষ্ণ বাসুদেব পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। পাহাড়পুরের যমলার্জুন ভঙ্গ, কেশীবধ, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক যে সকল মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বাঙলাদেশে কৃষ্ণ-পূজা তথা বৈষ্ণবধর্মের বহুল প্রচলন ঘটিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা লক্ষণসেনের রাজত্বকালে মহাকবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দম্ কাব্যের মধ্যেই সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রূপটি ধরা পড়িয়াছে এবং সেই সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের একটি চিত্র পাওয়া গিয়াছে। এই গীতগোবিন্দম্ কাব্যের মাধ্যমেই বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ আলোকসম্ভবা রাধার আবির্ভাব ঘটিল। বৈষ্ণব ধর্মে রাধার আবির্ভাব অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। কৃষ্ণের মত তাঁহার কোন ঐতিহাসিক পরিচিতি নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন অর্বাচীন পুরাণে বিভিন্নভাবে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, কিন্তু রাধার কোন উল্লেখই নাই। ব্রহ্মপুরাণেই সর্বপ্রথম

রাধার অস্পষ্ট রূপভাস পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার সর্বপ্রথম স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়—

"এতস্মিন্নন্তরে তত্র সকামঃ সুরতোন্মাচঃ
স্বস্থাপ রাধয়া সার্দ্ধং রতিকল্পে মনোহরে॥
শৃঙ্গারাষ্টপ্রকারাঞ্চ বিপরীতেতিকং বিভুঃ।
নখদন্তকরনাঞ্চ প্রহারাঞ্চ যথোচিতং॥"

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ দশম শতকেরও পরবর্তীকালে রচিত। সুতরাং কৃষ্ণের তুলনায় রাধার আবির্ভাব অত্যন্ত অর্বাচীন। হয়ত বাঙলায় বৈষ্ণবধর্মের উপর শক্তি ধর্মের প্রভাব পড়িবার ফলে কৃষ্ণের শক্তি স্বরূপিণী রাধার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে রাধা কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নহে। সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব রস সাহিত্যে রাধার সর্বপ্রথম আবির্ভাব ও উজ্জ্বল রসের মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মে তাঁহার প্রতিষ্ঠা।

বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্যে জয়দেব ও গীতগোবিন্দের স্থান

বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায় মহাকবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দম্ কাব্যে। এই কাব্যটি তৎকালীন সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃত রচিত হইলেও পরবর্তীকালের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ও বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতের উপর ইহার প্রভাব অসামান্য। কবির জন্মস্থান বর্ধমান বীরভূম সীমান্তস্থিত অজয় নদী তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী গ্রাম। পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী ও পত্নী পদ্মাবতী। জয়দেব ও পদ্মাবতীকে কেন্দ্র করিয়া অনেক গল্পকাহিনী প্রচলিত।

গীতগোবিন্দের পরিচয় শুধু যে অপূর্ব কাব্যহিসাবে, তাহা নহে বৈষ্ণবগণের নিকট ইহা শাস্ত্রগ্রন্থ রূপেও পূজিত। অনেক বৈষ্ণব ইহাকে বৈষ্ণব ভক্তি রসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিরাট একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। চৈতন্যদেবের তিনশত বৎসর পূর্বে যে কাব্য রচিত হইয়াছে, তাঁহার উপর চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তি রসশাস্ত্রের প্রভাব কিরূপে থাকিতে পারে? গীতগোবিন্দ রচনার পশ্চাতে যে বিশেষ কোন ধর্মদর্শন বা ধর্মবিশ্বাস ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। জয়দেব যথার্থ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী। তাঁহার শিল্পী হৃদয় কোন নূতন সৃষ্টির যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উপাদানের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল এবং পরিশেষে রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলাকেই তৎকালে প্রচলিত কাব্যিক উপাদান সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া ইহার মধ্যে আপন হৃদয়বেদনা মুক্তির ইঙ্গিত পাইয়া ইহাকে কাব্যের বিষয়বস্তু করিয়া লইয়াছিলেন।

ভারতীয় জীবন-যুগসন্ধিক্ষণে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সংস্কৃত তখন বহুব্যবহৃত সর্বভারতীয় ভাষা। ইতিপূর্বে এই ভাষায় অসংখ্য কাব্য নাটক শাস্ত্রাদি রচিত হইয়াছে। তাই নবাগত প্রতিভাবান শিল্প সাধকগণ এই বহু ব্যবহৃত ভাষায় কাব্যসৃষ্টির উৎসাহ না পাইয়া নবসৃষ্ট বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাকে আশ্রয় করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া তখন এই

নূতন সৃষ্টির প্রাণচাঞ্চল্য। বাঙলা দেশেও এই জাতীয় ভাবোদ্দীপনা হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া ছিল না। তাহার হৃদয়কোষেও তিল তিল করিয়া নূতন ভাবচেতনার মধুবিন্দু সঞ্চিত হইয়া চলিয়াছে। প্রাকৃতের খোলস পরিত্যাগ করিয়া শ্যামস্নিগ্ধ বাঙলা ভাষার নবজন্ম ঘটিয়াছে। ঠিক এমনি সময়েই অমিত শিল্প প্রতিভার ঐশ্বর্য ভাণ্ডার দুই হস্তে ধারণ করিয়া জয়দেবের আবির্ভাব ঘটিল। হৃদয়ে তাঁহার নবসৃষ্টির ভাবোন্মাদনা—সম্মুখে জনপ্রিয় রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনীর আদর্শ। হৃদয়ের রূপরসানুভূতিকে কাব্যাকারে রূপদান করিতে তিনি বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। নবজাত বাঙলাভাষা ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত শক্তি তখনও অর্জন করিতে পারে নাই। জয়দেব তাই সর্বভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কাব্য রচনা করিলেন বটে, কিন্তু প্রচলিত সংস্কৃত ছন্দোরীতির মধ্যে অন্ত্য ও মধ্যস্থানীয় মিল প্রবর্তন করিয়া তাহার মন্থরগম্ভীর ধ্বনির মধ্যে 'নূপুর নিক্কণের দ্রুতাবর্তিত ধ্বনিতরঙ্গের' সৃষ্টি করিয়া আপন ভাবাবেগের উপযুক্ত ভাষা নির্মাণ করিলেন।

জাতীয় যুগসন্ধিক্ষণে বাঙালীর ভাবমানসে যে নবচেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল, জয়দেব তাহার প্রথম সার্থক রূপকার। হৃদয়বৃত্তির সৌকুমার্য, গভীর সৌন্দর্যদৃষ্টি, ভাবাবেগ প্রবণতা এবং বৈরাগ্যমণ্ডিত আধ্যাত্মরসপিপাসা বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এই সকল জাতীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঙালী আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছিল। নবজাত বাঙলা ভাষার পক্ষে বাঙালীর সেই জীবন সমুদ্রমন্থিত ভাবতরঙ্গরাশিকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। জয়দেবকে তাই একান্ত বাধ্য হইয়াই সংস্কৃত ভাষায় বিচিত্র ঘট আশ্রয় করিতে হইয়াছে; কিন্তু তথাপি প্রতিমুহূর্তে তাঁহার হৃদয় নিঃসৃত ভাবরাশি এই বিচিত্র ঘটকে ছাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। জয়দেবের ক্ষেত্রে ভাষা আধার মাত্র, আধেয় নহে। জয়দেব ভাষাকে আবিষ্কার না করিলেও জীবনকে আবিষ্কার করিয়া বাঙালীর সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে অসীম সম্ভাবনার নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন। তাই জয়দেবের একমাত্র সত্য পরিচয়, তিনি বাঙালীর জাতীয় জীবন চেতনার প্রথম সার্থক কবি।

চৈতন্যদেবের নিকট জয়দেবের কাব্য যে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল তাহার প্রমাণ নিম্ন শ্লোকে—

> "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ
> এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥"

চৈতন্যদেবের এই গীতপ্রিয়তার মূলে কোন বিশেষ বৈষ্ণবদর্শন ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। অপূর্ব কাব্যরস আস্বাদনের আনন্দ লইয়াই তিনি গীতগোবিন্দের রসাস্বাদন করিতেন। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-রূপের পটভূমিকায় তাঁহাকে পূজা করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার পশ্চাতে জয়দেবের কোন বিশেষ ধর্মকর্ম জাগ্রত ছিল না। কাব্যখানি একান্তভাবে তাঁহার বিরাট মহৎ শিল্পকর্ম। ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার শিল্পীহৃদয়ের সার্থক মুক্তি আসিয়াছে।

গীতগোবিন্দে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের প্রাধান্য। কৃষ্ণ এখানে সর্বশক্তিমান প্রভু।

তাঁহার প্রবল শক্তিমত্তা সম্পর্কে বারংবার সচেতন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনকি রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিহ্বল আবেগের মধ্যেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ প্রকটিত। ইহাতে মনে হয়, জয়দেবের সমকালীন বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে কৃষ্ণকে ঐশ্বর্যশালী ঈশ্বরের প্রতীকরূপে আরাধনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ঐশ্বর্য-রূপের নিবিড়ঘন পত্রান্তরাল হইতে মাধুর্যরূপের নবোদ্ভাসিত সূর্যকিরণের উঁকিঝুঁকি লক্ষ্য করা যায়। গীতগোবিন্দের বিখ্যাত পদ 'দেহি পদপল্লব মুদারম্'— ইহার মধ্য দিয়া এই সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিংবদন্তী এই: জয়দেব এই পদ রচনার পূর্বে অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং এই অবসরে পদটি সম্পূর্ণ করিয়া যান। এই কিংবদন্তি হইতেই যে প্রকৃত সত্যটুকু উদ্ধার করা যায়, তাহা হইল: কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ বর্ণনা করিতে করিতে জয়দেবের চিত্ত মাধুর্যরূপের জন্য তৃষিত হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে তৎকালীন সংস্কার অনুসারে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের সীমানা অতিক্রম করিতেও ভরসা পাইতে-ছিলেন না। তাঁহার এই দোলায়িত দ্বিধাগ্রস্ত মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' পদটিতে। অবশেষে তাঁহার নিকট সংস্কারের চেয়ে হৃদয়ের দাবীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হৃদয়রূপী কৃষ্ণ আসিয়া ভক্তের হাত হইতে লেখনী গ্রহণ করিয়া অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার সকল দ্বিধাসংকোচ ঘুচাইয়া দিলেন। আপনার ঐশ্বর্যরূপের কিরীটরশ্মিবিমণ্ডিত উন্নত মস্তক রাধাপ্রেমের মাধুর্যরূপের নিকট চিরতরে বিসর্জন দিলেন। ঐশ্বর্যরূপের উপর মাধুর্যরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য সমুদ্রের জন্য মাধুর্যময় ভক্তিভাবের উৎস প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

সংস্কৃত শ্লোকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ইহার গাঢ়বদ্ধ সীমায়িত সুষমা। ভাবপ্রবাহ প্রতি শ্লোকের মধ্যে স্থির সংহত সৌন্দর্যে বিরাজিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দে প্রতি সর্গের সমাপ্ত শ্লোকসমূহে সংস্কৃত শ্লোকের বৈশিষ্ট্যসূচক সীমায়িত গাঢ়বদ্ধ সুষমা যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য শ্লোকগুলির সীমারেখা ভাবাবেগ প্রাবল্যে যেন বিলুপ্তপ্রায়। ইহার মধ্য দিয়াই বাঙলা পয়ার আবির্ভাবের পূর্বাভাষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবি যেসকল ক্ষেত্রে হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে উদ্দাম হইয়া সঙ্গীত তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছেন, সে সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃত ছন্দোবন্ধন কোনক্রমেই তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত মন্তব্যে জয়দেবের কাব্যমূল্য যথার্থ নিরূপিত "শ্লোক বন্ধন হইতে হৃদয়াবেগের মুক্তি ও শ্লোকের অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর সাধন—ইহাই জয়দেবের কবিপ্রকৃতির প্রধান উপাদান। সংস্কৃত ছন্দকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উহার চরণের মধ্যে অন্ত্য ও মধ্যস্থানীয় মিল প্রবর্তন করিয়া উহার মন্থর গম্ভীর গতির মধ্যে নূপুর নিক্কণের দ্রুতাবর্তিত ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। পয়ার ত্রিপদী ও আধুনিক বাঙলা কবিতায় পরীক্ষিত নানা বিচিত্র ছন্দের সূচনা তাঁহার কাব্যে মিলে। গীতি কবিতার উচ্ছ্বসিত সুর প্লাবনকে তিনিই প্রথম নূতন ছন্দোবন্ধন স্থিররূপ দিয়াছেন। এই বহিরঙ্গের পরিবর্তন গভীরতর অন্তরানুভূতির পরিবর্তনের প্রতীক এবং প্রতিরূপ। অভিনব ছন্দোবৈচিত্র্যের পরিকল্পনা তখনই কবির মনে জাগে,

যখন অজ্ঞাতপূর্ব নবরহস্তের বিস্ময়মণ্ডিত ভাবানুভূতি তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়া বহিঃ নিষ্ক্রমনের পথ খোঁজে। রসের নূতন আবেদন, অন্তর মধ্যে ভাবের বিচিত্র-সঞ্চরণ-লীলাই নব ছন্দোময়ী বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দিক দিয়া জয়দেব কেবল যে নূতন ছন্দের প্রবর্তক তাহা নহে, বাঙালীর নূতন মনোজগৎ, অনুভূতি ও রূপানুরাগের বৈশিষ্ট্যেরও সূচনা করিয়াছেন তিনি।"

বৈষ্ণব ধর্ম সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্যের আবির্ভাব ও প্রভাব

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও কর্মপ্রবাহ শুধু বাঙলা দেশের নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এই একজন মানুষ যেরূপ সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, অন্য কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "চৈতন্য ধর্মের ভাবপুষ্ট বাঙ্গালী জাতি যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার জীবনযাত্রায়, তাঁহার কর্মে ও মনন চিন্তনে, তাঁহার কাব্য-সাহিত্যে, তাঁহার সমাজ আদর্শ সংগঠনে ইহার প্রভাব অক্ষয় হইয়া আছে। পৃথিবীর কোন এক ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া এত ভক্তির উচ্ছ্বাস, এত ভালবাসার আত্মীয়বোধ, দেবত্বের এত নিকট স্পর্শ, অন্তরের এত আলোড়ন, কবিত্বের এত অফুরন্ত নির্ঝর, অলঙ্কার, দর্শন ও বিবিধ রচনায় এমন আশ্চর্য মনন শক্তি, ধর্ম চেতনার এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানের এমন আশ্চর্য সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। গৌরাঙ্গলীলা যেমন একদিকে আমাদের জীবনকে ঊর্ধ্বায়িত করিয়াছে, তেমনি আমাদের বাস্তব চেতনা ও ইতিহাসবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া আমাদের দিনলিপি (diary) 'জীবনী (bioaraphy) প্রভৃতি নানা নূতন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করিতেও প্রেরণা দিয়াছে। তাহা ছাড়া চৈতন্য-যুগে যত অধিক সংখ্যক কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছে, কাব্যের সঙ্গে ধর্মানুভূতি ও কল্যাণ সাধনের যত নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এমন আর কোন যুগে সম্ভব হয় নাই। দুই শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীর কণ্ঠে যত গান ধ্বনিত হইয়াছে, তাঁহার ধর্মপ্রচার ও সমাজ সংগঠনে যত উৎসাহ দেখা গিয়াছে, তাহার মনন শক্তির যত বিচিত্র প্রকাশ তাহার অন্তর ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই। সুতরাং চৈতন্যের যুগকে বাঙালীর সাহিত্য ও সমাজ জীবনের স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

এই বিরাট লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন অসামান্য ব্যক্তিত্বপ্রধান পুরুষের জন্ম হয় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের দোল-পূর্ণিমায়। তাঁহার পিতার দেওয়া নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র। পরিচিত-মহলে তিনি নিমাই নামে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে অনন্যসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। মেধার সহিত যুক্ত হইয়াছিল অসামান্য দুরন্তপনা। শোনা যায় তাঁহার দুরন্তপনার অত্যাচারে নবদ্বীপবাসীগণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিক্ষা শেষে তিনি একখানি টোল খুলিলেন এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও হৃদয়গ্রাহী অধ্যাপনার জন্য চতুর্দিকে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। এই সময় লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিছুদিন পর সর্পদংশনে

লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার কিছুকাল পর তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার ফলে তাঁহার জীবন সাধনায় দেখা দিল গুরুতর পরিবর্তন—সুগভীর ঈশ্বর চিন্তা তাঁহার সকল হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। "তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধির গর্ব, সমস্ত বিসর্জন দিয়া ধ্যান-তন্ময় দিব্যভাব বিভোর হইয়া পড়িলেন ও ঐশীলীলার স্ফুরণ তাঁহার বাস্তব চেতনাকেও অভিভূত করিল। তিনি সব সময় ও সর্বত্র রাধাকৃষ্ণ-লীলার বিচিত্র বিকাশ অনুভব করিতে লাগিলেন ও সমগ্র জগৎ তাঁহার নিকট এই লীলা-রসে অভিষিক্তরূপে প্রতিভাত হইল। শেষ পর্যন্ত তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণের সঙ্কল্পে স্থির হইলেন ও মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সমস্ত জগতের পাপতাপ দূর করিয়া ভগবৎ-প্রেম-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জন দিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই নূতন নাম গ্রহণ করিলেন এবং এই নামেই তিনি বৈষ্ণব জগতে পরিচিত।"

ইহার পর শুধু নিরবচ্ছিন্ন কর্মসাধনার ইতিহাস। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আচণ্ডালে প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী ছিলেন। নিজ জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনার যে দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি আপন আচরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৫৩৩ খৃঃ তাঁহার লোকান্তর ঘটে। তাঁহার তিরোভাব সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। এ সম্পর্কে সঠিক করিয়া কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নাই।

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলা দেশের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দেশের মধ্যে ছিল মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির অপ্রতিহত প্রভাব। অত্যাচার অবিচার উৎপীড়নের সীমা ছিল না। কখন যে দুর্দম রাজরোষ কিরূপে কাহার উপর আসিয়া পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে অত্যাচারী রাষ্ট্র-শক্তির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥"

রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারে এবং উচ্চবর্ণের গোঁড়ামিতে দেশের লোকের মনে সংশয় এবং অবিশ্বাস দেখা দিয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর লোক নানাবিধ সুবিধার জন্যে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কোন সুচিন্তিত দার্শনিক মতবাদের উপর জনগণের ধর্মবোধ জাগ্রত ছিল না। হিন্দুধর্মের নামে যাহা চলিতেছিল, তাহা অন্ধ কতকগুলি আচার আচরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

"ধর্ম কর্ম করে সভে এই মাত্র জানে
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজনে।"

মোটের উপর ধর্মের মধ্যে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেমের চিহ্নমাত্র ছিল না। বাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এই দারুণ বিকৃত ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্য হইতে জন্ম লইলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য। মাত্র সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার আশ্চর্য কর্ম-প্রতিভায় দেশের সর্বত্র যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়া দিলেন, তাঁহার কোন তুলনা নাই। উদার মানবিকতার উপর ধর্মের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হইল। সমস্তপ্রকার কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অন্ধ আচার আচরণ ইত্যাদি পরিহার করিয়া মানবপ্রেমকে ধর্মের একমাত্র মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করা হইল। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষে মানুষে যে দুরন্ত ব্যবধান ছিল, চৈতন্য-প্রচারিত প্রেম-ধর্মের বন্যায় তাহা ভাসিয়া গেল। সমাজের উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে সাম্যের ভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। বাস্তবিক বাঙলাদেশের মত বিচিত্র জাতিধর্ম অধ্যুষিত স্থানে চৈতন্যদেব যে ভাবে সামাজিক সংস্কারে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। বৈষ্ণব দর্শনকে তিনি ঢালিয়া নূতন সাজিয়া এমন করিয়া গড়িয়া দিয়াছিলেন যাহার উদার ছত্রতলে লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধ-বণিতা বিনা দ্বিধায় আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিত বাঙলার ধর্ম-সমাজ-দর্শন-চিন্তাধারা যে বিপুল প্রাণবন্যার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় তুলনা নাই।

চৈতন্যের আবির্ভাবের অন্যতম অবদান

বাঙলা ভাষার আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠালাভ। প্রাকৃতের আবরণ হইতে বাঙলাভাষা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার বিকাশের পথে নানা অন্তরায় দেখা দিয়াছিল। প্রতিভাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহাদের কাব্য এবং শাস্ত্রালোচনার জন্য প্রধানতঃ সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। বাঙলা ছিল তাহাদের নিকট বহুনিন্দিত ভাষা। এই কারণেই প্রাক চৈতন্য যুগে বাঙলাভাষায় লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা অতি নগন্য। চৈতন্যদেব সর্বপ্রথম মাতৃভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার প্রেমধর্ম এই ভাষাতেই প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দও এই বাঙলাভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের ধর্ম-দর্শন-সম্পর্কীয় মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শুধু দার্শনিক ব্যাখ্যা নহে, অনেকে তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টি কার্যেও বাঙলাভাষাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। মাতৃভাষাকে ভাবপ্রকাশের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিবার ফলে চৈতন্য সাহিত্যের মধ্যে যে স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং চৈতন্যদেব এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দই যে বাঙলাভাষার মুক্তি আনিয়া তাহার বলিষ্ঠ ক্রমবিকাশের পথটি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই বাঙলাভাষাকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব সাধক কবিগণের অন্তর্হৃদয়ের ভাবরাশি যে কাব্যধারা সৃষ্টি করিয়া বাঙলা সাহিত্যকে সম্পদশালী করিয়া তুলিল, তাহা পদাবলী সাহিত্য। বস্তুত পদাবলী সাহিত্য চৈতন্য আবির্ভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। প্রাক-চৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে ব্যক্তিগত আবেগ-

অনুভূতি জাত শিল্পরসসৃষ্টির প্রয়াস অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অনেক-ক্ষেত্রেই কবিদের ব্যক্তিগত কামনা বাসনা বা প্রেমচেতনার আলোকে প্রাক-চৈতন্য বৈষ্ণব সাহিত্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর ভাবজীবনে যে আধ্যাত্মিকতার স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহা প্রচলিত পদাবলীর সাহিত্যকে অপূর্ব রঙে রসে রূপে রেখায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিল। চৈতন্যোত্তর পদাবলী রূপ ছাড়িয়া অপরূপের দিকে অভিসার করিয়াছে, ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া অতীন্দ্রিয় চেতনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় "চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমরচনায় শিল্পচিত্তের একটা তদগত আন্তরিকতার পরিচয় নিবিড় এই ব্যক্তিগত প্রেম তন্ময়তাই জয়দেব-বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদ সাহিত্যের মূলীকৃত সত্য। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে যে প্রেম সত্য ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে মাত্র গুহায়িত হয়েছিল—ব্যক্তিগত সীমাতিক্রমী উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ছাড়া যার কোন দ্বিতীয় নিয়ামক ছিল না—চৈতন্যজীবনের সাধনা এবং প্রচারের ফলে তাই একটা বৃহত্তর ধর্মগত উপলব্ধির পটভূমিকায় 'সার্বজনীন' যদি নাও হয়, তবু বহুজনীন রূপ পরিগ্রহ করে।"

চৈতন্যদেবের জীবন সাধনা রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার জীবন্ত তত্ত্বব্যাখ্যা। তিনি নিজের জীবনের মধ্য দিয়াই ভগবৎভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রাধাভাবের সাধক। তাঁহার-সুকুমার স্বর্ণকান্ত তনুসুষমা ও অপরূপ লীলাময় সাধনার জন্য তাহাকে 'রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রাধাভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। মেঘ দর্শনে কৃষ্ণের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া ভাবাবেশে তিনি আকুল হইয়া উঠিতেন। যমুনাতীরের কুঞ্জবনগুলি তাঁহার মনে অপূর্ব রসাবেশ সৃষ্টি করিত। কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য উন্মত্তের মত যেখানে সেখানে ছুটিয়া যাইতেন। চৈতন্যের এই দিব্যোন্মাদনা তাঁহার সহচরবৃন্দ বার বার দর্শন করিয়া নানাভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মুরারী গুপ্ত, নরহরি সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষের রচনার মধ্যে চৈতন্যের যে রসমূর্তির চিত্র পাওয়া যায়, প্রধানতঃ তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই চৈতন্যের বৈষ্ণব কবিবৃন্দ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মধ্যে অভিনব পবিত্র আধ্যাত্মিকতার মৃদঙ্গধ্বনি তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে রাধার পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ, ভাবসম্মিলন, প্রভৃতি অঙ্গগুলি চৈতন্যদেবের-ভাবলীলার আলোকেই রূপায়িত হইয়াছে। চৈতন্যদেব আপন জীবনসাধনার মধ্যে যেগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, চৈতন্যোত্তর কবিগণ নিজেদের কাব্যতুলিকায় তাহাদেরই নিখুঁত কাব্যরূপ দিয়াছেন।

চৈতন্য আবির্ভাবের ফলে বাঙলা সাহিত্যে তথ্যানুস্মৃতি ও ইতিহাস চেতনার উন্মেষ ঘটিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ইতিহাস ও সমাজ চেতনার মধ্যে ধর্মগত উদ্দেশ্য এত প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল যে তাহাদের মধ্য হইতে যথার্থ যুগ পরিচয়টি উদ্ধার করা যায় না। চৈতন্যের লোকোত্তর জীবনলীলা দেশের লোকের মনে এরূপ বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল যে সকলেই তাহার জীবনের সকল বিষয় জানিতে আগ্রহী হইয়া পড়িয়াছিল। এইভাবে চৈতন্যের জীবনী রচনায়

মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যে চরিত শাখার উদ্বোধন ঘটে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "চৈতন্য প্রভাবে বাঙালীর মানসক্ষেত্রে যে সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহারই ফলে বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম তথ্যানুসন্ধিৎসা ও ইতিহাস চেতনার উন্মেষ দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র মাধুর্য ও দিব্যলীলা প্রকটনের দ্বারা জাতির মনে এরূপ গভীর রেখাপাত করেন যে এযাবৎ ইতিহাস বিমুখ বাঙালী তাহার জীবনের ঘটনাবলী ও অলৌকিক অনুভূতিসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রেরণালাভ করে।···সেই জন্য বলা যায় চৈতন্য ও তাঁহার মুখ্য পরিকরবৃন্দের—জীবন-চরিতই বাঙলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক চিত্রাঙ্কনের প্রথম প্রয়াস।" চৈতন্যের জীবনী গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল সংস্কৃতে রচিত মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত, কবি কর্ণপুরের মহাকাব্য চৈতন্যচরিতামৃত ও নাটক চৈতন্য-চন্দ্রোদয়। বাঙলাভাষায় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবৎ, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল জীবনী গ্রন্থ তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের পরিচায়িকা হিসাবেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যের আবির্ভাব বৈষ্ণব ধর্ম সাহিত্যেই নহে, বাঙলার সর্বস্তরের ধর্ম সাহিত্যেই তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চৈতন্যোত্তর মঙ্গল সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রেই মানবিক বোধসম্পন্ন। হিংস্র দেবদেবীগণ চৈতন্যদেবের উদার-মানবিকতার প্রভাবে তাঁহাদের হিংসাপ্রবৃত্তি অনেক সময়ই প্রকাশিত করিয়াছেন। অনুবাদ শাখার মধ্যেও চৈতন্য প্রভাব সুস্পষ্ট। রামায়ণাদি অনুবাদ গ্রন্থসমূহের অনেক বিরোধী চরিত্র বিরোধের মধ্যে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে দেখা যায়। মোটের উপর এই কথাই বলা চলে, শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর দিব্যমহিমা পূর্ণ জীবনলীলার প্রভাবে বাঙলা ভাষা-সাহিত্যে সমাজক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তিভূমি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই চৈতন্যদেব বৈষ্ণবদর্শনের নূতন ব্যাখ্যা করেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের মূল বক্তব্য: জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদও নাই, অভেদও নাই। ইহাদের সহিত ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, তাহার মাধ্যমে অভেদের মধ্যে ভেদ ও ভেদের মধ্যে অভেদের নিত্য প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ইহাদের সম্পর্ক জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্ক। জ্ঞাতা জ্ঞেয়র সহিত অভিন্ন হইয়া তাহাকে জানিতে পারে না বলিয়া পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় না। ফলে উভয়ের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ভেদাভেদ থাকিয়া যায়।

ব্রহ্ম এই জগৎ এবং জীবলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইহাদের আশ্রয় স্বরূপ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি স্বতন্ত্র। "এই জগৎ ও জীব ঈশ্বরের ভোগের ও জ্ঞানের বিষয় হইয়া অনাদিকাল ইহারই মধ্যে রহিয়াছে। অনন্ত

ব্রহ্মার সকল প্রকাশ, সকল রূপ ও রসের বিচিত্র মূর্তিকে অতীত ও বাহ্যিক বলিতে সৃষ্টির আদিতে অব্যক্ত অবস্থায় চলিয়া যাইতে হয়। অব্যক্ত যখনই আপনাকে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, সেই প্রকাশের সেই ব্যক্তের জগতেই জ্ঞানের ও আনন্দের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে যাহা, সেই অসীম অনন্ত মহাশূন্য ব্যোমের কথা শুধু তত্ত্ব মাত্র। তাহার সহিত আমাদের জীবনের কোন যোগ নাই। এই তত্ত্ব অব্যক্ত ও অনন্ত। এই অব্যক্ত ও অনন্তই জীব ও জগতের নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। ইনি আনন্দস্বরূপ, কাজেই ইহার সৃষ্টির সব কিছুই আনন্দময়। এই ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানময়, ইহাই বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ আর তাঁহার সৃষ্ট জীব ও জগৎ তাঁহার প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তিনি একা ভোক্তা আর জীব ও জগৎ অনুক্ষণ তাঁহার নিত্যলীলার আয়োজন রচনা করিতেছে। এইজন্যই বিশ্বের একমাত্র পুরুষ তিনি।"

জীব ও জগৎকে সাধারণভাবে প্রকৃতি বলা যায়। এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান ও পূর্ণানন্দ বিকশিত হইতেছে। পরম-পুরুষের আকর্ষণে প্রকৃতি নিত্যকাল ধরিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছে। "ব্যক্ত ও অব্যক্তের নিত্যলীলাই পুরুষ প্রকৃতির লীলা। অব্যক্ত আমাদের কাছে তত্ত্বমাত্র কিন্তু তিনি যখন ব্যক্ত হন আমরা তখন তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। একদিকে বিশ্বের পরমপুরুষ আর একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি অর্থাৎ তাহার সৃষ্টি। এই দুই বস্তু ভিন্ন নহে, আবার অভিন্নও নহে। ইহাদের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক, ইহা অচিন্ত্য, মানববুদ্ধির অতীত। ইহাই বৈষ্ণবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তির স্থান সর্বোচ্চে। একমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। পার্থিব সকল প্রকার সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে দেহমন সমর্পণ করিবার নাম ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান একমাত্র এই ভক্তিরই বশ। তাই চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"শাস্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভজি॥"

কিংবা— "প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥" (চৈঃ চ. মধ্যলীলা)

বৈষ্ণব দর্শনে রাধা মহাপ্রকৃতি-স্বরূপা। তিনি জীব ও জগতের প্রতীক। তাঁহার সহিত পরমপুরুষের অবিশ্রান্ত লীলা চলিতেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক প্রাণ ভরিয়া পুরুষ প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণ রাধার নিত্যলীলা আস্বাদন করিয়া তাহাদের জীবন সার্থক করেন। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। সকল জীব ও জগৎ প্রকৃতি। সুতরাং বৈষ্ণব সাধক-মাত্রই প্রকৃতির অংশ।

ইহারাই সখী নামে পরিচিত। ইহাদের একমাত্র কাম্য : রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদন। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য ইহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখপায়॥"

রাধাতত্ত্ব

কৃষ্ণের মতো রাধা ঐতিহাসিক চরিত্র নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতো অর্বাচীন পুরাণেই তাহার প্রথম আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাগবতে "অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ' শ্লোকে রাধা নাম থাকিলেও তাহার দ্বারা কৃষ্ণশক্তি রাধার কথা বোঝায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে রাসের বিবরণে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, সাহিত্য সৃষ্টির খাতিরে সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব রস সাহিত্যে রাধার আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং উজ্জ্বল রসের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তাহাকে বৈষ্ণব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের উপর শাক্ত ধর্মের প্রভাব পড়িবার ফলে কৃষ্ণের শক্তিস্বরূপিণী রাধার কল্পনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, কৃষ্ণের তুলনায় রাধার আবির্ভাব যে অত্যন্ত অর্বাচীন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে তাহাকে যে নূতন করিয়া আবিষ্কার করা হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাক চৈতন্য বৈষ্ণব সাহিত্যে যে রাধা ছিলেন, চৈতন্যদেব আপনার ভক্তি দর্শনের আলোকে তাহাকেই নূতন করিয়া সৃষ্টি করিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নানা আশ্চর্য লীলাশক্তির অধিকারী। তাঁহার শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) স্বরূপ শক্তি (২) তটস্থা বা জীবশক্তি (৩) মায়া শক্তি। স্বরূপ শক্তি হইতেছে সেই শক্তি যাহার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন অস্তিত্ব বজায় রাখেন। অনন্ত কোটি জীবও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। ইহারা ভগবানের শক্তি হইতে সৃষ্ট। সুতরাং ইহারাও শক্তি। যে শক্তি দ্বারা ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মায়াশক্তি। তিনি মায়াশক্তির অধীন নহেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায় (১) সৎ (২) চিৎ (৩) আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ। সৎ-এর শক্তির নাম সন্ধিনী—ইহার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণ আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছেন। চিৎ-এর শক্তি সম্বিৎ—ইহার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যময় সত্তাটি প্রকাশিত হইতেছে। আনন্দের শক্তির নাম হ্লাদিনী—ইহার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়া তাহা আস্বাদন করিবার জন্য বহুধাবিভক্ত হন। হ্লাদিনী শক্তির সাহায্যে ভগবান প্রকৃতির সহিত বিচিত্র লীলায় মত্ত হন। সুতরাং এই আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত শক্তি। সৎ চিৎ ও আনন্দের মূর্ত প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। তিনিই নরাকারে স্বয়ং ভগবান।

আর ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী রাধা প্রভৃতি সখীবৃন্দ কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির মানবীরূপ। রাধা হইতেছেন হ্লাদিনীর সার অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠা শক্তি। চৈতন্য-চরিতামৃতে রায় রামানন্দ রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥"

এই রাধাই মহাভাবস্বরূপা হ্লাদিনীর সার—

"হ্লাদিনীর সারাংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরানী॥"

অন্যত্রও বলা হইয়াছে—

"অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান॥"

রাধার মহিমা প্রকাশে চৈতন্যদেবের অবদান অবিস্মরণীয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধা প্রেম আস্বাদনের জন্য মর্তে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রাধার ভাব কান্তি নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া। এইজন্য চৈতন্য 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত'। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তিনি একদেহে রাধা ও কৃষ্ণ। তিনি ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত। নিজের জীবনসাধনায় অসংখ্যরূপে তিনি রাধারূপে আশ্চর্য কৃষ্ণভক্তির স্বর্ণস্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ বলে নাচে কাঁদে হাসে অনুক্ষণ
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।"

শ্রীরাধার পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ, প্রভৃতি ভাবগুলি চৈতন্য সহচর বৃন্দ বারবার তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া বিরহের ভাবটি তাঁহার মধ্যে অতি করুণভাবে প্রকাশ পাইত—

"কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক কদম্ব॥
হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারি বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥"

সুতরাং রাধার কৃষ্ণভক্তির তাৎপর্য চৈতন্যদেবের মাধ্যমে সকলে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব না হইলে এই অতুল কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে কিছুই জানা যাইত না। এই কথা স্মরণ করিয়া প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক বাসুদেব বলিয়াছেন—

"রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানিত কে॥"
মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরীসার।
বরজযুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥"

গোপীতত্ত্ব

মহাভারতে কৃষ্ণের বিভিন্ন কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইলেও গোপীবৃন্দের সহিত রাসলীলার কোন বর্ণনা নাই। মহাভারতে গোপী অনুপস্থিত। মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে প্রাপ্ত 'হল্লীষ' শব্দটি হইতে টীকাকারগণ মনে করেন; 'হল্লীষ' ক্রীড়া রাস ছাড়া অন্য কিছুই নহে। হরিবংশে গোপীদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহারা সমাজ সংসারের বন্ধন তুচ্ছ করিয়া তাহাদের কান্ত কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন—

"এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলংকৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমু দে সুখী॥" (২৯৩৫)

হরিবংশের পর রচিত ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে, ভাগবত পুরাণে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে গোপীদের স্থান খুব উচ্চে। ইহারা রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার দর্শিকা ও সহায়িকা। ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা গোপীবৃন্দ রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা আস্বাদন করিয়া তাহা মধুরতর করিয়া প্রকাশ করেন। রাধাকৃষ্ণ লীলা দর্শনই ইহাদের একমাত্র কাম্য। নিজেদের সুখ ইহারা কামনা করেন না। সখীবৃন্দ রাধার 'কায়ব্যূহ'-স্বরূপ। সখীহীন রাধা অসম্পূর্ণা। চৈতন্য চরিতামৃতে তাই বলা হইয়াছে—

"রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তাঁর পল্লব পুষ্প পাতা॥···
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম॥"

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব

চৈতন্যদেব ও রায় রামানন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু সম্পর্কিত যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সাধ্য-সাধন তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা যায়।

রায় চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রায় রামানন্দ 'সাধ্য' নির্ণয় করিতে সুরু করিলেন। প্রথমে তাঁহার বক্তব্য—

"রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়।
প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর॥"

রামানন্দ এক এক করিয়া কৃষ্ণে সমার্পণ, স্বধর্মত্যাগ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রপত্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞান শূন্যভক্তিকে সাধ্যবস্তুরূপে উল্লেখ করিলে মহাপ্রভু ইহাদিগকে 'এহোবাহ্য' বলিলেন। তারপর রামানন্দ যখন বলিলেন—

"রায় কহে প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার।
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ সার॥"

এইবার চৈতন্যদেব 'এহো বাহ্য' না বলিয়া 'এহো হয়' বলিলেন। অর্থাৎ অনুমোদন করিলেন মাত্র। কিন্তু স্বীকার করিলেন না। রামানন্দ তখন দাস্য প্রেমকে সর্বকাব্যসার বলিলে মহাপ্রভু তাহাও অনুমোদন করিলেন।

কিন্তু ইহার চেয়েও সাধ্যবস্তু কি? রামানন্দ একে একে সখ্যপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম, কান্তাপ্রেমের উল্লেখ করিলেন। 'কান্তাপ্রেম' মহাপ্রভুর নিকট 'সাধ্যাবধি'। অর্থাৎ সাধ্যের সীমা।

"প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥"

তখন—

"রায় কহে, ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব-শাস্ত্রেতে বাখানি।"

রামানন্দের নিকট চৈতন্যদেবের এই জিজ্ঞাসা অতিশয় বিস্ময়কর। কারণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত ভাবিয়া তাঁহার সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে। এই সেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥"

এবং রাধার কৃষ্ণপ্রেম সাধ্যশিরোমণি। রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সার। কৃষ্ণ আপন সৃষ্টি মাধুর্য আস্বাদনের জন্য রাধার সহিত নিত্যলীলায় রত। রাধা একান্তভাবে কৃষ্ণপ্রেমময়। রায় রামানন্দ বারবার রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন—

"রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥"

সুতরাং এই 'রাধাপ্রেম' শুধু সর্বসাধারণ নহে, ইহা সাধ্য শিরোমণি। ইহাই চরম পুরুষার্থ। ইহা জীবের মধ্যে সুপ্তভাবে রহিয়াছে। কেবলমাত্র কঠোর সাধনা দ্বারা ইহার জাগরণ সম্ভব। অতএব জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধনা সাপেক্ষ। এই ভাবেই সাধ্য সাধন নির্ণয় শেষ হইল—

"প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে
সেই সব বস্তুতত্ত্ব হইল মোর জ্ঞানে॥
এবে সে জানিল সাধ্য-সাধন নির্ণয়।"

রাগাত্মিকা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি

গোপীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণে দেহমন সমর্পণ করিয়াছে। তাহাদের কৃষ্ণপ্রেম সাধনা দ্বারা অর্জিত নহে। ইহা জন্মগত। তাহাদের আত্মার মধ্যে এই অতুল কৃষ্ণপ্রেমের অস্তিত্ব। গোপীদের এই কৃষ্ণভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তি নামে পরিচিত। ভাগবতে ইহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ
পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ
সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"

গোপীর কৃষ্ণভক্তি স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধনালব্ধ। কঠোর সাধনার মাধ্যমে ইহা অর্জন করিতে হয়। গোপীবৃন্দ যে ভাবে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, জীবকুল তাহার অনুকরণে যদি কৃষ্ণকে ভক্তি করে, তবে তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। রাগানুগা অর্থাৎ গোপীর রাগের অনুগামিনী। এখানে গোপী পথপ্রদর্শক, জীব শিষ্য। ইহার সংজ্ঞা দিয়া ভাগবতে বলা হইয়াছে—

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং
ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা
যা সা রাগানুগোচ্যতে।"

বৈধী ভক্তি

শ্রবন, কীর্তন, স্মরণ, পুজন, বন্দন প্রভৃতি শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করিতে হইবে। পরে কৃষ্ণকে দাস্য, সখ্য ভাবে আরাধনা করিয়া করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। ইহাকে বৈধীভক্তি বলে।

কান্তা প্রেম

বৈধী ভক্তির দ্বারা চিত্ত নির্মল হয় এবং সেখানে মধুর প্রেমের আবির্ভাব হয়। তখন কৃষ্ণকে কান্ত ভাবিয়া আরাধনা করিতে হইবে। ইহাই কান্তাপ্রেম।

বৈষ্ণব রসতত্ত্ব

প্রতিটি মানুষ ভাব বা emotion-এর অধীন। মানুষের মনে কত যে ভাবের অস্তিত্ব তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সমুদ্রে যেমন প্রতিনিয়ত অসংখ্য তরঙ্গের অভ্যুদয় এবং বিলুপ্তি ঘটে, মানুষের হৃদয়-সমুদ্রেও সেইরূপ প্রতিনিয়ত অসংখ্য ভাবতরঙ্গের অভ্যুদয় এবং বিলুপ্তি ঘটিতেছে। আলংকারিকগণ এই ভাবরাশির প্রকৃতি অনুসারে ইহাদের 'স্থায়ী ও অস্থায়ী' এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। যে সকল ভাব প্রতিটি মানুষের মধ্যে বর্তমান তাহারা স্থায়ী ভাব। ইহারা চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয়। যে সকল ভাব সকল মানুষের মধ্যে থাকে না, তাহারা অস্থায়ী ভাব। ইহারা অপরিবর্তনীয়। স্থায়ী ভাব নয় প্রকার—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম। অস্থায়ী ভাব অসংখ্য। যেমন—দয়া, মায়া, স্নেহ, হিংসা, প্রভৃতি। স্থায়ী ভাবগুলি মনের মধ্যে বর্তমান থাকে। উপযুক্ত অবস্থায় বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে এক একটি রসে পরিণত হয়। রতি—শৃঙ্গার রস; হাস—হাস্যরস; শোক—করুণ রস; ক্রোধ—রৌদ্র রস; উৎসাহ—বীর রস; ভয়- ভয়ানক রস; জুগুপ্সা—বীভৎস রস; বিস্ময়—অদ্ভুত রস; শম—শান্তরস।

কিন্তু বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ মাত্র পাঁচটি স্বতন্ত্র স্থায়ীভাবের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। যথা: শম, সেবা, বিশ্বাস, বৎসলতা, ও মধুরা। এইগুলি

হইতে যথাক্রমে শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের সৃষ্টি হয়। বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। উপরোক্ত পাঁচভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা যায়। এই পাঁচটি ভাবের পিছনে আছে রতি ভাব যাহার স্বরূপ ভক্তিরস।

(১) শান্তরস—

সাধারণ জীবনে দেখা যায়, মানুষ অমিত তেজসম্পন্ন বা অসীম ঐশ্বর্যশালী পুরুষের মহিমায় বা ঐশ্বর্যে স্বভাবতই মুগ্ধ হইয়া বিনা স্বার্থে তাহাকে ভক্তি করে। ভক্তির বিনিময়ে কোন প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা সে করে না। ইহার নাম শান্তভাবের উপাসনা। বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ অমিততেজসম্পন্ন পরম ঐশ্বর্যশালী পুরুষ। তাঁহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ বিস্মিত বৈষ্ণব ভক্তগণ ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাঁহার পাদপদ্মে দেহ-মন সমর্পন করেন। এ অবস্থায় পারস্পরিক আত্মীয় সম্পর্কের বা স্নেহপ্রীতি আদান প্রদানের কোন কথা ওঠে না। এখানে স্থায়ীভাব 'শম' নামে রতি। যেমন—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওয়ত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওয়ত
সায়র লহর সমানা॥" [বিদ্যাপতি]
কিংবা—"মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥"

নিষ্ঠা এখানে মুখ্য বলিয়া রস শান্ত।

(২) দাস্যরস—

অমিতবীর্যবান্ পুরুষকে প্রভু ভাবিয়া দাসভাবে সেবার মধ্য দিয়া আনন্দ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ অমিতবীর্যবান ঐশ্বর্যশালী পুরুষ। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ নিজেদের দীন দরিদ্র ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দাসের মতো সেবা করেন। এখানে ভগবানে ও ভক্তে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক হইলেও বৈষ্ণব সাধকগণের দৃষ্টিতে ইহা একপ্রকার প্রেম ছাড়া অন্য কিছুই নহে। এখানে শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠার সঙ্গে সেবা যুক্ত হইয়া একটু স্নেহ সম্পর্কের আভাস দেখা দিয়াছে। তথাপি একটি ঐশ্বর্যবোধের ব্যবধান অস্বীকার করা যায় না।

(৩) সখ্যরস—

এ ক্ষেত্রে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে মধুর সখ্যের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমপ্রাণতার মাধ্যমে। ইহার ফলে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যবধান থাকে না। সখাবৃন্দ নানাভাবে কৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করেন আবার কৃষ্ণও অনুরূপভাবে সখাদের সেবা করিয়া আনন্দলাভ করেন। সখ্যরসে স্থায়ী ভাব 'বিশ্রম্ভ' নামে রতি অর্থাৎ সংকোচহীন পারস্পরিক বিশ্বাস। এখানে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের

সেবার সঙ্গে সমপ্রাণতা যুক্ত হইয়াছে। উদ্ধব দাস, বলরাম দাস, যাদবেন্দ্র, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি সখ্যরসের পদ রচনা করিয়াছেন। যেমন—

"কানাই হারিল আজু বিনোদ খেলায়
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আটিয়া বান্ধে—
বংশীবটতলে লৈয়া যায় ॥" [বলরাম দাস]

(৪) বাৎসল্য রস—

বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে আর এক ভাবে ভজনা করেন—এ ভাব সন্তান ভাব। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সন্তান এবং ভক্তের ভূমিকা মাতা বা পিতার। স্নেহ, ভালবাসা, শাসন প্রভৃতি যতগুলি বৃত্তি সন্তানের প্রতি প্রদর্শন করা হয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তগণ সে সবগুলি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আরোপিত হয়। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ এবং প্রয়োজন বোধে শাসনও করেন। এ ক্ষেত্রে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে মধুর স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্থায়ী ভাব এখানে 'বৎসলতা'। যশোদা বাৎসল্যরসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

"বিপিনে গমন দেখি হয়ে সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা মন্ত্র পড়েন আপনি ॥"

(৫) মধুর বা উজ্জ্বল রস—

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে মধুর ভাবের সাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ। চৈতন্যচরিতামৃতে এই সাধনাকে সবসাধ্যসার বলা হইয়াছে—

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেই প্রেমের হইতে—
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥"

এখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তের পতিপত্নীর সম্পর্ক। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমপুরুষ ও ভক্তগণ তাহার লীলাসহচরী পত্নী। উভয়ের প্রগাঢ় প্রেমলীলার মাধ্যমে যে ভগবৎসাধনা হয়, তাহাই মধুর ভাবের সাধনা। সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই মধুর রসের জয়গান। এখানে স্থায়ী ভাব মধুরা নামে রতি। দাস্যে যে ভালবাসার শুরু, মধুরে তাহার পরিণতি। যেমন—

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি,
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি ॥"

মধুর রসের বৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

পরকীয়া তত্ত্ব

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে পরকীয়ার একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। রাধা পরকীয়া যেহেতু তিনি কৃষ্ণমাতুল আয়ানের পত্নী। কৃষ্ণ বাস্তবে তাঁহার নিকট পরপুরুষ। অন্যের পত্নী হইয়া রাধা আশ্চর্য ব্যাকুলতা ও আর্তি লইয়া কৃষ্ণের

প্রেমে আত্মহারা হইয়াছেন। ভগবানের প্রেমে ভক্ত ও পরকীয়ার এই ব্যাকুলতা ও আর্তি লইয়াই আত্মহারা হইবেন, ইহাই পরকীয়ার অন্তর্গূঢ় নির্দেশ।

বৈষ্ণব ধর্মে সকল গোপী পরকীয়া। সামাজিক আদর্শের মানদণ্ডে পরকীয়া প্রেম নিঃসন্দেহে দূষণীয়। কারণ স্বামী বর্তমানে পরপুরুষের প্রতি আসক্তি কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক পুরুষ নহেন। তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিরূপ। রাধা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তির সহিত তাঁহার নিত্য মিলন। বিবাহের মতো একটি সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা এই নিত্য মিলন কখনও নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। তাই রাধা পরকীয়া হইলেও তাহার প্রেম অলৌকিক দৃষ্টিতে বিচার করিতে হইবে। পরকীয়া প্রেমের প্রকৃত তত্ত্ব পরপুরুষে অনুরক্তা কুলবধূ যেরূপ আত্মহারা আকুলতা লইয়া পরপুরুষকে ভালবাসে, ঈশ্বরকে সেইরূপ আকুলতা লইয়া ভালবাসিতে হইবে। বৈষ্ণব দর্শন যে কতখানি নিবিড় ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, পরকীয়াবাদ তাহার প্রমাণ। ঈশ্বরপ্রীতির এত গভীরতায় সম্ভবত অন্য কোন ধর্মই প্রবেশ করিতে পারে নাই। তবে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে নারীগণের 'পরকীয়া' আচরণের নিন্দা করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব

অলঙ্কার শাস্ত্রে, 'রতি' একটি স্থায়ী ভাব। এই ভাব প্রতিটি জীবের মধ্যেই বিদ্যমান। এই রতির ভাব অবলম্বন করিয়া মানুষের মধ্যে প্রেম ও কাম, এই দুটি বৃত্তির স্ফুরণ দেখা যায়। জীবনের উপভোগের উদ্দামতায় রচিত ভাব কামের জন্ম দেয়; এবং জীবন ধারণের স্বাভাবিকতায় প্রেমের জন্ম হয়। উভয়ের মূল উৎস এক। রতির ভাব হইতে শৃঙ্গার রসের সৃষ্টি।

সংস্কৃত কাব্যে প্রেম ও কামের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তাই এখানে প্রেমের বর্ণনার সঙ্গে কবিগণ তাহার উপযুক্ত দৈহিক আবেষ্টনী, আধার ও ভোগ্য উপাচারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এইজন্য সংস্কৃত কাব্যে দেহ-চেতনার প্রাধান্য। সীতাকে হারাইয়া দণ্ডকারণ্যে রামের মন বিশেষ করিয়া পত্নীর সহিত দৈহিক সুখসম্ভোগের স্মৃতিতে ভাবাক্রান্ত। কালিদাসের কাব্যে প্রেমলীলার মধ্যে শৃঙ্গার রসের প্রাচুর্য। কিন্তু খাঁটি বাঙলাভাষায় রচিত কাব্যে যথা পূর্ববঙ্গ গীতিকা বা মৈমনসিংহ গীতিকার মধ্যে প্রেম দেহচেতনাশ্রিত নহে।

বৈষ্ণব ধর্মসাধনায় কাম ও প্রেমের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা হইয়াছে। চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

> "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
> কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
> কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
> কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য হয় প্রেম প্রবল॥"

যেখানে সম্ভোগের মাধ্যমে নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করা হয়, সেখানে কামের অস্তিত্ব। আর যেখানে ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গসুখের-মাধ্যমে আনন্দ পাইবার ইচ্ছা, সেখানে প্রেমের জন্ম হয়। বৈষ্ণবগণ কামকে অস্বীকার করেন নাই।

কামকে তাঁহারা দৈহিক কামনা বাসনার প্রতীকরূপে না দেখিয়া দেহস্পর্শহীন নির্মল পবিত্র অনুভূতিরূপে দেখিয়াছেন। ভগবৎপ্রেমের স্পর্শমণিতে ছোঁয়াইয়া কামের লোহকে তাঁহারা প্রেমের উজ্জ্বল স্বর্ণে পরিণত করিয়াছেন। এই প্রেমের সহিত দেহ উপভোগের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা একান্ত দেহচেতনা বহির্গত পবিত্র দিব্যানুভূতি। বৈষ্ণব কবিসাধকগণ তাহাদের পদাবলীর মাধ্যমে এই প্রেমের জয়গান গাহিয়াছেন—

"রজনী দিবসে হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা॥"

প্রতিটি নরনারীই 'পুরুষার্থ'-বা কাম্যবস্তু প্রার্থনা করে। শাস্ত্রানুযায়ী 'পুরুষার্থ'—ধর্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ—এই চারি ভাগে বিভক্ত। অনেকের নিকট ধর্মলাভ চরম কাম্যবস্তু। ইহাদের পুরুষার্থ ধর্ম। অনেকে আবার ইন্দ্রিয় উপভোগ জীবনের চরম কাম্যবস্তু মনে করেন। ইহাদের পুরুষার্থ 'কাম'। এই ভাবে জগতের প্রতিটি নরনারী ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের কোন না কোনটি প্রার্থনা করেন। ইহাদের 'চতুর্বর্গ' বলা হয়। কিন্তু বৈষ্ণব সাধকগণ মোক্ষকে চরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন না। তাহারা প্রেমকে পঞ্চম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মনে করেন—

"পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্যরস করায় আস্বাদন॥"

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী, রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর কথোপকথনের ভিতর দিয়া এই সার বস্তুটির স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব ভক্তিরস তত্ত্বে যে পাঁচটি রসের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মধুর রসকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। "কান্তা প্রেম সর্বসাধ্যসার।" রাধা 'সাধ্য শিরোমণি।' তিনি প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। তিনিই মূল কান্তা শক্তি—কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে তিনি দেহ-মন সমর্পিতা। নয়নে তাহার কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য, মুখে কৃষ্ণনাম, শ্রবণে কৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি। তিনিই কৃষ্ণকে প্রেমামৃতের মাধুর্য আস্বাদন করান—

"কৃষ্ণকে করায় শ্যামমধুরস পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব কাম॥"

কৃষ্ণও রাধার প্রেমে মুগ্ধ। রাধার সহিত তাঁহার নিত্য-মিলন। ইহার মাধ্যমেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার আনন্দরূপ আস্বাদন করেন—

"কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥"

রাধাকৃষ্ণের এই অমর অপার্থিব প্রেমলীলা অবলম্বন করিয়াই বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনে প্রেমের লীলাতত্ত্ব-পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের আশ্চর্য প্রেমলীলাবৈচিত্র্যরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমকে

অবলম্বন করিয়া পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ, ভাব-সম্মিলনের—অপূর্ব সুন্দর পদগুলি রচনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। তাই প্রেমের কবিতাগুলি তাঁহাদের হাতে অত সার্থকরূপে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কণ্ঠে সমস্ত কবিগণের প্রেমানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে—

"পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব,
তা বিনু সকলি পর॥"

(গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ)

গোবিন্দ দাস

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥
চঞ্চল চরণ— কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম রতন-ফল বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

গৌরাঙ্গের মেঘের মতো চক্ষে অবিরল অশ্রু বর্ষণ হইতেছে। অবিরাম বারি-বর্ষণে বৃক্ষে বৃক্ষে যেমন মুকুল উদ্গত হয়, গৌরাঙ্গের দেহেও সেরূপ আনন্দরূপ মুকুল উদ্গত হইতেছে। তাঁহার শরীর হইতে ঘর্মধারা মকরন্দের মতো বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার মধ্যে অশ্রু, পুলক, স্বেদ প্রভৃতি সাত্বিক ভাবোদ্গমের সহিত অন্যান্য ভাব কদম্বের মতো প্রকাশিত হইতেছে। কবি কিশোর গৌরাঙ্গকে এক আশ্চর্যরূপে দেখিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন একটি সোনার কল্পবৃক্ষ গঙ্গাতীরে চলিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার চঞ্চল চরণ তলে ভক্তবৃন্দ বিভোর হইয়া ভ্রমরের মতো নানা গুণগান করিতেছে। তাঁহার সুগন্ধে লুব্ধ হইয়া সুরাসুর তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে এবং তাঁহার পদতলে

দিবানিশি অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। গৌরাঙ্গ অবিরত যে প্রেমরত্ন বিতরণ করিতেছেন, তাহাতে পৃথিবীর মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে। কবি গোবিন্দ দাস তাঁহার চরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনহীন মানুষের ন্যায় দূরে পড়িয়া আছেন।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

নীরদ—মেঘ। নীর—জল। ঘন—নিবিড়। সিঞ্চনে—বর্ষণ করিবার ফলে। পুলক—আনন্দ। অবলম্ব—অবলম্বন তরু। স্বেদ—ঘর্ম। মকরন্দ—মধু। চুয়ত—চোয়াইয়া পড়িতেছে। ভাব-কদম্ব—ভাবরূপ কদমফুল। পেখলুঁ—দেখিলাম। নটবর—নৃত্যশীল। গৌর—চৈতন্যদেবের অঙ্গবর্ণ গৌর ছিল বলিয়া তাঁহাকে গৌর বলা হয়। অভিনব—আশ্চর্য। হেম—সোনা। কল্পতরু—কল্পবৃক্ষ। প্রবাদ আছে, এই বৃক্ষের কাছে যাহা প্রার্থনা করা হয়, তাহাই পাওয়া যায়। সঞ্চরু—সঞ্চরণ করিতেছে। সুরধুনী—গঙ্গা। উজোর—উজ্জ্বল। অভিনব হেম⋯সঞ্চরু—চৈতন্যদেবের গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো উজ্জ্বল। ভক্তগণের মনোবাসনা তিনি সর্বদা পূরণ করেন। তাই তিনি কল্পতরুর মতো উদার। তিনি গঙ্গাতীরে যখন চলিয়া বেড়ান মনে হয় যেন একটি সোনার কল্পতরু চলিয়া বেড়াইতেছে। চরণকমল—চৈতন্যদেবের চরণকে পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ঝঙ্করু—গুণগুণ করিতেছে। ভকত-ভ্রমরগণ—ভক্তগণকে ভ্রমরবৃন্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ভোর—বিভোর, মগ্ন। পরিমলে—সুগন্ধে। লুব্ধ—লোভী। সুরাসুর—দেবতা ও দানব। ধাবই—ধাবিত হইতেছে। অহর্নিশি—দিনরাত। রহত—থাকে। অগোর—অজ্ঞান, অচেতন। অবিরত—অবিরাম। প্রেম রতন ফল—চৈতন্যদেব সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমের বাণী যেন রত্নফল স্বরূপ। অখিল—পৃথিবী। মনোরথ—মনোবাসনা। পূর—পূর্ণ হইতেছে। তারে—তাঁহার। রহু দূর—দূরে পড়িয়া আছে।

ব্যাখ্যা

চঞ্চল চরণ কমল-তলে ঝংকরু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥

আলোচ্য অংশটি বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের অন্তর্গত। চৈতন্যদেবের অনুপম সৌন্দর্য ও অসামান্য আকর্ষণী শক্তির পরিচয় এই অংশে পরিস্ফুট।

চৈতন্যদেব প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি আত্মহারা। তাঁহার মেঘবৎ চক্ষু হইতে অবিরাম অশ্রু বর্ষণ হইতেছে। ইহার ফলে তাঁহার সকল অঙ্গে জাগিতেছে পুলক, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবরাজি। কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইয়া তিনি নৃত্য করিতেছেন। চৈতন্যদেব কল্পবৃক্ষের ন্যায় উদার। কল্পবৃক্ষ

যেমন সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করে, চৈতন্যদেবও তেমনি ভক্তগণের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। ভক্তগণ তাঁহার উদারতায় মুগ্ধ। ভ্রমরবৃন্দ যেমন ফুলের উপর বসিয়া মগ্ন হইয়া মধুপান করে, ভক্তগণও, তেমনি তাঁহার প্রচারিত প্রেমভক্তির মধুপান করিয়া বিভোর। তাঁহার উদারতা, সহৃদয়তা ও মধুর রূপে আকৃষ্ট হইয়া দেবদানব তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, এবং তাঁহার পদতলে আশ্রয় লইতেছে।

পূর্বরাগ

চণ্ডীদাস

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়।
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা শ্যামনাম শুনিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। এই শ্যাম নাম তাঁহার কানের মধ্য দিয়া মর্মে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনপ্রাণকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। শ্যাম নামে এত মধু আছে যে তাহা না উচ্চারণ করিয়া থাকা যায় না। এই নাম জপ করিতে করিতে রাধার সর্বঅঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে। এখন শ্যামকে পাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। যাহার নামের প্রভাবেই শরীর মন আচ্ছন্ন, তাঁহার অঙ্গের স্পর্শে যে কি হইবে, তাহা চিন্তাও করা যায় না। তাঁহাকে দেখিবার পর যুবতী ধর্ম রক্ষা করাই কঠিন হইয়া পড়িবে। রাধা বারবার তাঁহাকে ভুলিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ভুলিতে পারেন না। এখন ইহার প্রতিকার কি, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন। চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে শ্যামকে দেখিয়া কুলবতী নারীরা ইচ্ছা করিয়া নিজেদের দেহ-মন উৎসর্গ করে।

শব্দার্থ ও টিকাটিপ্পনী

সই—সখি। শ্যাম নাম—কৃষ্ণ নাম। মরমে—হৃদয়ে। পশিল—প্রবেশ করিল। জপিতে—জপ করিতে। পরতাপে—প্রতাপে, প্রভাবে। ঐছন করল গো—এমন করিল। পরশে—স্পর্শে। যুবতী ধরম—যুবতী নারীর ধর্ম। পাসরিতে—ভুলিতে। পাসরা না যায় গো—কিছুতেই ভোলা যায় না। যৌবন যাচায়—রূপ যৌবন যাচিয়া দান করে।

ব্যাখ্যা

নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥

আলোচ্য অংশটি চণ্ডীদাসের 'পূর্বরাগ' বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে শ্যাম নামের প্রভাবের তীব্রতা বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাধার জীবন শ্যামময়। শ্যামের নাম শুনিয়া তিনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। শ্যাম নাম তাঁহার কানের ভিতর দিয়া একেবারে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। শ্যাম নামের মাধুর্য তাঁহার দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি শ্যাম নাম শুনিয়াছেন, এখন সেই নাম অবিরাম মনের মধ্যে ইষ্ট মন্ত্রের মতো জপ করিতেছেন। শ্যাম নামটি যেন মধুময়। তাই এই নামের আস্বাদনে কোন ক্লান্তি নাই। বারবার এই নাম তিনি মুখে উচ্চারণ করিতেছেন। এই নাম জপ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় যেন ধীরে ধীরে অবশ হইয়া যাইতেছে। পাইবার জন্য গভীর আকুলতা। কৃষ্ণকে কিরূপে পাওয়া যায়, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন। সেই সঙ্গে তাঁহার মনে জাগিতেছে আর একটি চিন্তা। তিনি ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই তো তাহার দেহমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, তিনি যেন আর নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় কৃষ্ণের অঙ্গের স্পর্শে তাহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা তো তিনি চিন্তাও করিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণকে চোখে দেখিয়া যুবতী ধর্ম অর্থাৎ সতীত্ব কিরূপে তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহা তিনি জানেন না।

পূর্বরাগ

চণ্ডীদাস

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকিয়া একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে
কি কহে দু হাত তুলি॥
একদিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী—
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন। তাঁহার অন্তর এখন গভীর এবং ব্যথাপূর্ণ। এই ব্যথা আনন্দের ব্যথা। তিনি বিরলে একাকী বসিয়া থাকেন। কাহারও কোন কথা শোনেন না। সর্বদাই তিনি মুগ্ধচক্ষে মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তাঁহার চোখের তারাও যেন নিশ্চল হইয়া যায়। তিনি আহার ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে রক্তবর্ণ বস্ত্র। তাহাকে দেখিয়া যোগিনী মনে হয়। তিনি ফুলের গাঁথনি খুলিয়া চুলের দিকে তাকাইয়া থাকেন, কারণ- চুলের কালো রঙ কৃষ্ণের গাত্রবর্ণের অনুরূপ। তিনি হাসিমুখে মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকেন। মুখে কি যেন বলিতে থাকেন। ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠে কৃষ্ণের নীলবর্ণ আছে, তাই তিনি তাহাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন। চণ্ডীদাস বলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে যেন এইভাবে নূতন করিয়া পরিচয় হইতেছে।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

অন্তরে—হৃদয়ে। বিরলে—নির্জনে। থাকয়ে—বসিয়া থাকে। একলে—একাকী। ধেয়ানে—ধ্যানে, মনে মনে। নয়ান তারা—চোখের তারা, সদাই ধেয়ানে···পানে—মেঘের রঙ কৃষ্ণের গাত্রবর্ণের অনুরূপ। তাই রাধা মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকেন। রাঙা বাস—লাল রঙের কাপড়। যোগিনী পারা—যোগিনীর মতো। যোগিনী বা রাধিকা লালরঙের কাপড় পরেন। ফুলের গাঁথনি—রাধার চুলের মধ্যে ফুলের সজ্জা আছে। দেখয়ে—দেখে। খসায়ে—খসাইয়া, খুলিয়া। চুলি—চুলের। হাসিত—হাসিতে হাসিতে। বয়ানে—মুখে। একদিঠ—একদৃষ্টি। কালিয়া বঁধু—কৃষ্ণ। সনে—সাথে।

ব্যাখ্যা

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥

আলোচ্য অংশটি চণ্ডীদাস রচিত 'পূর্বরাগ' বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই সঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি রাধার পূর্বরাগের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

রাধা কৃষ্ণকে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছে দারুণ পরিবর্তন। তিনি নির্জনে একাকী বসিয়া থাকেন। লোকজনের সান্নিধ্য তাঁহার আর ভাল লাগে না। কাহারও কথাও তিনি শোনেন না। যেহেতু মেঘের রঙ কৃষ্ণের দেহবর্ণের অনুরূপ, তাই তিনি মেঘের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন। সেই সময় তিনি এতখানি মগ্ন হইয়া যান যে তাঁহার চোখের তারাও যেন নিশ্চল হইয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া তিনি আহারও ত্যাগ করেন। খাদ্যে তাঁহার কোন রুচি থাকে না। তিনি সাধারণ সময়ে নীলশাড়ি পরেন, কিন্তু কৃষ্ণের তপস্যায় তিনি তখন রক্তবর্ণ বস্ত্র পরেন যোগিনীর মতো। তিনি বেণী খুলিয়া ফেলেন। তাঁহার চুলের পুষ্পসজ্জা খুলিয়া ফেলিয়া চুলের রাশির দিকে তাকাইয়া থাকেন। কারণ রঙের সঙ্গে কৃষ্ণের রঙের, সাদৃশ্য আছে। তাহার মুখে মাঝে মাঝে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া ওঠে। হাসি হাসি মুখে মেঘের দিকে তাকাইয়া তিনি যেন কি বলিতে থাকেন।

পূর্বরাগ

বিদ্যাপতি

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাথ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে কৃষ্ণ আহার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, চোখের অঞ্জন ও মুখের তাম্বুল, বক্ষের মৃগমদ চিত্র পাঁতি, গলার হার। তিনি দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার। কৃষ্ণ তাঁহার কাছে পাখীর পাখা, মৎস্যের জল স্বরূপ।

রাধা কৃষ্ণকে গভীরভাবে ভালোবাসিয়াও তিনি যে প্রকৃত কে, তাহা জানিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি বলেন যে রাধা কৃষ্ণ দুইজনেই দুইজনের মতো, অর্থাৎ উভয়ের প্রেম অনন্ত।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

হাথক—হাতের। দরপণ—দর্পণ, আয়না। মাথক—মাথার। নয়নক—নয়নের। অঞ্জন—কাজল। মুখক—মুখের। তাম্বুল—পান। হৃদয়ক—হৃদয়ের। মৃগমদ গীমক—গলার। দেহক—দেহের। সরবস—সর্বস্ব। গেহক—গৃহের। পাখীক—পাখীর। পাখ—পাখা। মীনক—মাছের। পানি—জল। জীবক—জীবের। হাম—আমি। ঐছে—এমন। তুহুঁ—তুমি। কৈছে—কেমন। মাধব—কৃষ্ণ। মোর—আমাকে। দুহুঁ—দুইজনে। হোয়—হয়।

ব্যাখ্যা

পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥

আলোচ্য অংশটি বিদ্যাপতি রচিত পূর্বরাগ ও অনুরাগ শীর্ষক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাধার জীবনে কৃষ্ণের সর্বময়তা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে।

রাধার জীবন কৃষ্ণময়। তাঁহার কাছে প্রিয়বস্তু যাহা কিছু আছে, কৃষ্ণ যেন তাহারই প্রতীক। কৃষ্ণ তাহার হাতের দর্পণ-স্বরূপ। কৃষ্ণের মধ্যে তিনি যেন নিজেকেই দেখিতে পান। মাথার ফুল তাঁহার চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কৃষ্ণ যেন তাহার মাথার ফুল। অঞ্জন তাঁহার চোখের সৌন্দর্য বাড়ায়। কৃষ্ণ তাঁহার চক্ষের অঞ্জন। তিনি তাঁহার কাছে মুখের তাম্বুলের মতো প্রিয়। তিনি তাঁহার হৃদয়ের মৃগমদ চিত্রপাতি, এবং গলার হার। কৃষ্ণকে তিনি তাঁহার দেহের সর্বস্ব মনে করেন। তিনি গৃহের সারস্বরূপ। পাখীর কাছে পাখা যেরূপ প্রিয়, মাছের কাছে জল, জীবের কাছে জীবন, রাধার কাছে কৃষ্ণও অনুরূপভাবে প্রিয়। কৃষ্ণের বাহিরে রাধার কিছুই নাই। কৃষ্ণ তাঁহার বিভিন্ন প্রিয়বস্তুর প্রতীক।

পূর্বরাগ

জ্ঞানদাস

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

সই, কি আর বলিব।
যে পণ করাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাই টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহুলহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

কৃষ্ণের অনুপম রূপসৌন্দর্য দেখিবার জন্য রাধার অন্তর ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়ে। কৃষ্ণের গুণে তাঁহার মন বিভোর হইয়া থাকে। কৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গের জন্য তাঁহার প্রতিটি অঙ্গ তৃষিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণের হৃদয়ের স্পর্শের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া মরে, তাঁহার প্রেমের জন্য তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া ওঠে। রাধা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল। তিনি কৃষ্ণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত। কৃষ্ণের রূপ শতবার দেখিবার পরও যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, বারবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই আশ্চর্য রূপমাধুরী দেখার যে কি আনন্দ, তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার দর্শন ও স্পর্শের জন্য শরীর এলাইয়া পড়িতেছে। কৃষ্ণের হাসিতে যেন মধু ঝরে। তিনি প্রেমের ঠাকুর। রাধা গুরুজন ও পূজনীয়দের মাঝে সখিসঙ্গে বাস করেন। শ্যামের কথা উঠিলেই পুলকে তাঁহার দেহ ভরিয়া যায়। পুলক ঢাকিতে তিনি বহু চেষ্টা করেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে। তখন ঘরের সকলে তাঁহাকে লইয়া নানা কথা বলে। জ্ঞানদাস বলেন যে লজ্জার ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হোক।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

আঁখি—চোখ। ঝুরে—ঝরিয়া পড়ে। আঁখি ঝুরে—চোখ দিয়া জল ঝরে। ভোর—বিভোর। হিয়া—হৃদয়। পরশ—স্পর্শ। পিরীতি—প্রীতি, প্রেম। থির—স্থির। থির নাহি-বান্ধে—স্থির হয় না। পণ—প্রতিজ্ঞা। করাছি—করিয়াছি। আরতি নাহি টুটে—আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। দরশ—দর্শন, দেখা। পরশ—স্পর্শ। আউলাইছে—এলাইয়া পড়িতেছে, অবশ হইয়া যাইতেছে। মধুধার—মধু ধারা। লহু লহু—মৃদু মৃদু। পহুঁ—

প্রভু। পীরিতির সার—প্রেমের ঠাকুর। গুরু গরবিত—গুরুজন ও পূজনীয় জন। পুরয়ে—পূর্ণ হয়। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে। পরকার—প্রকার, কৌশল। অনিবার—অবিরল। যতেক—যত লোক। লাজ ঘরে—লজ্জার ঘরে। আগুনি—আগুন।

ব্যাখ্যা

গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

আলোচ্য অংশটি কবি জ্ঞানদাস রচিত পূর্বরাগ ও অনুরাগ বিষয় পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কৃষ্ণের প্রতি রাধার সুগভীর আসক্তির বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

রাধার জীবন কৃষ্ণময়। কৃষ্ণকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসিয়াছেন। কৃষ্ণের অনুপম রূপমাধুরী ও আশ্চর্য গুণ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণের রূপরাশি এমন অসামান্য যে শতশতবার ইহা দর্শন করিয়াও আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় না। বারবার সে রূপের স্বাদ লইতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণের রূপ-মাধুরী দর্শনে মনের মধ্যে ওঠে এক আশ্চর্য আনন্দের আবেশ। তাঁহার দর্শন ও স্পর্শ সুখলাভের আশায় দেহমন যেন বিবশ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণের আশ্চর্য সুন্দর মুখের হাসিতে যেন মধুধারা ঝরিয়া পড়ে। তিনি প্রেমের ঠাকুর। তাঁহার মৃদু মৃদু হাসিতে সুগভীর প্রেমার্তি ঝরিয়া পড়ে। রাধা গুরুজন ও পূজনীয় মানুষের মধ্যে বাস করেন। সখিরা তাঁহার কাছে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণকথা উঠিলে তিনি আর নিজেকে সংযত করিতে পারেন না। তাঁহার হৃদয়ে ওঠে আনন্দের ঢেউ। আনন্দ গোপন করিতে অনেক চেষ্টা করেন। তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে।

পূর্বরাগ ও অনুরাগ
চণ্ডীদাস

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥

চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নাহিলে সে না দেয় এককণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল॥
কি ছার চকোর-চান্দ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

কবি রাধাকৃষ্ণের মতো অমন গভীর ভালবাসা আর কোথায় দেখেন নাই। একজনের প্রাণ অন্যের সাথে যেন আপনা হইতেই বাঁধা পড়িয়াছে। মিলনের মধ্যে দুইজন বিচ্ছেদের কথা ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেছে। এক মুহূর্তও কেহ কাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। জল ছাড়া মাছ যেমন বাঁচিতে পারে না, রাধাকৃষ্ণ—এক অন্যকে ছাড়া জীবনধারণ করিতে পারে না। মানুষের মধ্যে এমন গভীর ভালবাসা হইতে পারে, এমন কোথাও শোনা যায় না। সূর্য ও কমলের ভালবাসাও এত নয়। হিমের মধ্যে কমল মরিয়া যায়, কিন্তু সূর্য তার মুখের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে। চাতক ও মেঘের ভালবাসার সঙ্গেও এই ভালবাসার কোন মিল নাই। বর্ষাকাল না হইলে মেঘ চাতককে একবিন্দু জলও দেয় না। কুসুম ও রাধাকৃষ্ণের ভালোবাসার তুল্য নহে। ভ্রমর কুসুমের কাছে না গেলে কুসুম মধু দেয় না। চকোর ও চাঁদের ভালোবাসা রাধাকৃষ্ণের ভালবাসার মতো নিবিড় নয়। চণ্ডীদাস বলেন যে পৃথিবীতে এই ভালবাসার কোন তুলনা নাই।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

পরাণে—প্রাণে। বান্ধা—বাঁধা। আপনা আপনি—নিজে নিজে। পরাণে··আপনি—রাধার প্রাণ ও কৃষ্ণের প্রাণ যেন আপনা হইতে একসঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। দুহুঁ—দুইজনে। কোরে—ক্রোড়ে, কোলে। বিচ্ছেদ ভাবিয়া—মিলনের মধ্যেও রাধা এবং কৃষ্ণের প্রাণ বিচ্ছেদের কথা ভাবিয়া ব্যাকুল। আধ তিল—এক মুহূর্ত। বিনু—বিনা। মীন—মাছ। ক-বহুঁ—কখনও। জীয়ে—বাঁচে। জল বিনু··জীয়ে—জল ছাড়া মাছ যেমন কখনও বাঁচে না। ভানু—সূর্য। সেহো এমন নয়—সেও এইরূপ নিবিড় নহে। হিমে—শীতে। জলদ—মেঘ। সময় নহিলে—বর্ষা না আসিলে। মধুপ—ভ্রমর। সেহো নহে তুল—সেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুল্য নহে। না যাইলে···ফুল—ভ্রমর যদি ফুলের উপর না বসে, তবে মধুপান করিতে পারে না। অর্থাৎ ফুল নিজের আগ্রহে মধু দেয় না। কি ছার—কি তুচ্ছ। চান্দ—চাঁদ।

ব্যাখ্যা

কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।

আলোচ্য অংশটি চণ্ডীদাস রচিত পূর্বরাগ ও অনুরাগ বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে রাধা এবং কৃষ্ণের অতুলনীয় প্রেম-প্রীতির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাধা এবং কৃষ্ণ—উভয়ে উভয়কে এত নিবিড়ভাবে ভালবাসেন যে সেই ভালবাসার কোন তুলনা নাই। দুইজনে যেন দুই জনের জীবন। তাহাদের ভালবাসা এত গভীর যে মিলনের আনন্দের মধ্যেও বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করিয়া তাহারা বেদনার্ত হইয়া পড়েন। পৃথিবীতে সূর্য কমল, চাতক জলদ, কুসুম ভ্রমর, চন্দ্র চকোর প্রভৃতি অনেক প্রেমিক প্রেমিকার ভালবাসার কথা শোনা যায়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভালবাসার সহিত অন্য কাহারও ভালবাসার তুলনাই হয় না। কুসুম আর ভ্রমরের ভালবাসার কথা শোনা যায়। কিন্তু এ ভালবাসার মধ্যে উভয় পক্ষের সমান আগ্রহ নাই। ভ্রমর কুসুমের কাছে না গেলে কুসুম নিজ হইতে মধু দেয় না। চকোর এবং চন্দ্রের ভালবাসা রাধাকৃষ্ণের ভালবাসার কাছে ম্লান। রাধাকৃষ্ণ—একে অন্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন।

পূর্বরাগ ও অনুরাগ

কবিবল্লভ

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা সখিকে বলিতেছেন, যে সে কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে মনের ভাব জানিতে চাহিতেছে। কিন্তু তিনি কিরূপে সেই কৃষ্ণপ্রেমের বর্ণনা দিবেন। সেই প্রেম কখনো এক অবস্থায় থাকে না। তাহা প্রতি মুহূর্তেই নব নব রূপ লাভ করিতেছে। জন্মকাল হইতে রাধা কৃষ্ণের অনুপম রূপমাধুরী দর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তথাপি তাহার নয়ন তৃপ্ত হইল না। কৃষ্ণের মধুর বাণী তিনি কতবার কানে শুনিয়াছেন কিন্তু তথাপি বারবার সেই বাণী শুনিতে ইচ্ছা হয়। কত রাত্রি কৃষ্ণের সহিত মিলনে ক্রীড়া-কৌতুকে কাটিয়া গেল। তথাপি মিলনের স্বরূপ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া কৃষ্ণের হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিশাইয়া রাখিয়াছেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় শান্ত হইল না। কত বিদগ্ধ রসজ্ঞ মানুষ তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু কাহারও মধ্যে প্রকৃত প্রেমের অনুভূতি তিনি দেখিতে পান নাই। কবিবল্লভ বলেন যে প্রাণ শান্ত করিবার জন্য লক্ষের মধ্যে একজনকেও পাওয়া যায় না।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ। অনুভব—অনুভূতি। মোয়—আমার। সোই—সেই। অনুরাগ—ভালবাসা বাখানিতে—জানাইতে, ব্যাখ্যা করিতে। তিলে তিলে—প্রতি মুহূর্তে। নূতন হোয়—নবরূপ লাভ করে। সোই পিরিতি··· হোয়—কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ বা অনুভূতি কখনো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ইহা কখনো একরূপে থাকে না, প্রতি মুহূর্তেই নূতন নূতন রূপ লাভ করে। হাম—আমি। নেহারলুঁ—দেখিলাম। তিরপিত—তৃপ্ত। ভেল—হইল। নয়ন···ভেল—জন্মাইবার পর হইতে রাধাকৃষ্ণের অনুপম রূপ-মাধুরী দর্শন করিতেছেন। এতদিনে তাহার চোখের তৃপ্তি হইবার কথা, কিন্তু এত দেখিবার পরও তাঁহার চক্ষু তৃপ্ত হয় নাই। বোল—বাণী। শ্রবণহি—কানের মধ্যে। শুনলুঁ—শুনিলাম। শ্রুতি পথে পরশ না গেল—কানের মধ্যে যাইয়া যেন স্পর্শ করিল না অর্থাৎ বার বার শুনিবার পরও পুনরায় শুনিবার ইচ্ছা দূর হইল না। মধুযামিনী—মধুময় রাত্রি। রভসে—মিলনের আনন্দে। গোঁয়াইলুঁ—কাটাইলাম। বুঝলুঁ—বুঝিলাম। কৈছন—কেমন। কেল—মিলন। লাখ লাখ যুগ—লক্ষ লক্ষ যুগ। হিয়া হিয়ে রাখলুঁ—হৃদয় রাখিলাম হৃদয়ের উপর। জুড়ন না গেল—জুড়াইল না। বিদগধ—বিদগ্ধ। রসে অনুগমন—রসে নিমগ্ন হইয়া। অনুভব কাহু না পেখ—কাহারও মধ্যে সেই গভীর প্রেমানুভূতি দেখিলাম না।

ব্যাখ্যা

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥

আলোচ্য অংশটি কবিবল্লভ রচিত পূর্বরাগ ও অনুরাগ বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই পদে রাধার অবানীতে কৃষ্ণপ্রেমের অনন্ত রহস্যময়তা সম্পর্কে বলা হইয়াছে।

রাধার জীবন কৃষ্ণময়। তাঁহার দেহমনে কৃষ্ণের অবস্থান। তথাপি কৃষ্ণের প্রেমের স্বরূপ বোঝাইবার মতো শক্তি তাঁহার নাই। ইহা প্রতিটি মুহূর্তে নবনব রূপ লাভ করিতেছে। তিনি জন্ম হইতে কৃষ্ণের আশ্চর্য রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নয়ন তৃপ্ত হয় নাই। কৃষ্ণকে দেখিবার আকাঙ্খা তাঁহার নিবৃত্তি হয় নাই। কৃষ্ণের মধুর বাণী বহুবার শুনিবার পরও ইহা শুনিবার আকাঙ্খা যায় নাই। কৃষ্ণের সহিত মিলনের আনন্দে মধুময় রজনী অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি সেই মিলনের স্বরূপ তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি লক্ষ লক্ষ যুগ কৃষ্ণের হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয়কে মিশাইয়া রাখিয়াছেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় শান্ত হয় নাই। কৃষ্ণকে ভালবাসিবার অনুভূতি অবর্ণনীয়।

অভিসার

গোবিন্দদাস

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ পণ ফনিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে॥
গুরুজন-বচনে বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমান॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা কৃষ্ণের কাছে অভিসারে যাইতেছেন। সেই অভিসারের প্রস্তুতিস্বরূপ তিনি মাটির উপর কাঁটা পুঁতিয়া তাহার পদ্মফুলের মতো সুন্দর চরণ ফেলিয়া হাঁটিতেছেন। তাঁহার চরণে যে নূপুর বাঁধা আছে, তাহাতে শব্দ হইতে পারে, এই আকাঙ্খায় তিনি বস্ত্রদ্বারা তাহা আবৃত করিয়া লইয়াছেন।

তিনি যখন অভিসারে যাত্রা করিবেন, তখন পিছল পথে পড়িয়া যাইতে পারেন। এই জন্য আগেই আঙিনার কলসীর জল ঢালিয়া পিছল মাটি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আঙুল চাপিয়া পিছল পথে হাঁটা অভ্যাস করিতেছেন। কৃষ্ণের নিকট অভিসারের জন্য অনেক দূরের পথ অতিক্রম করিতে হইবে। এই জন্য রাধা নিজ গৃহে রাত্রি জাগিয়া অভিসারে যাইবার সাধনা করিতেছেন।

অন্ধকার রাত্রিতে পথ দেখা যাইবে না। তাই রাধা হস্তদ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া অন্ধকার পথে চলা অভ্যাস করিতেছেন। পথে চলিতে সর্প দংশন করিতে পারে, তাই রাধা সর্পগুরুকে কঙ্কণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া সর্পের মুখ বন্ধন শিক্ষা করিতেছেন। গুরুজনের বাক্য তিনি শুনিয়াও শোনেন না—এক কথা শোনেন অন্য কথা উত্তর দেন। পরিজনের বাক্য শুনিয়া মুগ্ধার মতো হাসিতে থাকেন। গোবিন্দদাস ইহার প্রমাণ।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

কণ্টক গাড়ি—কাঁটা পুঁতিয়া। কমল সম পদতল—রাধার পদযুগল পদ্মফুলের ন্যায় সুন্দর। মঞ্জীর—নূপুর। চীরহি—বস্ত্র দ্বারা। ঝাঁপি—ঢাকিয়া, বাঁধিয়া। মঞ্জীর··ঝাঁপি—রাধার পদযুগলে নূপুর বাঁধা। চলিবার সময় ইহাতে শব্দ হইতে পারে। ইহাতে সকলে তাহার অভিসারের কথা জানিয়া ফেলিবে। এই জন্য রাধা বস্ত্রদ্বারা নূপুর বাঁধিয়া লইয়াছেন। গাগরি বারি—কলসীর জল। ঢারি—ঢালিয়া। চলতহি—চলিতেছেন। অঙ্গুলি চাপি—পায়ের আঙুল চাপিয়া। মাধব—কৃষ্ণ। তুয়া—তোমার। অভিসারক—অভিসারের। লাগি—জন্য। দূতর—দুস্তর। পন্থ—পথ। ধনি—যুবতী। সাধয়ে—সাধনা করিতেছে। মন্দিরে—ঘরে। যামিনী জাগি—রাত্রি জাগিয়া। দূতর·জাগি—রাধাকে অনেক দুস্তর পথ অতিক্রম করিতে হইবে। পথে কত বিপদ আপদ। রাধা সেই পথ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের কাছে অভিসারে যাইবার সাধনা করিতেছেন। করযুগে—হস্তদ্বারা। মুদি—ঢাকিয়া। চলু—চলিতেছে। ভামিনী—নারী। তিমির—অন্ধকার। পয়ানক—কাটাইবার জন্য। আশে—আশায়। কর-কঙ্কণ-পণ—হাতের কঙ্কণ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া। ফণিমুখ বন্ধন—সর্পের মুখ বন্ধ করিবার কৌশল। শিখই—শিক্ষা করেন। ভুগজ গুরু—সর্পের গুরু। মানই—মানে। আন—এক। মুগধী—মুগ্ধা। হাসই—হাসেন।

ব্যাখ্যা

করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥

আলোচ্য অংশটি গোবিন্দদাসের 'অভিসার' পর্যায়ের পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণের নিকট রাধার অভিসার যাত্রার প্রস্তুতি এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

রাধা কৃষ্ণের নিকট অভিসারে যাইবেন। অভিসারের পথ অতি দুস্তর ও দুর্গম। পথে কত রকমের বিপদ। অন্ধকার রাত্রি। পথ পিচ্ছল। পথে সাপের ভয়। তাই রাধা আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া পিচ্ছল পথে হাঁটা অভ্যাস করিতেছেন। অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলিতে হইবে। চোখে কিছু দেখিতে পাইবেন না। তাই রাধা হস্ত দ্বারা চক্ষু বন্ধ করিয়া পথ চলা অভ্যাস করিতেছেন। পথে সর্প দংশন করিতে পারে। তাই রাধা সর্পগুরু অর্থাৎ সর্পওঝার নিকট হইতে সর্পমুখ বন্ধনের কৌশল শিখিয়া লইতেছেন। ওঝা তো এমনি শিখাইবে না। তাই তাহাকে হাতের কঙ্কণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বংশীশিক্ষা ও নৃত্য
চণ্ডীদাস

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আল।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্র নীল কান্তি তনু।
এত নহে নন্দ-সুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর-বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোনে দেশে ছিল॥
কে বানাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা কৃষ্ণের কাছে বংশী শিক্ষা করিতে চাহিলে কৃষ্ণ রাধাকে তাহার পীতধড়া ও চূড়া পরাইয়া দিয়াছেন। তাহাকে দেখিতে কৃষ্ণের মতো হইয়াছে। সখীরা কুঞ্জ ভুলিয়া ফিরিয়া আসিয়া অবাক হইয়া বলিতেছেন যে আজ যে বংশী বাজাইতেছেন, তিনি তো কৃষ্ণ নহেন। ইহার গৌরবর্ণে বন আলো করিয়াছে।

ইহার মাথায় কে চূড়া বাঁধিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণের দেহের বর্ণ ইন্দ্রনীল। ইনি তো নন্দপুত্র কৃষ্ণ নহেন। ইহার রূপ নবীন। ইনি কৃষ্ণের নটবর বেশ কোথায় পাইলেন। ইহার গলায় বনমালা বেশ ভাল শোভা পাইতেছে। এতদিন ইনি কোথায় ছিলেন। এই রূপরাশি কে নির্মাণ করিল। ইহার বামে কৃষ্ণবর্ণা এক সুন্দরী। বোধহয় ইহারই প্রেমিকা ইনি। এইভাবে সখীরা কথা বলিতে লাগিল। কুঞ্জে কৃষ্ণ এবং রাধা ছিলেন। তাহারা কোথায় গেলেন কিছুই জানা যায় না। আজ যেন সবই বিপরীত। বোধহয় ইহাদের বিপরীত বেশ হইবে। চণ্ডীদাস মনে মনে হাসিয়া বলেন যে এইরূপ কোন্ দেশে দেখা যাইবে।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

আজু—আজ। মুরলী—বংশী। শ্যামরায়—কৃষ্ণ। গৌর বরণে—গৌর রঙে। আল—আলো। চূড়াটি—কৃষ্ণের মাথায় মোহনচূড়া। কান্তি—বর্ণ। তনু—দেহ। নন্দ-সুত—কৃষ্ণ, রাজা নন্দের পালিত পুত্র। নবীন—নূতন। নটবর—নর্তক। কথি—কোথায়। বনাইল—তৈরী করিল। চিকণ বরণী—কৃষ্ণবর্ণা। সুন্দরী—প্রেমিকা। ঠারাঠারি—কানাকানি। কুঞ্জে—উদ্যানে। কমলিনী—রাধা। আজু—আজ। দোঁহার চরিত—দুইজনে বেশ পরিবর্তন করিবেন।

ব্যাখ্যা

কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥

আলোচ্য অংশটি চণ্ডীদাস রচিত বংশীশিক্ষা ও নৃত্য বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাধাকে কৃষ্ণবেশে দেখিয়া সখিদের সাময়িক প্রতিক্রিয়া এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

রাধা কৃষ্ণের নিকট বংশী শিক্ষা করিতে চাহিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার নিজস্ব বেশে সাজাইয়াছেন। রাধা পরিয়াছেন কৃষ্ণের পীতধড়া ও চূড়া। কৃষ্ণ পরিয়াছেন রাধার নীলশাড়ি। সখিরা ফুল তুলিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া অবাক। আজ যে বংশী বাজাইতেছেন, তিনি তো কৃষ্ণ নহেন। কৃষ্ণের গায়ের রঙ কালো। কিন্তু ইহার গৌরবর্ণে বন আলোকিত। রূপে ইনি নবীন। ইহার গলে বনমালা বেশ সুন্দর দেখাইতেছে। ইহার বামে কৃষ্ণবর্ণা সুন্দরী সম্ভবতঃ ইহার প্রেমিকা হইবেন। তাহারা তো কুঞ্জে কৃষ্ণ এবং রাধাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। এখন ইহারা কাহারা আসিলেন? ইহাদের পরিচয় কি। আজ সব কেন বিপরীত হইয়া গেল। বোধহয় দুইজনে বেশ পরিবর্তন করিবেন।

প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

চণ্ডীদাস

বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা॥

ভাববস্তু সংক্ষেপে

রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে অল্প বয়সে কৃষ্ণ তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহাকে ঘর ছাড়া করিয়াছেন। তিনি প্রেমের জ্বালায় জ্বলিতেছেন। তিনি এখন এই কামনা করিয়া সাগরে ঝাঁপ দিয়া মৃত্যুবরণ করিবেন যে পরজন্মে তিনি যেন কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন, আর কৃষ্ণ রাধারূপে। তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, কদমতলায় বাস করিবেন। রাধারূপী কৃষ্ণ যখন স্নান করিতে যাইবেন, তখন তিনি ত্রিভঙ্গরূপে বংশী বাজাইবেন। সেই বংশী শুনিয়া কৃষ্ণ সহজেই মুগ্ধ হইবেন। চণ্ডীদাস বলেন যে কৃষ্ণ তখনই জানিতে পারিবেন, প্রেমের কি তীব্র জ্বালা।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

বঁধু—বন্ধু। এখানে কৃষ্ণকে বন্ধু বলা হইয়াছে। কি আর···তোরে—রাধা মনের মধ্যে তীব্র জ্বালা ও অভিমান লইয়া কৃষ্ণকে একথা বলিতেছেন। অল্প বয়সে—কিশোর বয়সে। রহিতে···ঘরে—কৃষ্ণ রাধাকে ভালবাসিয়াছেন কিশোর বয়সে। তাঁহার আকর্ষণে রাধা ঘর সংসার সব কিছু ছাড়িয়া আসিয়াছেন। কামনা করিয়া—প্রার্থনা করিয়া। সাধিব মনের সাধা—মনের সাধ মিটাইয়া লইব। রাধা প্রেমের যে জ্বালা সহ্য করিতেছেন, কৃষ্ণও অনুরূপ জ্বালা ভোগ করেন, এই রাধার মনের সাধ। মরিয়া হইয়া···নন্দন—রাধা মৃত্যুর পর আর নারী জন্ম চান না। তিনি এবার পুরুষ হইয়া কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিতে চান।

তোমারে করিব রাধা—কৃষ্ণ যেন পরজন্মে রাধারূপে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই রাধার প্রার্থনা। কারণ তাহা হইলে কৃষ্ণ নারীর মর্মযন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিবেন। পিরীতি…যাইব—কৃষ্ণ যেমন রাধাকে ভালবাসিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পরজন্মে রাধাও কৃষ্ণরূপে রাধারূপী কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। ত্রিভঙ্গ হইয়া…জল—কৃষ্ণ যখন নদীতে স্নান করিতে যাইবেন, তখন রাধা ত্রিভঙ্গরূপে বাঁশী বাজাইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিবেন। মোহিত—মুগ্ধ। সহজ সরল। পিরীতি…জ্বালা—কৃষ্ণ নারীরূপে জানিতে পারিবেন প্রেমের জ্বালা কত তীব্র।

ব্যাখ্যা

পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥

আলোচ্য অংশটি চণ্ডীদাস রচিত প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রেমের জ্বালা যে কত তীব্র, রাধার জবানীতে কবি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

রাধা কৃষ্ণকে গভীরভাবে ভালবাসেন। তাঁহাকে ভালবাসিয়া তিনি ঘর ছাড়িয়াছেন। কিন্তু ভালবাসার মাধ্যমে তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিয়াছে বিচ্ছেদের অন্ধকার। কৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন বিরহের যন্ত্রণায় জ্বলিতে জ্বলিতে রাধা পরজন্মে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের নিকট হইতে যে দুঃখ পাইয়াছেন, পরজন্মে তিনিও কৃষ্ণরূপে তাঁহাকে অনুরূপ দুঃখ দিবেন। পরজন্মে কৃষ্ণ রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। নারী হইয়া তবেই তিনি নারীর মর্মবেদনা বুঝিতে পারিবেন। রাধা পরজন্মে কৃষ্ণকে ভালবাসিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কদম্বতলায় ত্রিভঙ্গরূপে তিনি বাঁশী বাজাইবেন। রাধারূপী কৃষ্ণ জলে স্নান করিতে নামিবেন। তাঁহার বাঁশীর সুর শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিবেন।

প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

চণ্ডীদাস

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥

কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোর নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে কৃষ্ণ কি দারুণ মায়াই না জানেন। অবলা নারীর জীবন লইতে তাহার মতো আর কেহই পারে না। তিনি ঘরকে বাহির করিয়াছেন, আর বাহিরকে করিয়াছেন ঘর। রাত্রিকে করিয়াছেন দিন, আর দিনকে করিয়াছেন রাত্রি। পরকে তিনি আপন করিয়াছেন, আপনকে করিয়াছেন পর, তথাপি তিনি কৃষ্ণের প্রেমের রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। কোন বিধাতা তাঁহাকে স্রোতের শেওলা করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। স্রোতের শেওলা যেন স্রোতের ধাক্কায় ভাসিয়া যায়, রাধাও তেমনি প্রেমের প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছেন। রাধার এমন কেহ নাই যাহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিতে পারেন। কৃষ্ণ যদি তাঁহার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তবে তিনি তাহার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করিবেন। বাশুলী দেবীর আদেশে চণ্ডীদাস বলেন যে পরের জন্য কি আপন পর হয়।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

মোহিনী—মায়া, যাদু। অবলার—বলহীন নারীর। অবলার···হেন—কৃষ্ণ রাধাকে ভালবাসিয়া তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়াছেন। রাধার জীবন এখন কৃষ্ণপ্রেমে আকুল। কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না। কৃষ্ণ নাম রাধার জীবন হরণ করিয়াছেন। তাই রাধা বলিতেছেন যে আর কেহই কৃষ্ণের মতো অবলা নারীর প্রাণ লইতে জানে না। ঘর কৈনু বাহির—ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম। বাহির কৈনু ঘর—বাহিরের জগতকে ঘরের মধ্যে আনিলাম। রাতি···রাতি—কৃষ্ণকে ভালবাসিয়া রাধা এমনই আত্মতন্ময় যে তাহার নিকট দিনরাত্রির ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পর কৈনু ·পর—কৃষ্ণ রাধার নিকট পরপুরুষ। তথাপি সেই পরপুরুষকেই রাধা আপন করিয়া লইয়াছেন, আর নিজের স্বামীকে করিয়াছেন পর। বুঝিতে নারিনু···পিরীত—রাধা কৃষ্ণের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন. তথাপি তাহার প্রেমের রূপ ও রীতি আজও বুঝিতে পারিলেন না। বিধি—বিধাতা। সিরজিল—সৃজন। শেওলি—শ্যাওলা। কোন বিধি···শেওলি—রাধা নিজেকে স্রোতের শ্যাওলার মতো অসহায় মনে করিতেছেন। শ্যাওলা যেমন স্রোতের ধাক্কায় অসহায়ভাবে ভাসিতে থাকে, রাধাও তেমনি কৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহে অসহায় ভাবে ভাসিয়া চলিতেছেন। যদি তুমি···হও—যদি কৃষ্ণ রাধার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। বাশুলী—বাশুলী দেবী। ইনি লৌকিক দেবী। চণ্ডীদাস এই দেবীর উপাসক ছিলেন।

ব্যাখ্যা

কোন বিধি সিরজিল স্রোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

আলোচ্য অংশটি চণ্ডীদাসের প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে রাধার মর্মযন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়াছে।

রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসিয়া গভীর মর্মযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। কৃষ্ণের জন্য তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা গভীর আকূতি। অথচ কৃষ্ণকে তিনি কাছে পান না। তিনি তাঁহার জন্য কতই না দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে ঘর সমাজ সংসার সব ছাড়িয়াছেন। সব কিছু ছাড়িয়া তিনি পথ আশ্রয় করিয়াছেন। এখন স্রোতের মতো অসহায় তাঁহার জীবন। স্রোতের শ্যাওলা যেমন স্রোতের ধাক্কায় অসহায় ভাবে ভাসিতে থাকে, তিনিও কৃষ্ণপ্রেমে অসহায় ভাবে ভাসিতেছেন। কৃষ্ণ যদি আবার তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন, তবে তিনি তাঁহার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করিবেন।

প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

জ্ঞানদাস

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে সুখের লাগিয়া তিনি ভালবাসার যে ঘর বানাইয়াছিলেন, তাহা বিরহের আগুনে যেন পুড়িয়া গিয়াছে। তিনি অমৃত সাগরে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু অমৃতের বদলে তাঁহার ভাগ্যে হইল গরল। তাঁহার ভাগ্যে যে কি লেখা আছে; শীতল বলিয়া তিনি যে চাঁদের আলো উপভোগ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগ্যে তাহা হইয়া গেল সূর্যের কিরণ। উচ্চ বলিয়া তিনি পর্বতে চড়িতে গেলেন, পড়িলেন অগাধ জলে। লক্ষ্মীকে তিনি চাহিলেন, লক্ষ্মীর বদলে দারিদ্র্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। তিনি মানিক পাইবার আশায় নগর বসাইলেন, সাগর বাঁধিলেন, কিন্তু সাগর শুকাইয়া গেল, মানিকও তিনি পাইলেন না। পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি মেঘ চাহিলেন, মেঘের বদলে বজ্রপাত হইল। জ্ঞানদাস বলেন যে কৃষ্ণের প্রেম মরণের চেয়েও ভয়ঙ্কর আঘাত।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

বাঁধিনু—নির্মাণ করিলাম। অনলে—আগুনে। অমিয়—অমৃত। সিনান—স্নান। গরল—বিষাক্ত। ভেল—হইল। করমে—কর্মে। লেখি—লেখা আছে। সেবিনু—উপভোগ করিলাম। ভানুর—সূর্যের। উচল—উচ্চ। অচলে—পর্বতে। পড়িনু—পড়িলাম। লছমী—লক্ষ্মী। বেঢ়ল—বেড়িল, ঘিরিয়া ধরিল। হারানু—হারাইলাম। হেলে—অবহেলায়। অভাগীর—দুর্ভাগ্য-পীড়িত রাধার। করম দোষে—ভাগ্য দোষে। পিয়াস—পিপাসা। জলদ—মেঘ। বজর—বজ্র। শেল—আঘাত। অমিয় · দেন—রাধা কৃষ্ণের ভালবাসাকে অমৃত বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন। কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যে এত যন্ত্রণা যে ইহাকে বিষাক্ত বলিয়া মনে হইতেছে। শীতল · · দেখি—রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে চাঁদের জ্যোৎস্না-ধারার মতো স্নিগ্ধ-শীতল ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখিলেন যে ইহার মধ্যে সূর্যের প্রখর তাপের জ্বালা।

ব্যাখ্যা

উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥

আলোচ্য অংশটি জ্ঞানদাসের প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ বিষয়ক পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাধার জবানীতে এই সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের জ্বালাযন্ত্রণা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আকুল। তাঁহার জীবন কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের প্রেমে যে জ্বালা তাহা তিনি এখন বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে কৃষ্ণের প্রেমে মগ্ন হইয়া তিনি ভালবাসার সুখের ঘর নির্মাণ করিবেন

কিন্তু এখন বিরহ জ্বালার মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে যে তাঁহার সেই সুখের ঘর বিরহের আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে কৃষ্ণের ভালবাসা বুঝি অমৃত সাগর। এখন দেখিতেছেন যে তাহা বিষাক্ত সাগর। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে কৃষ্ণের ভালবাসা বুঝি চাঁদের জ্যোৎস্নাধারার মতো স্নিগ্ধ। কিন্তু এখন দারুণ জ্বালার মধ্যে মনে হইতেছে যে উহা সূর্যের কিরণের মতো প্রখর। তিনি কৃষ্ণের প্রেমের উচ্চ চূড়ায় উঠিতে গিয়া বিরহের অগাধ জলে পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি চাহিলেন লক্ষ্মীর আশীর্বাদ, প্রেমের প্রাচুর্য। সেই স্থলে যেন দারিদ্র্যের অভিশাপ আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ধরিল।

নিবেদন

চণ্ডীদাস

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা কৃষ্ণের নিকট এই নিবেদন করিয়াছেন, তিনি যেন জীবনে মরণে জন্মে জন্মে তাঁহার প্রাণনাথ হন। তিনি ভালবাসিয়া কৃষ্ণের চরণে নিজের

হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের নিকট দেহমন সমর্পণ করিয়া তাঁহার দাসী হইয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ত্রিভুবনে তাঁহার আপনার বলিতে আর কেহ নাই—রাধা বলিয়া তাহাকে কেহ ডাকিবে না—তিনি কাহার কাছেই বা দাঁড়াইবেন। পিতৃকুল পতিকুল ও গোকুল—এই তিনকুলে তিনি কাহাকে আপন ভাবিবেন। তিনি আজ কৃষ্ণের কমল পদযুগলে আশ্রয় লইলেন। কৃষ্ণ যেন তাহাকে অবলা সরলা বলিয়া দূরে সরাইয়া না দেন। তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন। কৃষ্ণ ছাড়া তাঁহার কোন গতি নাই। তিনি যদি নিমেষের জন্যেও তাহাকে না দেখেন, তবে তাহার প্রাণ যায়। চণ্ডীদাস বলেন যে কৃষ্ণ স্পর্শমণি। তাহাকে গলার গাঁথিয়া পরিতে ইচ্ছা হয়।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

প্রাণনাথ—প্রাণদেবতা। পরাণে—প্রাণে। তোমার···ফাঁসি—তোমার চরণের সঙ্গে আমার প্রাণ প্রেমের ফাঁসিতে আবদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ তোমার চরণে আমি এমনভাবে হৃদয়কে সমর্পণ করিয়াছি যে তোমার চরণ সরাইয়া লইলে আমার মৃত্যু হইবে। সমর্পিয়া—সমর্পণ করিয়া। সুধাইতে—জিজ্ঞাসা করিতে। একুলে—পিতৃকুলে। ও কুলে—পতিকুলে। ছলে—ছলনায়। অবলে—সরলাকে। নিমিখে—নিমেষে। পরশ রতন—স্পর্শমণি। চণ্ডীদাস কহে···পরি—কৃষ্ণ স্পর্শমণি। তাঁহার স্পর্শে সব সোনা হইয়া যায়। কৃষ্ণকে যেন গলায় হার করিয়া গলায় পরিতে ইচ্ছা হয়।

ব্যাখ্যা

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু— প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥

আলোচ্য অংশটি চণ্ডীদাস রচিত নিবেদন পর্যায়ের পদের অন্তর্গত। এই অংশে কৃষ্ণের প্রতি রাধার আত্মনিবেদন বর্ণিত হইয়াছে।

রাধা কৃষ্ণের প্রতি প্রাণমণ সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার আর নিজস্ব সত্তা বলিয়া কিছু নাই। কৃষ্ণের চরণের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের যেন এক-সঙ্গে ফাঁসী হইয়াছে। তিনি কৃষ্ণের জন্য পিতৃকুল পতিকুল ও গোকুলের সমাজ-সংসার সব কিছু ত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ছাড়া তাঁহার আপন বলিতে আর কেহ নাই। তিনি চিরজন্মের মতো কৃষ্ণের পদযুগলে আশ্রয় লইয়াছেন। এখন তাঁহার প্রার্থনা, কৃষ্ণ যেন অবলা সরলা ভাবিয়া ছলনা করিয়া তাঁহাকে দূরে সরাইয়া না দেন। তিনি মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, কৃষ্ণ ছাড়া তাঁহার অন্য কোন গতি নাই। কৃষ্ণ তাঁহার জীবন সর্বস্ব। কৃষ্ণের বাহিরে তাঁহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

নিবেদন
চণ্ডীদাস

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু-মন।
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল-মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সব
তোহারি চরণখানি ॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা কৃষ্ণের কাছে এই নিবেদন করিয়াছেন যে তিনি তাঁহার প্রাণ। তিনি তাঁহাকে দেহ-মন-কুল-শীল প্রভৃতি সব কিছুই সমর্পণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ অখিলের রাজা, যোগীর আরাধ্য ধন। রাধা গোপ গোয়ালিনী অতি দীনহীন—কৃষ্ণের ভজন-পূজন জানেন না। প্রেমের রসে দেহমন সিক্ত করিয়া তিনি কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহার পতি, তিনি তাঁহার পরম গতি। তাঁহার মনে আর কোন কিছু নাই। তাঁহাকে সব লোক কলঙ্কিনী বলিয়া ডাকে। ইহাতে তাঁহার মনে কোন দুঃখ নাই। কৃষ্ণের জন্য গলায় কলঙ্কের হার পড়িতে তাঁহার মনে অনেক সুখ। তিনি সতী বা অসতী, তাহা কৃষ্ণই জানেন। তিনি ভাল মন্দ কিছুই জানেন না। চণ্ডীদাস বলেন যে পাপ হোক বা পুণ্য হোক, কৃষ্ণের চরণ তাঁহার সর্বস্ব।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

আদি—প্রভৃতি। কুল শীল জাতি মান—রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন কুলের ভয় না করিয়া। তাঁহার জন্য তিনি জাতি ধর্ম মান সম্মান সব কিছু বিসর্জন দিয়াছেন। অখিল—বিশ্ব। কালিয়া—কৃষ্ণ। যোগীর—সাধকের।

গোপ গোয়ালিনী—রাধা আয়ান ঘোষ নামে গোপের পত্নী। সেই অর্থে গোয়ালিনী। হাম—আমি। পিরীতি রসেতে—প্রেমের রসে। তনু—দেহ। আন—অন্য। তায়—প্রকাশ। কলঙ্কী—রাধা পরস্ত্রী হইয়াও কৃষ্ণকে ভালবাসেন, সেইজন্য তাঁহাকে লোকে কলঙ্কিনী বলিয়া ডাকে। তোমার লাগিয়া…সুখ—রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসেন। কৃষ্ণ তাঁহার জীবন সর্বস্ব। তাই তাঁহাকে ভালবাসার জন্য লোকে তাঁহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া ডাকে, ইহাতে তাঁহার কোন দুঃখ নাই। বরঞ্চ ইহাতে তিনি চরম সুখ লাভ করেন। সতী বা অসতী—রাধা যথার্থ সতী কিংবা অসতী, সে কথা শুধু কৃষ্ণ জানেন। বিদিত—জ্ঞাত। ভাল…জানি—রাধা কৃষ্ণের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছেন। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তাহা তিনি জানেন না। পাপপুণ্য সম…চরণখানি—পাপ হোক বা পুণ্য হোক কৃষ্ণের চরণই রাধার সর্বস্ব। ইহার বাহিরে তিনি আর কিছু জানেন না।

ব্যাখ্যা

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

আলোচ্য অংশটি চণ্ডীদাস রচিত 'নিবেদন' পর্যায়ের পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কৃষ্ণের প্রতি রাধার আত্মনিবেদন বর্ণিত হইয়াছে।

রাধা কৃষ্ণকে দেহ প্রাণ-মন নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের বাহিরে তাঁহার স্বতন্ত্র কোন প্রাণসত্তা নাই। তিনি সামান্য গোপ গোয়ালিনী। ভজন-পূজনের রীতি-নীতি তাঁহার জানা নাই। তিনি শুধু জানেন প্রেমের পূজা। প্রেমের পূজায় মাতিয়া তিনি কৃষ্ণের পদযুগলে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহার প্রকৃত পতি—কৃষ্ণই তাঁহার জীবনের পরম গতি। কৃষ্ণ ছাড়া তাঁহার মনে আর কোন চিন্তা নাই। কৃষ্ণকে ভালবাসিয়া তিনি জাতি-কুল-মান সব ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে সকলে তাঁহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া ডাকে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনে কোন দুঃখ নাই। ভালবাসার জন্য সব কলঙ্ক যে শুধু সহ্য করা যায়, তাহা নয়। এই কলঙ্ক তখন গৌরব। কৃষ্ণের জন্য তাঁহার গায়ে কলঙ্ক লাগিয়াছে, ইহাতে তাঁহার গৌরব। এই কলঙ্কের হার তিনি সগর্বে গলায় পরিবেন।

মাথুর

বিদ্যাপতি

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর।
শূন্য মন্দির মোর॥

ঝম্পি ঘন গর— জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া॥
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা দুঃখ করিয়া সখীকে বলিতেছেন যে তাঁহার দুঃখের সীমা নাই। ভাদ্র মাসে ভরা বাদল, কিন্তু তাঁহার গৃহ শূন্য। মেঘ ঝাঁপিয়া আসিয়া গর্জন করিতেছে, সর্বদা পৃথিবী ভাসাইয়া বর্ষণ হইতেছে। প্রিয়তম প্রবাসে, এদিকে নিষ্ঠুর কামদেব সঘনে তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিতেছে। শত শত বজ্রপাতে ময়ূর আনন্দে নাচিতেছে, ভেক মত্ত হইয়া ডাকিতেছে, ডাহুকী ডাকিতেছে, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। দিক-দিগন্তে অন্ধকার, ঘোর রাত্রি। অস্থির বিদ্যুৎ ছুটোছুটি করিতেছে। বিদ্যাপতি বলেন, হরি ছাড়া কিরূপে রাত্রি কাটাইবি।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

হামারি—আমার। ওর—সীমা। ভরা—পূর্ণ। বাদর—বাদল। মাহ—মাস। ভাদর—ভাদ্র। শূন্য মোর—আমার গৃহ শূন্য। ঝম্পি—ঝাঁপিয়া। ঘন—মেঘ। গরজন্তি—গর্জন করিতেছে। সন্ততি—সতত। বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করিতেছে। কান্ত—প্রিয়তম। পাহুন—প্রবাসী। কাম—প্রেমদেবতা। দারুণ—তীব্র। সঘনে—তীব্রভাবে। খর—তীক্ষ্ণ। শর—তীর। হন্তিয়া—হানিতেছে। কুলিশ—বজ্র। পাত—পতন জনিত। মোদিত—আনন্দিত। নাচত—নাচিতেছে। মত্ত—উন্মত্ত। দাদুরী—ভেক। যাওত—যাইতেছে। ছাতিয়া—বুক, হৃদয়। তিমির—আঁধার। ঘোর—গভীর। যামিনী—রাত্রি। অথির—অস্থির। বিজুরিক—বিদ্যুতের। পাতিয়া—পঙক্তি। কৈছে—কেমন করিয়া। গোঙায়বি—কাটাইবি। হরি—কৃষ্ণ। বিনে—বিনা। রাতিয়া—রাত্রি।

ব্যাখ্যা

কুলিশ শত শত পাত মোদিত—
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥

আলোচ্য অংশটি বিদ্যাপতি রচিত 'মাথুর' শীর্ষক পয়ার পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কৃষ্ণ বিরহে রাধার মর্মবেদনা ব্যক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করিয়া মথুরা নগরীতে চলিয়া গিয়াছেন। রাধা এখন বিরহের অতলান্ত সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত। তিনি জানেন যে কৃষ্ণ আর ফিরিয়া আসিবেন না। তাই সুতীব্র যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িতেছে। তাঁহার দুঃখের কোন সীমা নাই। এই ভাদ্র মাসে চারিধারে অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতেছে. চারিধারে কৃষ্ণ মেঘমালার সমাবেশ। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। নিবিড় বর্ষণে পৃথিবী অন্ধকার। ঘন ঘন বজ্রপাত ও বর্ষণে ময়ূরের দল আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ভেকের দল উল্লাসে চীৎকার করিতেছে। ডাহুকীও মনের উল্লাসে ডাকিতেছে। এইরূপ অবস্থায় কৃষ্ণবিরহে রাধার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। প্রিয় মিলনের জন্য তাঁহার দেহ-মন অধীর। মিলন বাসনায় তাঁহার হৃদয় চঞ্চল। অথচ তাঁহার গৃহ শূন্য। কৃষ্ণ তাঁহার কাছে নাই। সুতীব্র বিরহ যন্ত্রণায় রাধা হৃদয়ের হাহাকার যেন বাহিরের প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে।

মাথুর

বিদ্যাপতি

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সোপিয়ালেহে ॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহ ধন্দে ॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

অঙ্কুর যদি সূর্যের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়, তবে তাহার উপর মেঘ জল বর্ষণ করিয়া কি হইবে। এই নব যৌবন যদি রাধা বিরহ বেদনায় কাটাইবেন, তবে আর প্রিয়ের প্রেম পাইয়া কি লাভ হইবে। কৃষ্ণ এখানে এ কি দুর্দশা সৃষ্টি করিলেন। সাগর নিকটে থাকিতেও যদি কণ্ঠ শুকাইয়া যায়, তবে কে আর পিপাসা দূর করিবে। চন্দন তরু যদি সৌরভ ত্যাগ করে, চন্দ্র জ্যোৎস্নার বদলে অগ্নি বর্ষণ করিবে। চিন্তামণি যদি নিজের গুণ ছাড়িয়া দেয়, তবে অভাগী রাধার আর কি গতি হইবে। শ্রাবণ মাস যদি মেঘ বারি বর্ষণ না করে, কল্পতরু বন্ধ্যার মতো হয়। কৃষ্ণকে সেবা করিয়া যদি আশ্রয় না পাওয়া যায়, তবে বিদ্যাপতি ধাঁধায় থাকিবেন।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

অঙ্কুর—বীজ থেকে উদ্গত কচি উদ্ভিদ। তপন—সূর্য। জারব—দগ্ধ হয়। করিদ—জলবাহী। মেহে—মেঘে। নব যৌবন—নবীন যৌবন। গোঙায়ব—কাটাইব। সো—সেই। পিয়া—প্রিয়। লেহে—স্নেহে। এ নব যৌবন··· লেহে নবীন যৌবন প্রেমিকের ভালবাসায় মিলনে ধন্য হয় সার্থক হয়। সেই নবীন যৌবন যদি বিরহে কাটিয়া যায়, তবে আর প্রিয়ের প্রেম পাইয়া লাভ কি। দৈব—অদৃষ্ট। দুরাশা—নৈরাশ্য। সিন্ধু—সাগর। কণ্ঠ—গলা। শুকায়ব—শুকাইয়া যায়। কো—কে। সিন্ধু নিকটে · পিয়াসা—সাগর নিকটে আছে। তথাপি যদি পিপাসা দূর করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে কে আর পিপাসা দূর করিবে। চন্দন তরু—চন্দন গাছ। যব—যখন। সৌরভ—সুগন্ধি। ছোড়ব—ছাড়িয়া দিবে। শশধর—চন্দ্র। বরিখব—বর্ষণ করিবে। আগি—অগ্নি। চন্দন তরু ··আগি—চন্দন গাছ চন্দনের সুগন্ধ দেয়। যদি কোন কারণে সুগন্ধ দেওয়া বন্ধ করে, তবে বুঝিতে হইবে অনর্থ সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইলে চন্দ্রও স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার বদলে অগ্নি বর্ষণ শুরু করিবে। চিন্তামণি—এমন মণি যাহা দ্বারা সকল বস্তু সুলভ হয়। চিন্তামণি হাতে পাইলে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়। করম—কর্ম। চিন্তামণি·· অভাগি—ভাগ্যদোষে চিন্তামণি যদি নিজগুণ ত্যাগ করে, তবে আর দুর্ভাগ্যের বাকী কি থাকে। মাহ—মাস। ঘন—মেঘ। বিন্দু—বৃষ্টি। না বরিখব—বর্ষণ না করে। সুরতরু—কল্পতরু। ঝাঁঝকি—বন্ধ্যার। ছন্দে—মতো। গিরিধর—কৃষ্ণ। সেবি—সেবা করিয়া। ঠাম—ঠাঁই। পাওব—পাব। রহু—থাকে। ধন্ধে—ধাঁধার মধ্যে।

ব্যাখ্যা

চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥

আলোচ্য অংশটি বিদ্যাপতি রচিত—'মাথুর' পর্যায়ের পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কৃষ্ণ বিরহে রাধাহৃদয়ের করুণ বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ রাধাকে চিরতরে ত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। বিরহযন্ত্রণায় রাধার হৃদয় উদ্বেল। তিনি জানেন যে কৃষ্ণ তাঁহাকে ভালবাসেন। কিন্তু বিরহই যদি তাঁহার নিয়তি, তবে তাহার সে ভালবাসার মূল্য কি। কৃষ্ণের কাছে তিনি দেহমন সমর্পণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহার জীবন সর্বস্ব। প্রতিদানে কৃষ্ণের ভালবাসা পাইবার জন্যও তিনি ব্যগ্র। কিন্তু কৃষ্ণ বিরহে এখন তাঁহার জীবন অন্ধকার। কৃষ্ণ প্রেমের সাগর। তিনি থাকিতেও যদি ভালবাসার অভাবে জীবন শুকাইয়া যায়, তবে কে ভালবাসার পিপাসা দূর করিবে। চন্দন বৃক্ষ সুগন্ধি ছড়ায়। ইহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম। সেই স্বাভাবিক ধর্ম যদি সে ত্যাগ করে, তবে প্রাকৃতিক নিয়মেরও পরিবর্তন হইবে—চন্দ্র স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারার বদলে অগ্নি বর্ষণ করিবে। চিন্তামণি যদি নিজগুণ ছাড়ে, যদি তাহার মাধ্যমে দুর্লভ কাম্য বস্তু না পাওয়া যায়, তবে ভাগ্য খারাপ বলিতে হইবে। কৃষ্ণ যদি প্রেমের দেবতা। তিনি যদি প্রেম বিতরণ না করেন, তবে রাধার পক্ষে ইহা চরম দুর্ভাগ্য বুঝিতে হইবে।

ভাবোল্লাস ও মিলন

বিদ্যাপতি

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

রাধা বলিতেছেন যে আজ রাত্রি তাঁহার অনেক সুখ-সৌভাগ্যের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে। তিনি প্রিয়ের সুন্দর চন্দ্রানন দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার জীবন যৌবন আজ সার্থক হইয়াছে। দশ দিক নির্দ্বন্দ্ব হইল। আজ তিনি তাঁহার গৃহকে যথার্থ গৃহ বলিয়া মনে করিতেছেন, আজ তাঁহার দেহ যেন প্রকৃত দেহ। আজ বিধি তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, তাহার মনের সব সন্দেহ দূর হইয়াছে। সেই কোকিল এখন লক্ষবার ডাকুক, চন্দ্র লক্ষবার উদিত হোক, পঞ্চবান এখন লক্ষবান হোক, মলয়-বাতাস মন্দ মন্দ বহিতে থাকুক। এখন যদি প্রিয়ের সহিত মিলন হয়, তবে নিজের দেহকে রাধা স্বীকার করিবেন। বিদ্যাপতি বলেন যে রাধার প্রেম ধন্যাতিধন্য।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

আজু—আজ। হাম—আমি। ভাগে—ভাগ্য করিয়া; সৌভাগ্যে। পোহায়লুঁ—পোহাইলাম, অতিবাহিত করিলাম। পেখলুঁ—দেখিলাম। প্রিয়া—প্রিয় মুখ-চন্দা—মুখচন্দ্র। সফল—সার্থক। মানলুঁ—মানিলাম। দিশ—দিক। ভেল—হইল। নিরদন্দা—নির্দ্বন্দ্ব। মঝু—আমার। গেহ—গৃহ। মানলুঁ—মানিলাম। আজু· মানলু—রাধার গৃহ এতদিন যেন শ্রীহীন ছিল। কৃষ্ণকে দেখিবার পর তাহা শ্রীযুক্ত হইয়াছে। ভেল—হইল। দেহা—দেহ। আজু··· দেহা—রাধার দেহের এতদিন যেন কোন সার্থকতা ছিল না। কৃষ্ণকে দেখিবার পর তাহার দেহের সার্থকতা তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বিহি—বিধি। মোহে—আমাকে। অনুকূল—সদয়। হোয়ল—হইল। টুটল—দূর হইল। সবহুঁ—সমস্ত। সন্দেহ—সন্দেহ। সোই—সেই। অব—এখন। ডাকউ—ডাকুক। উদয় করু—উদিত হোক। চন্দা—চাঁদ। সোই কোকিল··· চন্দা—রাধা যখন বিরহ-কাতর ছিলেন, তখন কোকিলের গান, চাঁদের আলো তাঁহার কাছে পীড়াদায়ক ছিল। কিন্তু এখন কৃষ্ণের সহিত তাহার মিলন হইয়াছে, তাই এখন আর এই সবে তাহার ভয় নাই। পাঁচবান—পঞ্চবান। হোউ—হোক। মন্দা—মন্দ মন্দ।

ব্যাখ্যা

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ

আজু মঝু দেহ ভেল দেহ।

আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল

টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

আলোচ্য অংশটি বিদ্যাপতি রচিত 'ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায়ের পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন জনিত রাধার অন্তরের উল্লাস প্রকাশিত হইয়াছে।

দীর্ঘ বিরহের পর রাধার ভাগ্যে কৃষ্ণদর্শন ঘটিয়াছে। ইহাতে তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি কৃষ্ণ বিরহে নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছেন। আজ কৃষ্ণদর্শনে তাঁহার সব কষ্টের অবসান হইয়াছে। দুঃখের রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। তাই তিনি প্রিয়তমের সুন্দর মুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার জীবন-যৌবন আজ সার্থকতায় ভরিয়া গিয়াছে। চারিদিকে যেন আর কোন দ্বন্দ্ব বা সমস্যা নাই। এতদিন কৃষ্ণ বিহনে তাঁহার গৃহ ছিল অন্ধকার। আজ কৃষ্ণের আগমনে গৃহ প্রকৃত গৃহের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণ বিহনে তাঁহার দেহ ছিল অসার্থক। ইহার কোন মূল্যই ছিল না। আজ কৃষ্ণের মিলনে তাঁহার দেহ হইয়াছে সার্থক। বিধাতা আজ তাঁহার প্রতি সদয়। তাই কৃষ্ণ তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। তাঁহার মনের দুঃখ কষ্ট সন্দেহ—সব দূর হইয়া গিয়াছে।

প্রার্থনা

বিদ্যাপতি

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গ॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

কবি কৃষ্ণের উদ্দেশে বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, তোমার কাছে আমি এই নিবেদন করিতেছি। আমি আমার এ দেহ তিল এবং তুলসী দিয়া তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তুমি দয়া করিয়া আমাকে ত্যাগ করিও না। তুমি যখন আমার বিচার করিবে, আমার দোষগুণ দেখিবে, তখন আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র গুণ দেখিবে না। তুমি জগতের নাথ বলিয়া জগত বিখ্যাত, আমিও তো জগতের বাহিরের কেহ নহি। কর্মফলবশত মানুষ পশু পাখী অথবা কীট পতঙ্গ হইয়া বারবার জন্ম গ্রহণ করিলেও তোমার প্রতি যেন আমার মতি থাকে এই আমার প্রার্থনা। কৃষ্ণের পদযুগল অবলম্বন করিয়া বিদ্যাপতি ভবসিন্ধু পার [illegible] হন এবং তাঁহার জন্ত তাঁহাকে আশ্রয় দেন।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

বহুত—অনেক। মিনতি—অনুরোধ। তোয়—তোমাকে। দেই—দিয়া। তুলসী তিল—তুলসী পাতা ও তিল। সমর্পিনু—সমর্পণ করিলাম। জনু—যেন। ছোড়বি—ত্যাগ করিবে। মোয়—আমাকে। গণইতে—গণনা করিতে। লেশ না পাওবি—বিন্দুমাত্র পাইবে না। যব—যখন। তুহুঁ—তুমি। জগন্নাথ জগতের নাথ। কহায়সি—ঘোষণা করিতেছ। জগ—জগত। নহ—নহি। মুঞি—আমি। কিয়ে—কিবা। জগ বাহির··ছার—আমি তো জগতের বাহিরের কেহ নহি। আমি জগতের ভিতরের। জনমিয়ে—জন্ম গ্রহণ করিয়া। করম বিপাকে—কর্মফলবশত। গতাগতি—যাতায়াত। রহু—থাকে। তুয়া—তোমার। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে। ভণয়ে—বলিতেছে। তরইতে—পার হইতে। ভবসিন্ধু—ভবসমুদ্র। তুয়া—তোমার। তিল—মুহূর্ত।

ব্যাখ্যা

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥

আলোচ্য অংশটি বিদ্যাপতি রচিত-'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কৃষ্ণের কাছে কবির প্রার্থনা ব্যক্ত হইয়াছে।

কবি কৃষ্ণের পদযুগলে তিল ও তুলসী দিয়ে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার আর নিজের উপর কোন স্বত্ব নাই। তাঁহার প্রার্থনা, কৃষ্ণ যেন দয়া করিয়া তাহাকে ত্যাগ না করেন। তাঁহার জীবনে অনেক দোষ। যদি সে সকল দোষের বিচার করা হয়, তবে লেশমাত্র গুণের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। কবি জানেন, কৃষ্ণ জগতের ঈশ্বর। তিনিও তো জগতের ভিতরে মানুষ। তাই কবির বিশ্বাস, কৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না। কর্মফলের জন্য পরজন্মে মানুষ পশু পাখী অথবা কীট পতঙ্গ—যেরূপেই জন্ম হোক না কেন, সকল রূপেই কৃষ্ণ পদে তাঁহার মতি থাকে, এই তাঁহার প্রার্থনা।

প্রার্থনা

বিদ্যাপতি

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত রমণী-সমাজে।
তাহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিনুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥

আধ জনম হাম নিদে গোঙায়লুঁ
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি' পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক— নাথ কহায়সি,
অব তারণ—ভার তোহারা॥

ভাববস্তু সংক্ষেপ

কবি কৃষ্ণের কাছে এই প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে তিনি যেন তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। তপ্ত বালুকারাশির উপর জল পড়িলে তাহা যেমন মুহূর্তে লুপ্ত হইয়া যায়, সংসারে পুত্র-মিত্র রমণীও তেমনি অতি ক্ষণস্থায়ী।

কবি কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়া এতদিন এই সব অস্থায়ী সম্পর্কে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মনে এই জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে যে এতদিন পর তিনি কৃষ্ণের কোন্ কাজে লাগিবেন। তাঁহার পরিণতি খুব নৈরাশ্যজনক। কৃষ্ণ জগৎ ত্রাতা, দীনের তিনি দয়াময়। এই জন্য তাহার উপর গভীর বিশ্বাস রাখিতেছেন। তাঁহার অর্ধেক জন্ম কাটিয়া গিয়াছে নিদ্রায়, শৈশব ও জরায় অনেক দিন কাটিল। ইহার পর নিধুবনে রমণীর সঙ্গে রস-রঙ্গে অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ ভজনায় তিনি সময় পান নাই। কত ব্রহ্মার মৃত্যু হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণের আদি ও অন্ত নাই। সাগর লহরী যেমন সমুদ্রে জন্ম লইয়া সমুদ্রে লীন হয় তেমনি জীবকুল কৃষ্ণের মধ্যে জন্ম লইয়া আবার তাহাতেই লীন হইয়া যায়। বিদ্যাপতি বলেন, অন্তিমে আছে মৃত্যু ভয়। কৃষ্ণ ছাড়া গতি নাই। কৃষ্ণ আদি ও অনাদির নাথ বলিয়া ঘোষিত, তাই ত্রাণ করিবার ভার তাঁহারই।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

তাতল—তপ্ত। সৈকত—বালু। বারিবিন্দু—জলবিন্দু। সুত—পুত্র। মিত—মিত্র। রমণী—নারী তোহে—তোমাকে। বিসরি—বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া। সমপিলুঁ—সমর্পণ করিলাম। অব—এখন। মবু—আমি। হব—লাগিব। হাম—আমার। পরিণাম—পরিণতি। নিরাশা—নৈরাশ্যজনক। তুহুঁ—তুমি। জগ—জগত। তারণ—ত্রাতা। দীন—দরিদ্র। অতয়ে—অতএব। তোহারি—তোমার প্রতি। বিশোয়াসা—বিশ্বাস রাখি। আধ—অর্ধেক। নিদে—নিদ্রায়। গোঙায়লুঁ—কাটাইলাম। জরা—বার্ধক্য। শিশু—

শৈশব। নিধুবনে—কুঞ্জবনে। রসরঙ্গে—আনন্দে কৌতুক। মাতলুঁ—মাতিলাম। তোহে—তোমাকে। ভজব—ভজনা করিব। কোন বেলা—কোন সময়। চতুরানন—ব্রহ্মা। মরি মরি যাওত—মরিয়া যায়। তুয়া—তোমার। আদি অবসানা—আদি অন্ত। তোহে—তোমাতে। জনমি—জন্ম লইয়া। সমাওত—সমাগত, প্রবেশ করে। সাগর লহরী সমানা—সাগরের ঢেউয়ের মতো। শমন—মৃত্যু। আদি অনাদিক—আদি অনাদির। কহায়সি—বলা হয়। অব—এখন। তারণভার—ত্রাণের ভার।

ব্যাখ্যা

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত,
সাগর লহরী সমানা॥

আলোচ্য অংশটি বিদ্যাপতি রচিত প্রার্থনা পর্যায়ের পদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কৃষ্ণের নিকট কবির প্রার্থনা ব্যক্ত হইয়াছে।

কবি কৃষ্ণের নিকট আকুল প্রার্থনায় মগ্ন। জীবন সায়াহ্নে আসিয়া তিনি জগৎ সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, জীবনে পুত্র-মিত্র ও স্ত্রী—সব কিছুই অসার ও ক্ষণস্থায়ী। ইহাদের কোন মূল্যই নাই। কবি জীবনের অনেক সময় ইহাদের সান্নিধ্যে ব্যয় করিয়াছেন। এই সময় কৃষ্ণের কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এখন তিনি ইহার দুঃখজনক পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে তিনি জানেন যে কৃষ্ণ জগতের ঈশ্বর। তিনি জীবকুলের ত্রাতা। তিনি দীনদরিদ্রের প্রতি দয়ালু। তাই কবির বিশ্বাস, কৃষ্ণ তাঁহাকে দয়া করিবেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় যে ব্যর্থ, তাহা তিনি জানেন। অর্ধেক জন্ম কাটিয়াছে সুখ নিদ্রায়, অনেক সময় কাটিয়া গিয়াছে রমণী সান্নিধ্যে রস রঙ্গে, জরায়। কৃষ্ণ ভজনা করিবার সময়ই তিনি পান নাই। এখন তাই তিনি কৃষ্ণের শরণ লইয়াছেন। কৃষ্ণের কোন আদি অন্ত নাই। তিনি চিরন্তন। কত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণের বিনাশ নাই। সাগরের ঢেউ যখন সাগরে উত্থিত হইয়া সাগরে লীন হয়, জীবকুল কৃষ্ণের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। তাই কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কবি এই ভবসিন্ধু পার হইতে চান।

সাধারণ প্রশ্নোত্তর

চণ্ডীদাসের পদাবলী ও ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর।—বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যভাণ্ডার যে কবির দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধশালী, তিনি পদকর্তা চণ্ডীদাস। সাধারণ পাঠকের হৃদয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর অপরূপ সৌন্দর্য, প্রগাঢ় ভাবগাম্ভীর্য ও অতুলনীয় সুরমাধুর্য সম্পর্কে যে সংস্কার বর্তমান, তাহার অনেকখানি চণ্ডীদাসের সহিত জড়িত। চণ্ডীদাসের মতো

অধিক সংখ্যায় প্রথম শ্রেণীর পদ এক বিদ্যাপতি ব্যতীত অন্য কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কথায় "আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই, তাহারই জন্য কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন।"

চণ্ডীদাসের আবির্ভাব, জীবৎকাল, বাসভূমি ও জীবনের ঘটনাপঞ্জী সম্পর্কে সঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না। বিভিন্ন চণ্ডীদাসের সমাবেশে এগুলি রহস্যাবৃত। চণ্ডীদাসের পদাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে কোনরূপ বিচার বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া শুধু পদকর্তা চণ্ডীদাসের কথাই মনে রাখিতে হইবে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে চণ্ডীদাস বিভিন্ন রসের পদ রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পূর্বরাগ, বিরহ, প্রেমবৈচিত্র্য, আক্ষেপানুরাগ ও ভাব সম্মিলনের পদে তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব প্রেমার্তি তাঁহার কাব্যে হৃদয়ের প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবানুভূতির স্পন্দনে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আপন হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের যে স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার পদাবলীর করুণ সুরমূর্ছনার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার জীবন লব্ধ প্রেমের সাধনাই রাধার প্রেমসাধনার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। এইজন্যে তাঁহার রাধা প্রথমাবধি জীবন অভিজ্ঞা। বিদ্যাপতির মতো তাঁহার রাধার কোন ক্রমবিকাশ নাই। তিনি কৈশোরের লীলাচঞ্চলময়ী হইতে ধীরে ধীরে প্রোঢা কলাবতী হইয়া উঠেন নাই। বাস্তবিক, চণ্ডীদাস যে দৃষ্টিভঙ্গিতে রাধার অপরূপ ভাবমূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অভিনব।

চণ্ডীদাসের রাধা সার্থকনামা। যথার্থই তিনি কৃষ্ণের আরাধিকা—কৃষ্ণ-প্রেমে দেহ মন সমর্পিতা। প্রথমাবধি তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। এ উন্মত্ততার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। অন্তরাশ্রিত দুর্নিবার আশ্চর্য প্রেমের আকর্ষণ সঞ্জাত এই উন্মত্ততা হৃদয়কে পরমপুরুষের দিকে স্থির-সংহত করিয়া দেয়। বাহিরের জগৎ রুদ্ধ—কিন্তু অন্তরজগৎ উন্মুক্ত—সেখানে পরম প্রিয়তমের অপূর্ব সুন্দর মূর্তি নানা অপরূপ সৌন্দর্যবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত—দিকে দিকে শুধু পরম-পুরুষের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব। চণ্ডীদাসের রাধা এই দিব্যপ্রেমের সাধিকা বলিয়া তাহার অন্তর সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মতো বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।

পূর্বরাগের পদে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। রাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় তিনি যে আশ্চর্য হৃদয়াকুতি, যে সুনিবিড় আবেগ ও অভিনব কামগন্ধহীন প্রেমার্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। রাধার অন্তর জন্মলগ্ন হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা। চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছেন—

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণ নেহা।

কৃষ্ণকে তিনি দেখেন নাই। কৃষ্ণের প্রতি সুগভীর প্রেমার্তি তাঁহার হৃদয়ের

মধ্যে সর্বদাই বীজমন্ত্রের মতো উচ্চারিত হইতেছে। তাই কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই তিনি আকুল হইয়া গিয়াছেন—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

নাম শুনিয়াই অনুরাগ এত বাড়িল—তখন কৃষ্ণের শ্যামস্নিগ্ধ অঙ্গের স্পর্শে না জানি রাধার কি অবস্থা হইবে! রাধা এই চিন্তায় মনে মনে রোমাঞ্চিত—

নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

নামের মধু বদন এক মুহূর্তও ছাড়িতে পারে না। নাম জপে তাঁহার দেহ-মন সার্থক। নামের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ প্রাপ্তির ব্যাকুলতা দুর্নিবার হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহার পর বিশাখা সখি যখন বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া কৃষ্ণের অপরূপ সুন্দর মূর্তি দেখাইলেন, তখন রাধার যৌবন প্রেমতরঙ্গ কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণকে আপন সান্নিধ্যে পাইবার জন্য তাঁহার দেহ-মন উদগ্র অস্থির। প্রিয়দর্শন অস্থিরতা তাঁহাকে প্রতিনিয়ত চঞ্চল করিয়া তোলে—একমুহূর্ত স্থির হইয়া বসিতে দেয় না। তাই রাধা—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥

হৃদয়ের এই অস্থির চাঞ্চল্য—এই আনন্দ মধুর যন্ত্রণা—ইহার কারণ কি? কারণ তিনি ভাল করিয়াই জানেন। তথাপি একান্ত অসহায় ভাবে রাই-এর নিকট করুণ জিজ্ঞাসা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন—

রাই, কেন বা এমন হৈল।

কেন যে এমন হইয়াছে, তাহা রাধার চেয়ে আর বেশী করিয়া কে জানে। প্রেমের স্বরূপ তিনি ভালমতো জানেন বলিয়াই যৌবনে যোগিনী মূর্তি ধরিয়াছেন। প্রেমের স্বভাব তাঁহার জানা আছে বলিয়াই তিনি পূর্বরাগের মধ্যেও আপনার সুনিবিড় হৃদয়বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের পূর্বরাগের রাধা যেখানে উদ্ভিন্নযৌবনা লীলাচঞ্চলা নীল-নীচোল পরিহিতা নায়িকা, চণ্ডীদাসের রাধা সেখানে পূর্বরাগের শুরুতে 'রাঙাবাস পরা' 'যোগিনী পারা'। প্রেমের সার্থকতা বেদনায়—অশ্রুর মধ্যে প্রেমের সম্পূর্ণতা। প্রেম সম্পর্কে চণ্ডীদাসের গভীর তন্ময় ভাবদৃষ্টিই তাঁহার রাধাকে যৌবনে যোগিনী করিয়া তুলিয়াছে। বিদ্যাপতির রাধার মতো তাঁহার রাধা ললিত কলাবতী নহে—তাঁহার রাধা প্রিয়তমের উদ্দেশে আপন অন্তরের প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আত্মসমাহিতা। রাধার এ ধ্যানরতা মূর্তি দেখিয়া চণ্ডীদাসের কণ্ঠে তাই বিস্মিত জিজ্ঞাসা শোনা যায়—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা॥

বাহিরের জগতের কোন কথাবার্তা তাহার কানে প্রবেশ করে না। অন্তর্জগতের সমস্ত প্রেমব্যাকুলতা কৃষ্ণের উদ্দেশে সমর্পণ করায় তাহার বাহিক চৈতন্ত বিলুপ্ত। এমন কি ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ পর্যন্ত নাই—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

চণ্ডীদাস যেরূপ দক্ষতার সহিত রাধার পূর্বরাগে তাহার ধ্যানগম্ভীর বিষণ্ণ করুণ ভাবময়ী আরাধিকা মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তা অন্যত্র দেখা যায় না।

চণ্ডীদাসের সুগভীর হৃদয়বোধ তাহার পদাবলীর মধ্যে বিপ্রলম্ভের করুণ সুর আনিয়া দিয়াছে। একদিকে অপরিসীম আনন্দ ও অন্যদিকে দুঃসহ যন্ত্রণা—এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় যখন বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন প্রেম আপন গতিপথ খুঁজিয়া পায়। চণ্ডীদাস আপন জীবন সমুদ্র মন্থন করিয়া যে প্রেমের সুধাভাণ্ড লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অমর করিতে পারিয়াছিলেন। বিচিত্র জীবন রস রসিকতা তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণের মিলনের মধ্যে বিরহের অশ্রু সিঞ্চন করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল।—

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্য-সাধনায় পার্থক্য আছে। চণ্ডীদাস জীবন-দ্রষ্টা, কিন্তু বিদ্যাপতি রূপদ্রষ্টা। একজন জীবনের অতল তলে ডুব দিয়া তাহার অপরূপ ঐশ্বর্যে মোহিত হইয়াছেন, অপরজন রূপের জগতে দেহ-মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাই উভয়ের রাধা চরিত্র চিত্রনে মত পার্থক্য। চণ্ডীদাসের "রাধা মুগ্ধা নায়িকা নহেন—প্রেম প্রৌঢ়া নারী। আপনার পূর্ণ বিকশিত পরিণত প্রেমিক সত্তাটিকে লইয়া তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। …বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে—কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকে জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যে ভয় এবং দুঃখের প্রতি অনুরাগ। বিদ্যাপতির অনেক স্থলে রাধার সৌন্দর্য বর্ণনায় মাধুর্য আছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। চণ্ডীদাসের

'পিরীতি' গভীর দুঃখ বেদনার পথেই সুখের সন্ধান করিয়াছে। বিদ্যাপতির রাধা তরুণী নায়িকা, চণ্ডীদাসের রাধা প্রবীণা সাধিকা। প্রৌঢ় প্রেমের পূজারী বলিয়াই চণ্ডীদাসের প্রেমে সাধক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।"

[রবীন্দ্রনাথ]

প্রশ্ন ২।—জ্ঞানদাসের পদাবলী ও ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর।—চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জ্ঞানদাস। ইনি সম্ভবত ১৫৩০ খৃঃ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তরসাধক। চণ্ডীদাসের প্রেমব্যাকুলতা, সুগভীর জীবনবোধ এবং ভাবগাঢ়তা জ্ঞানদাসের পদাবলীতে অতি সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। চণ্ডীদাসের মত তিনিও মন্ময় কবি—উপরন্ত জীবন ও জগতকে রূপ-রসিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিবারও সহজাত ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাই তাঁহার বহু পদে অপূর্ব রূপ কল্পনার বর্ণাঢ্য সমারোহ দৃষ্ট হয়। একাধারে ভাব ও রূপ, হৃদয়বোধ ও মননচাতুর্য্য—এই উভয়ের সংমিশ্রনে জ্ঞানদাসের পদাবলী বৈষ্ণব-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

গীতি-ধর্মিতা জ্ঞানদাসের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানসভাব বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব প্রেমলীলাবৈচিত্র্য দর্শনে অহরহ কবি হৃদয়ের মধ্যে যে ভাবরাশি জাগিয়াছে, তাহাই অবশেষে গাঢ় হৃদয়াবেগের চাপে পদাবলীর আশ্চর্য্য সঙ্গীত মূর্ছনায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানদাস যুগপৎ দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা। চণ্ডীদাসের মত তিনি দর্শনে আত্মহারা হন নাই,—দর্শনের পর দৃষ্ট বিষয়কে আপন হৃদয়ানুভূতির সহিত সংমিশ্রিত করিয়া স্বকীয় বিশিষ্ট ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য চণ্ডীদাসের পদ হইতে জ্ঞানদাসের পদ আলাদা করিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। এই দিক দিয়া জ্ঞানদাসকে রোমান্টিক কবি বলা যায়। স্বীয় ভাব কল্পনা-মানসের আলোকে জীবনের নব রূপায়ন—ইহাই তো রোমান্টিক কবির মনোধর্ম।

রাধা চরিত্র পরিকল্পনায় জ্ঞানদাস অনেকাংশে মানবিক চেতনা সম্পন্ন। চণ্ডীদাসের মত তাহার যৌবনেই বৈরাগ্যের রঙে দেহ-মন রাঙাইয়া লন নাই। অথচ তিনিও কৃষ্ণের প্রেমে দেহ মন সমর্পিতা। চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাসের রাধা প্রেমের আরাধিকা কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণা চেতনাহীন রাঙাবাস পরা সাধিকা নহেন। কঠোর বৈরাগ্যময় সাধনার আবরণে তিনি নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন নাই। তাঁহার অন্তরের প্রেম মন্দাকিনী হইতে মাঝে মাঝে সাধারণ মানবীর ন্যায় কামনা বাসনা, মোহতৃষ্ণা, আনন্দ, বেদনা সুখ দুঃখের, তরঙ্গভঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। মনে হয় জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের মত জীবন-লব্ধ অনুভূতি-বৈচিত্র্যকে তাঁহার রাধার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। চণ্ডীদাস বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ানুভূতিকে রূপ দিয়াছেন, আর জ্ঞানদাস আনন্দবেদনা এই দুই হৃদয়ানুভূতির রূপকার।

জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের মত পূর্বরাগে অবিসংবাদিত কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও আক্ষেপানুরাগে তাঁহার আশ্চর্য সাফল্য সর্বজনস্বীকৃত। জ্ঞানদাস প্রকৃতপক্ষে আক্ষেপানুরাগেরই কবি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "জ্ঞানদাস নায়িকা অপেক্ষা নায়কের রূপ-বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে বা অলংকার শাস্ত্রে নায়কের রূপের কোন আদর্শ নাই সুতরাং জ্ঞানদাস অনেকটা স্বাধীনভাবেই নায়কের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই রূপ কল্পনায় শুধু অলঙ্কার সজ্জা বর্ণনা বা বাঁধা ধরা উপমারই প্রয়োগ নাই, আছে মুগ্ধা নায়িকার দৃষ্টিতে সৌন্দর্যতরঙ্গের সচল প্রবাহ। শ্রীকৃষ্ণের রূপকে যমুনা তরঙ্গে আন্দোলিত চন্দ্র প্রতিবিম্বের সহিত ও উঁহার রক্ত-চন্দন চর্চিত শ্যামদেহকে কালিন্দীর জলে ভাসানো জবা পুষ্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চণ্ডীদাস নায়িকার রূপ অপেক্ষা তাঁহার আত্মহারা ভাবতন্ময়তা, কৃষ্ণ নাম জপে অভিনিবিষ্টচিত্ততার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদে আবেগের সহিত দার্শনিক তত্ত্ব ও আধুনিক অন্তর্দৃষ্টিশীল কল্পনা—মননের কিছুটা সংমিশ্রন আছে। প্রেমের আত্মনিবেদনের পদে উভয়েই মানবজীবনের সীমা ছাড়াইয়া ভাবাদর্শের ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করিয়াছেন। ভাববৈচিত্র্যে জ্ঞানদাসের ও অনুভূতির গভীরতায় চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব। পদাবলী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও কাব্যগুণের পরাকাষ্ঠা এই দুই মহাকবির রচনায় উদাহৃত হইয়াছে।"

জ্ঞানদাস রূপ-মগ্ন কবি। বিদ্যাপতির মত তিনি রূপকে চক্ষুদ্বয়ের-সীমানাতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই; তিনি রূপকে হৃদয়ের গহন রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

রূপের সমুদ্রে চোখ ডুবিল, তাহার ফলে যৌবনের আলো আঁধারি হৃদয় অরণ্যে মন হারাইয়া গেল। মনের উপর তাহার যেন আর কোন অধিকার নাই। তাই যে পথ ধরিয়া রাধা প্রতিদিন অসংখ্যবার যাতায়াত করিয়াছেন, সেই পথ আজ তাহার কাছে অচেনা—প্রেমের ব্যাকুলতা সেই পথকে দীর্ঘ অফুরন্ত করিয়া দিয়াছে—

ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া না জানি কি করে প্রাণ॥

জ্ঞানদাসের পদে রূপ আছে, সেই সঙ্গে আছে রূপের আবেশ; হৃদয় আছে, সেই সঙ্গে আছে হৃদয়ের আনন্দ-যন্ত্রনা। প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমজর্জরিত দেহ-মনের সুগম্ভীর আনন্দ-যন্ত্রণা মিশ্রিত আকুতি তাই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

জ্ঞানদাসের সৌন্দর্যাকুতি আর একটি পদে শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনিন্দ্যসুন্দর রূপসৌন্দর্য দর্শনে তিনিও যেন রাধার মত বিমোহিত—

দেইখ্যা আইলাম তারে—
সই দেইখ্যা আইলাম তারে
এক সঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে॥

রূপকে জ্ঞানদাস চর্মচক্ষে না দেখিয়া মর্মচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাধার রূপাদর্শন অনন্যস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণের কালোরূপে মুগ্ধা রাধা তাই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিয়াছেন—

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ সদা লৈয়া রাখি বুকে॥

জ্ঞানদাসের বিরহের পদাবলীতে রাধাহৃদয়ের গভীর প্রেম, কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত ব্যাকুল বেদনা প্রকৃতির বিষণ্ণ বিধুর পরিবেশে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাস মিলনের মধ্যে বিরহের বিচ্ছেদ-ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছেন—মিলন—সে তো বিরহের আর এক নাম। তাই মিলনের মুহূর্তে রাধাকৃষ্ণের মানসচেতনায় বিরহের অশ্রুসজল ছায়াসম্পাত ঘটিয়াছে—

তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে
আচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদা লয়ে নাম॥

মিলনে যখন বিরহের যন্ত্রণা, তখন বিরহে রাধার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিরহের যন্ত্রণায় তিনি শূন্যতার বালুকাবেলায় বসিয়া স্মৃতির ঝিনুক কুড়ান। বিরহের যন্ত্রণা তাঁহার সর্বজগতে বিরাট এক হাহাকার সৃষ্টি করিয়া গভীর অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি করে।

একদিন তিনি দুর্বার প্রেমার্তি লইয়া প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এখন সে মিলন স্বপ্ন। মিলনের আনন্দ চলিয়া গিয়াছে, আছে শুধু বিরহের যন্ত্রণা। প্রেম মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া জগতের চিরন্তন বিরহিনীদের প্রতিনিধিস্বরূপ রাধার কণ্ঠ বিরহ-বেদনায় দীর্ঘশ্বাস মর্মরিত হইয়া উঠিয়াছে—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিলুঁ
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

প্রশ্ন ৩।—বিদ্যাপতি ও তাঁহার পদাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর।—বিদ্যাপতি আনুমানিক ১৩৮০ খ্রীঃ হইতে ১৪৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মিথিলার রাজার সভাকবির পদ অলংকৃত করিয়া ছিলেন। তিনি বাঙালী কবি নহেন বা বাঙলা ভাষায় তাঁহার পদাবলী রচনা করেন নাই। তথাপি প্রাক-চৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অনুবর্তনে বিদ্যাপতি পদাবলী আলোচনা অপরিহার্য।

পদাবলী ছাড়া বিদ্যাপতি আরও বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐগুলি তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, পরিমার্জিত ও বিদগ্ধ সৌন্দর্য দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্বোপরি অতুলনীয় কবিত্ব প্রতিভার পরিচায়ক। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা অবলম্বন করিয়া তিনি কত যে পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদ্যাপতি সর্বাংশে রূপ সচেতন শিল্পী। তাঁহার কাব্যদৃষ্টি সৌন্দর্য-চেতনা সঞ্জাত। দুই চোখ ভরিয়া তিনি জীবন ও জগতের সৌন্দর্য দর্শন করিয়া আপন সচেতন শিল্প-মানসের পরিমণ্ডলে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। রাজসভার বিলাসবর্ণাঢ্য পরিবেশ তাহার পদাবলীকে মণ্ডন কলাসমৃদ্ধ করিয়াছে।

বিদ্যাপতি রাধা চরিত্র পরিকল্পনায় আশ্চর্য সচেতন শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার রাধা বিদ্যুৎচঞ্চলা কলাবতী কমলিনী রাধা। চণ্ডীদাসের রাধার মত তিনি সর্বত্যাগিনী যোগিনী বা জ্ঞানদাসের রাধার মত বিরহভয়-কম্পিতা নহেন। লীলাচঞ্চল কৈশোরের দিনগুলি হইতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া যৌবনের স্থির সংযত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কৈশোরের অপরিস্ফুট কমলদল ধীরে ধীরে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া যৌবনের অপরিসীম মুক্তির মধ্যে তাহার স্বর্ণকমল দল মেলিয়া দিয়াছে। বিদ্যাপতির পদে রাধার ক্রমবিকাশের স্তরটি যেমন মনস্তত্ত্বসম্মত, তেমন কাব্যকুশলতা পরিচায়ক।

বয়ঃসন্ধির পদ—

বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। বয়ঃসন্ধি মানবজীবনে এক বিচিত্র সময়। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানবচিত্ত বিচিত্র এক রহস্যময় আলোছায়ার স্পন্দনে দোলায়িত হয়। একদিকে থাকে কৈশোরের লীলাচঞ্চল আনন্দ উচ্ছলতা, অন্যদিকে থাকে অজ্ঞাত যৌবন রহস্যের প্রতি ভয়চকিত আকর্ষণ—দেহ ধীরে ধীরে জাগিতে সুরু করিয়াছে, অথচ হৃদয়ে তাহার কোন সাড়া নেই। ভয়, শিহরণ, লজ্জা, আনন্দ, বেদনা—এই সকল বিচিত্র ভাবের সম্মেলনে বয়ঃসন্ধিকাল মানবজীবনে স্বল্পকাল স্থায়ী দুর্লভতম মুহূর্ত। এবং রাধা চরিত্রের এই দুর্লভতম মুহূর্তের চিরন্তন চিত্র অপূর্ব রঙে রেখায় সার্থকভাবে ধরা পড়িয়াছে জীবনরসিক বিদ্যাপতির কাব্যে।

জীবন হইতে তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য লইয়া বিদ্যাপতি যে তিলোত্তমা রাধা গড়িলেন, সে রাধা তাঁহার অন্তরবাসিনী বিচিত্ররূপিণী মানসী প্রতিমা। জগতের মধ্যে কবি তাহাকে অসংখ্য বিচিত্র-রূপে দেখিলেও অন্তরমাঝে তাহার একাকিনী স্থির প্রশান্ত আবির্ভাব। রাধা তাহার সৌন্দর্যলক্ষ্মী। মুগ্ধ আবেশ লইয়া তিনি এই সৌন্দর্য-প্রতিমার দেহে রহস্যময় যৌবনের আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন—

"খনে খনে নয়ন কোন অনুসরই
খনে খনে বসন ধূলি তনু ভরই ॥
খনে খনে দশনছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস ॥"

যৌবনের রহস্যময় হাতছানিতে কৈশোরের লীলাচঞ্চল দিনগুলি যেন চমকিত। যৌবনের হাতছানি অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এদিকে এত দিনকার কৈশোর-স্মৃতিও অবিস্মরণীয়। তাই রাধার বয়ঃসন্ধিতে কৈশোর আর যৌবনের মধ্যে সুরু হইয়াছে মধুর সংঘাত—

"শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুই দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥"

"শৈশবের মন আর যৌবনের মনে, শৈশবের দেহ আর যৌবনের দেহে দ্বন্দ্ব পড়িয়া গিয়াছে। এ চঞ্চল দেহের সহিত চঞ্চল মনের বিরোধ কি অল্প? কোথাও দেহ যৌবনের দুয়ারে আঘাত করিয়াছে, মনের তন্দ্রা ঘুচে নাই। আবার কোথাও দেহ অবিকচ কমলকোরকের মতই সৌরভ সুপ্ত অথচ তাহাকে ঘিরিয়া যৌবন মধুকর গুণগুণ করিয়া ফিরিতেছে। কবি এ সকলই দেখিয়াছেন, দেখিয়া বিভোর হইয়াছেন। সে বিভোরতা আত্ম-বিভোরতা নয়, বস্তু বিভোরতা, তাহা একান্তই তন্ময় রসদৃষ্টি। তাই শ্রীরাধিকার সৌন্দর্য-সন্ধির মধ্যে পথ হারাইয়াও কবি কোথাও মন হারান নাই।"

অবশেষে এ মধুর দ্বন্দ্বেরও এক সময় অবসান হয়। কৈশোর-জীবনের উপর যৌবনের সহজ অধিকার ঘোষিত হয়। তখন আর উচ্ছলক্রীড়া-চাঞ্চল্যের কথা মনে থাকে না—

"খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত ন হেরত সহচরী মাঝ॥"

এখন প্রেমের রহস্যময় বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের মধ্যে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে। তাই বনের হরিণীর মত রাধার প্রেমকথা চকিতে শুনিয়া লইবার প্রচেষ্টা—

"শুনইতে রসকথা থাপয় চিত।
জইসে কুরঙ্গিণী শুনয়ে সংগীত॥"

কৈশোরের লীলাচাঞ্চল্যের শেষ চিহ্নটুকুও এক সময় বিদায় লইল। স্থির-সংহত যৌবন বিরাট বিপুল সমারোহে প্রবেশ করিয়া রাধার জীবন আকাশ অসংখ্য দৃপ্ত কিরণজালে আবৃত করিয়া দিল।

পূর্বরাগের পদ—

বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদগুলি বয়ঃসন্ধি পদেরই অনুবর্তন বলা চলে। বয়ঃসন্ধি পদের রূপ তন্ময়তার সঙ্গে এখানে ভাব-তন্ময়তার সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাসের হাতে রাধার পূর্বরাগ অপূর্ব-ভাব-সুষমায় ছন্দায়িত, কিন্তু বিদ্যাপতি কৃষ্ণের পূর্বরাগ অংকনে তাঁহার কাব্যকুশলতা নিয়োজিত করিয়াছেন—

গেলি কামিনী গজহু গামিনী—
বিহসি পলটি নেহারি।····

অথচ রাধার পূর্বরাগ বর্ণনায়ও বিদ্যাপতি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—

"এ সখি কি পেখল এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি সপন স্বরূপ॥
কমল যুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥..."

অভিসারের পদ

অভিসারের পদে বিদ্যাপতিকে আবার নূতন করিয়া অনুভব করা যায়। এই সকল পদে রূপকে আশ্রয় করিয়া রূপাতীতের পানে অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। দেহের পটভূমিকায় তাঁহার কবিসত্তা বিদেহী চেতনায় বিলীন হইবার পথ খুঁজিয়াছে। প্রিয়তম কৃষ্ণের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় রাধার চিত্ত উদগ্র ব্যাকুল। দুরন্ত বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ, নিশ্ছিদ্র কৃষ্ণা-রজনী, অবিরত বজ্রপাতের ভয়ংকর শব্দ, বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো দীপ্তি, জলময় পথের দুর্গমতা—প্রিয় মিলনের আনন্দে এই সকল বাধা রাধা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। বিদ্যাপতি রাধার এই দুরন্ত সাহসের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়া আছেন—

বরিস পয়োধর ধরণী বারি ভর
রজনী মহাভয় ভীমা।
তইও চললি ধনী তুস গুণ মনে গুনি
তসু সাহস নাহি সীমা॥

প্রথমে ছিল লজ্জা ভয়। শেষে পরম বাঞ্ছিতকে পাওয়ায় আনন্দে সেই লজ্জা ভয় চেতনাও সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া রাধা দৃপ্তকণ্ঠে জানাইয়া দিয়াছেন—

"সখি হে আজ জাএব মোহী
ঘর গুরুজন ডর ন মানব
বচন চুকব নহি॥"

বিরহের পদ

মিলনের পদ রচনায় বিদ্যাপতি নানা বৈচিত্র্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের সহিত মিলনের আনন্দ রাধা সমস্ত অন্তর ভরিয়া উপভোগ করিয়াছেন। হাসিকান্না আনন্দ বেদনা মান অভিমানের মধ্য দিয়া মিলনের বৈচিত্র্য অনুভব হয়। কিন্তু এ মিলনের রেশ শেষ হইতে না হইতেই আসে বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস। এই বিরহের পদাবলীতে বিদ্যাপতি আবার নূতন সুরের মধুগুঞ্জন তুলিলেন। রাধাকৃষ্ণের মত্ত মিলনের বন্যায় যে আবিলতা জমিয়াছিল, তাহা যেন বিরহের অশ্রুতে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় "বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, তথা হইতে কবি অলংকারশাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া পরম ভাগবত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ফ্রেমে বাঁধা বিলাস কলাময়ী নায়িকার চিত্রপটখানা সহসা সজীব রাধিকা হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নব

লাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহান্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিদিগের অগ্রগণ্য।"

কৃষ্ণ রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। সমস্ত গোকুল দারুণ অন্ধকারে নিমগ্ন। সেই সঙ্গে রাধার হৃদয়েও বিরহের জমাট অন্ধকার। এই ভরা যৌবনে বিরহের যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করিবেন, তাহা ভাবিয়া রাধা অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন—

"ঈ নব-যৌবন বিরহে গমায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥"

কৃষ্ণ বিহনে তাঁহার জীবন শূন্য। প্রিয়-মিলনের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দেখিলে বিরহ যন্ত্রণা সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায়—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী॥
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥"

বর্ষার সমাগমে চতুর্দিকে আনন্দের বান ডাকিয়াছে। কিন্তু রাধার অন্তরে প্রবল দুঃখের ধারাপাত। তাঁহার দুঃখের সীমা নাই—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥"

প্রকৃতির উচ্ছল উল্লাসের সহিত তাল রাখিয়া জীবজগতের সকলেই আনন্দ উচ্ছল। জলের মধ্যে প্রমত্ত দাদুরীর গান, বজ্রপাতের শব্দে বিভোর হইয়া ময়ূরের নৃত্য, ডাহুকের ডাক ইত্যাদি সবই আসন্ন মিলনের ইঙ্গিতবহ। শুধু রাধার জীবনযৌবন মন্থন করিয়া বিরহের বুকফাটা ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার দুঃখে কবি বিদ্যাপতিও যেন অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

"তিমির দিগন্তরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥"

বিরহের অশ্রুজলে রাধার অন্তরে নূতন উপলব্ধির সঞ্চার হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, দেহ কামনার মধ্যে প্রেমের পূর্ণতা নাই। বহিরঙ্গ মিলন শুধু দুঃসহ যন্ত্রণা বহিয়া আনে। কোন আশা আকাঙ্ক্ষা সান্ত্বনাবাণীতে এ যন্ত্রণা দূর হয় না। তাই সখিদের সান্ত্বনাবাণীতে রাধা বলিয়াছেন—

"অঙকুর তপন তাপে যদি জারব—
কি করব বারিদ মেহে।
এ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব—
কি করব সো পিয়া লেহে॥"

সুতরাং এবার রূপ হইতে অপরূপের পথে অভিসার করিতে হইবে। রূপকে আশ্রয় করিয়াই রূপাতীতের আনন্দঘন অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে হইবে।

তাই মিলনের পথ বাহিয়া আনিয়াছে ভাব-সম্মিলন। এখানে বিরহের কোন যন্ত্রণা নাই, বিরহের কোন আশংকা নাই। এখানে দিবারাত্র প্রিয়তমের সহিত আনন্দময় মিলন। এই ভাব-সম্মিলনের আনন্দে রাধার যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত সমাহিত হইয়া গিয়াছে। তাই আপন মনে তিনি মিলনের অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন—

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥"

এখন আর দুঃখ নাই। এখন মাধবের সহিত নিত্যমিলন—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

বয়ঃসন্ধি হইতে বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া অনেক দুঃখ শোকের দিন পশ্চাতে ফেলিয়া অবশেষে রাধার ভাবলোকের স্নেহময় কোলে আশ্রয় লইয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন।

প্রার্থনার পদ

প্রার্থনার পদগুলিও বিদ্যাপতির অপূর্ব সৃষ্টি। অন্তর্লোকের দ্বার খুলিয়া কবির যেন জগত ও জীবন সম্পর্কে মহান এক উপলব্ধি জাগিয়াছে। অন্তরের মধ্যে সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বিরাট ঐশ্বরিক রূপ অনুভব করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিতে চাহিয়াছেন—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।"

শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য শক্তির আদিঅন্ত নাই। জীবজগৎ তাঁহার মধ্য হইতে জন্ম লইয়া তাহাতেই পুনরায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের এই বিরাটত্ব উপলব্ধি করিয়া বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥"

প্রশ্ন ৪। গোবিন্দদাসের পদাবলী ও ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। জীবনকালেই তিনি সুদুর্লভ কাব্য-খ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বিখ্যাত বৈষ্ণব রামচন্দ্র কবিরাজ। গোবিন্দদাসের অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তি সমস্ত বৈষ্ণব সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সুদূর বৃন্দাবনে বসিয়া তাঁহার কাব্যগুণমুগ্ধ শ্রীজীব গোস্বামী তাহাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন "—শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া যে কবিতাগুলি তুমি লিখিয়াছ, তাহা

পাঠ করিয়া আমি পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। মনে হইতেছে যেন আমি অমৃত পান করিয়াছি।"

গোবিন্দদাসের আদি নিবাস ছিল কুমার গ্রামে। পরে মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়াবুধুরী গ্রামে বসবাস করেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শোনা যায়, যৌবনে তিনি বিদ্যাপতির জন্মভূমি মিথিলার বিসফি গ্রামে যাইয়া বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করেন। বিদ্যাপতির কবিধর্মের সহিত তাহার আত্যন্তিক সাদৃশ্যের জন্য তিনি দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে পরিচিত। বৈষ্ণব কবি বল্লভদাস তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শীলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥

গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, অভিসার ও মাথুরের পদে গোবিন্দদাস বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অভিসারের পদে গোবিন্দদাস বলিতে গেলে তুলনাহীন।

গোবিন্দদাসের পদাবলীতে আবেগের সহিত সংযমের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। চৈতন্যদেবের লোকোত্তর জীবনলীলার আলোকে রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব প্রেমলীলা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার অন্তরমানসে দুরন্ত প্রাণাবেগ সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু গোবিন্দদাসের প্রধান কৃতিত্ব, তিনি সেই প্রাণাবেগকে স্থির সংযত সৌন্দর্যশিল্পে রূপায়িত করিতে পারিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্র অলংকারে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাহার পদাবলীকে বিশেষ একটি আভিজাত্য এবং শিল্পশ্রী আনিয়া দিয়াছে।

গোবিন্দদাস রূপ-সৌন্দর্যসাধক স্থাপত্যধর্মী কবি। দুই চোখ ভরিয়া তিনি সৌন্দর্য্যসুধা পান করিয়া তাহাকে হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে পুনরায় তিল তিল করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। এখানেই বিদ্যাপতির সহিত তাহার সাদৃশ্য। বিদ্যাপতির মত তাঁহার রাধা সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কবির মানস-প্রতিমা। কবির হৃদয় পদ্মদলে নিরন্তর ইহার আরাধনা। তবে বিদ্যাপতির রাধা অনেকাংশে মানবী গুণসম্পন্না—গোবিন্দদাসের রাধা সেই জায়গায় বস্তুনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমূর্তি। পৃথিবীর ধূলা মাটির সহিত তাঁহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ইহা ছাড়া শুচিস্নিগ্ধ ভক্তিপ্রাণতা গোবিন্দদাসের পদাবলীর আর এক বৈশিষ্ট্য। গৌরাঙ্গবিষক পদাবলীর মধ্যে তিনি আপন ভক্ত হৃদয়ের সকল আকুতি নিঙরাইয়া চৈতন্যের অপরূপ ভাবমূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অনবদ্য চিত্র-ধর্মিতার প্রকাশে গোবিন্দদাসের পদাবলী অনন্ত গৌরবে ভাস্বর।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলীতে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। গৌরাঙ্গদেবকে তিনি দেখেন নাই, তথাপি তিনি এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে যুগ হইতে চৈতন্যদেবের জীবনকাল খুব বেশী দূরে ছিল না। 'রাধাভাবদ্যুতি' কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বিরাটত্ব ও তীব্রত্ব তিনি ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। চৈতন্য সম্পর্কিত

অসংখ্য লোকশ্রুতি, সমসাময়িক কবিগণের চৈতন্যদর্শনজাত আবেগসমৃদ্ধ পদাবলী এবং সর্বোপরি স্বকীয় উপলব্ধিজাত কবিদৃষ্টি তাহাকে চৈতন্যের এত সুন্দর ভাবমূর্তি নির্মাণ করিতে সাহায্য করিয়াছিল—

নীরদ নয়নে   নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ   বিন্দু বিন্দু চুয়ত—
বিকশিত ভাব কদম্ব॥

গৌরকিশোর নটবরকে 'অভিনব হেম-কল্পতরু' করিয়া নির্মাণ করিতে তাঁহার মত আর কেহই পারে নাই। অন্য একটি পদে চৈতন্যের আশ্চর্য্য ভাবরসমূর্তি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—

বিপুল পুলকাকুল   আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেমভরে।
লহ লহ হাসনি   গদগদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥

চৈতন্যদেবের অপরূপ ভাব সুষমার সহিত আপন হৃদয়মাধুর্য্য মিশ্রিত করিয়া গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গ-বিষয়ক যে পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা তাহার অালোকসামান্য কবিকৃতির পরিচায়ক।

পূর্বরাগের পদেও গোবিন্দদাস অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। রূপ সৌন্দর্য্যসাধক কবি অন্তরের অসীম ব্যাকুলতা লইয়া সৌন্দর্য দর্শন করিয়াছেন—

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি
অথবা—রূপে ভরল দিঠি সোঙারি পরশ মিঠি।

অভিসারের পদে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কবি সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে দ্বিতীয় নাই। অলঙ্কার শাস্ত্রে জ্যোৎস্নাভিসার, দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার প্রভৃতি যে আট-প্রকার অভিসারের কথা বর্ণিত হইয়াছে, গোবিন্দদাসের পদে তাহার সবগুলিই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈচিত্র্য ছাড়াও অনুপম বর্ণনা, অনবদ্য চিত্রধর্মিতা, কবিহৃদয়ের সুগভীর সহানুভূতি ও চমকপ্রদ নাটকীয়তা তাঁহার অভিসারের পদগুলিকে সাফল্যের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে।

যুগযুগ ধরিয়া ভগবানের দুর্নিবার আকর্ষণে ভক্ত চলিয়াছে তাহার নিকট— এ যাওয়া সহজ যাওয়া নহে—এ যাওয়া কঠোরতম সাধনা। ইহার জন্যে চরম কৃচ্ছ্রসাধনা দরকার। তাই গোবিন্দদাসের রাধাকে অভিসারের পূর্বে— দুঃসাহসিক প্রস্তুতিপর্বে আত্মনিমগ্না দেখা যায়—

কণ্টকগাড়ি   কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি   ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

অভিসারের পথ অতি ভয়ংকর। অভিসারিকাকে সর্বরকম কষ্ট ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। রাধাও তাহাই থাকিয়াছেন। নিভৃত মন্দিরে দিনের পর দিন—রাতের পর রাত চলিয়াছে তাহার দুঃসাহসিক অভিসারের

প্রস্তুতি—বর্ষার পথে বিষধর সর্পের বাস—তাই সর্পবন্ধনও ওঝার নিকট শিখিতে হইতেছে। অবশেষে প্রস্তুতি পর্ব শেষ—প্রিয়তমের আহ্বান অন্তরে আসিয়া দোলা দিয়াছে। আর কি রাধা ঘরে থাকিতে পারেন? অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণের মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রকৃতি যেন প্রলয়বিক্ষোভে মাতিয়া উঠিয়াছে—

ঘন ঘন ঝনঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম মরি জাত॥
দশদিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উকচই লোচন তার॥

শব্দের ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিশ্বপ্রকৃতি যেন মূর্ত হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে যে অভিসার করে, সে যে কিরূপ দুঃসাহসিকা, তাহা ভাবিয়াই কবি আর্তকণ্ঠে বলিয়াছেন

সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥

কিন্তু অভিসারিকা আজ বধির। এই দুর্যোগঘন প্রাকৃতিক পরিবেশে যদি তাহার অভিসার না হইল, তবে তাহার সকল সাধনা—সকল প্রস্তুতি বৃথা। দুঃসহ কষ্টের মধ্য দিয়াই যদি প্রিয়তম ভগবানের সহিত মিলন না হইল, সে মিলনের সার্থকতা কি? তাই সকল প্রকার সতর্ক বাণীর প্রতি রাধা উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছেন—

কুলবতী কঠিন   কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠক বাধা।
নিজ মরিয়াদ   সিন্ধু সঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥

'যে অভিসারিকা তারই জয়।' সকল প্রকার দুঃখজয়ের সাধনায় রাধা বিজয়িনী। কোন বাধা বিঘ্নই তাহাকে প্রিয়মিলনের সংকল্পচ্যুতা করিতে পারে নাই। দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, দুঃসহতম বিপদ আপদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি চিরবাঞ্ছিত পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছেন। গভীর প্রশান্তির মধ্যে তাহার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে—পথের দুর্গমতার বিষয় কৌতুকছলে প্রিয়তমের কাছে জ্ঞাপন করিয়াছেন—

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ আগমন কথা   কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব   চারি পদ আয়লুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ   হেরই না পারিয়ে
পদ যুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥

গোবিন্দদাস অভিসারের পদে গভীর হৃদয়ানুভূতির সহিত রূপসৌন্দর্য চেতনার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটাইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার অভিসারের পদগুলি সুদক্ষ শিল্পীর হাতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপরূপ কারুকর্ম। ইহাদের সর্বত্র হীরণ্যদ্যুতি,

গাঢ় ভাবতন্ময়তা ও আশ্চর্য শিল্পচাতুর্য। তাঁহার অভিসারের পদাবলীর দুর্গম গতিশক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁহার রাধা সত্যই কৃষ্ণ-আরাধিকা। দুর্গম পথের দুঃসাধ্য সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি পাঠকের মনে দুর্গম গতিবেগের আমেজ ছড়াইয়া তাহাদের মোহাবিষ্ট করিয়া রাখেন। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদাবলী যথার্থ ই অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টিকর্ম।

প্রশ্ন ৫।—পূর্বরাগ কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠ পদকর্তা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর।—প্রেমাসক্ত নরনারীর জীবনে পূর্বরাগের গুরুত্ব অসাধারণ পূর্বরাগের স্বর্ণসূত্র ধরিয়াই তাহাদের জীবনযৌবনে প্রেমের আবির্ভাব ঘটে। পূর্বরাগ মিলনের গৌরচন্দ্রিকা। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনা শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ মিলনের পূর্বে পারস্পরিক রূপ দর্শন বা গুণশ্রবন প্রভৃতির দ্বারা পরস্পরের মনে যে রতি উৎপন্ন হয়, তাহাই পূর্বরাগ নামে অভিহিত।

কবি কর্ণপুর পূর্বরাগকে আটভাগে ভাগ করিয়াছেন। দর্শন তিন প্রকার—সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপট দর্শন বা স্বপ্নে দর্শন। শ্রবণ পাঁচ প্রকার—ভাট মুখে শ্রবণ, দূতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখে শ্রবণ, সঙ্গীতে শ্রবণ ও বংশীধ্বনিতে শ্রবণ।

নায়ক-নায়িকার মধ্যে সাক্ষাৎ দর্শনে অনুরাগ জন্মিতে পারে। [Love at the first right] সাক্ষাৎ দর্শন জনিত আনন্দে প্রাণমন বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি কি করে প্রাণ॥ [জ্ঞানদাস]

স্বপ্নে অনুরাগ জন্মাইবার নিদর্শন—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ
কো পাতিয়াব স্বপন স্বরূপ॥ [বিদ্যাপতি]

শ্রবণের মাধ্যমে নায়ক নায়িকার হৃদয়ে পূর্বরাগ সঞ্চারিত হইবার সার্থক উদাহরণ চণ্ডীদাসের পদে মেলে—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ অবলম্বনে অসংখ্য সুন্দর পদ রচিত হইয়াছে। রাধার পূর্বরাগই কবিগণের নিকট বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মে রাধা কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। তিনি শ্রেষ্ঠা হ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণকে প্রেমানন্দরস পান করাইবার জন্যই তাঁহার অস্তিত্ব। জন্মাবধি তিনি

কৃষ্ণকে প্রাণ-মন সমর্পন করিয়াছেন। কৃষ্ণের আরাধনার জন্য তিনি রাধিকা।
চৈতন্য চরিতামৃতে তাই বলা হইয়াছে—

হ্লাদিনীর সারাংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম্ সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব স্বরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

সুতরাং রাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিগণ যে তাহাদের অনেক কবিত্বশক্তি নিয়োজিত করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ভাবের গাঢ়তায়, বিষয়-বস্তুর লালিত্যে ও কবিহৃদয়ের আন্তরিকতায় পূর্বরাগের পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্য-সমুদ্রে প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মত বিরাজমান।

প্রাক্ চৈতন্য ও চৈতন্য পরবর্তী কবিবর্গের পূর্বরাগবিষয়ক পদাবলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। বড়ু চণ্ডীদাসের—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে কৃষ্ণের হৃদয়ে যে মিলনের আকাঙ্খা জাগিয়াছে, তাহাকে সংজ্ঞানুযায়ী পূর্বরাগ বলা গেলেও তাহা জৈব চাহিদা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহার তুলনায় চৈতন্য পরবর্তী কবি জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের সুর কত স্বতন্ত্র! পূর্বরাগের প্রকৃত অস্তিত্ব দেহে নহে—হৃদয়ে। বরং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডে রাধার আকুলতার মধ্যে যেন প্রকৃত পূর্বরাগের সুর ধ্বনিত হইয়াছে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

বিদ্যাপতির রাধাও বয়ঃসন্ধির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে যৌবনচেতনায় জাগিয়া উঠিয়া কৃষ্ণের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করিয়াছেন—

শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন গেল॥
....
সুনইতে রসকথা থাপয়ে চীত।
জইসে কুরঙ্গিনী সুনত সঙ্গীত॥

বিদ্যাপতির রাধাও প্রধানত দৈহিক রূপকে আশ্রয় করিয়া পূর্বরাগের সীমানায় প্রবেশ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতির পূর্বরাগ বর্ণনা দেহাশ্রয়ী—

কি কহব রে সখি কানুকরূপ।
কো পাতিয়াব সপনসরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীতবসন সৌদামিনি রেহ॥
সামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সুবেশ॥

প্রাক্ চৈতন্যযুগের দেহাশ্রিত পূর্বরাগ চৈতন্যদেবের লোকোত্তর জীবন-লীলার প্রভাবে নির্মল অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে আপন আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে। চৈতন্যদেব ছিলেন রাধাভাবের সাধক। তাঁহার জীবনলীলায় কৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগের ভাবটি আশ্চর্য মাধুর্যমণ্ডিত গরিমায় বারে বারে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—

কৃষ্ণ নাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগৎ॥

চৈতন্যদেবের অভিনব কৃষ্ণপ্রেম ব্যাকুলতার আলোকে চৈতন্য পরবর্তী কবিগণ যে পূর্বরাগের পদাবলী রচনা করিলেন, সেগুলি রূপে রসে সম্পূর্ণ অভিনব। ইন্দ্রিয় চেতনা এখানে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে—রূপ আশ্রয় লইয়াছে অরূপের মধ্যে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

অথবা—

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাহাঁ যাহাঁ অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই॥

[পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা চণ্ডীদাস। "চণ্ডীদাস ও তাঁহার পদাবলী' শীর্ষক অংশে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।]

প্রশ্ন ৬।—অভিসারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া ইহার শ্রেষ্ঠ পদকর্তা সম্পর্কে আলোচনা কর।

গতিই জীবন। গতিহীনতার অপর নাম মৃত্যু। কোন বাধাবিঘ্ন দুঃখ-কষ্ট গ্রাহ্য না করিয়া যাহারা দুর্বার গতির সাধনায় আত্মসমাহিত, তাহারাই অমৃতের সন্ধান পায়। গতির এই দুর্দম প্রাণাবেগের জন্য সাহিত্যেও ইহার বিশেষ একটি স্থান আছে। জীবনের গতিবৈচিত্র্য অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর সর্বদেশে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে 'অভিসারের' মধ্যে গতিবেগ আছে বলিয়া বৈষ্ণব কবিগণ এই বিষয়ক পদাবলীর মধ্যে তাহাদের জীবনমুক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। অভিসারের পদে বৈষ্ণব কবিকৃতি আশ্চর্য-রূপে উজ্জ্বল।

ইংরাজী সাহিত্যে অভিসারের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সেখানে নায়িকার নিকট নায়কের অভিসার। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে নায়িকাই নায়কের নিকট অভিসার করিয়াছে। ভারতীয় জীবনদর্শনে পুরুষ স্থাবর এবং স্বভাবত নিষ্ক্রিয়; প্রকৃতি জঙ্গম এবং গতিশীল। তাই নারী সেখানে পুরুষের নিকট অভিসারিকা। দুঃসহ দুঃখকষ্ট, দুর্দম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে প্রিয়তমের

নিকট অভিসারে বাহির হয়। এই ভাবেই সে মহাকাশের বুকে আপন অমৃত সাধনার বিজয় বৈজয়ন্তি উড়াইয়া দেয়। রবীন্দ্রকাব্যে অভিসারের তাৎপর্যটি সুন্দরভাবে ধরা পড়িয়াছে—

যে অভিসারিকা তারই জয়।
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

কিংবা—বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলচে একই তালে।
তাই নদী চলেচে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।

[পুনশ্চ]

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে অভিসারের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে—

যাভি সারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি
সা জ্যোৎস্না, তামসী যান যোগ বেশাভিসারিকা॥

জয়দেবের গীত-গোবিন্দে রাধার অভিসারের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়—

রতি সুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন মনুসর তংহৃদয়েশম্॥

পীতাম্বরদাস নায়িকার কয়প্রকার অভিসারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, জ্যোৎস্নাভিসার, কুৎঝটিকাভিসার, তীর্থাভিসার, উন্মত্তাভিসার, সঞ্চরাভিসার।

পদাবলী সাহিত্যে অভিসারের মত একটি লৌকিক বিষয়কে বৈষ্ণব কবিরা যেভাবে আশ্চর্য এক অলৌকিকতার মধ্যে লইয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যিই বিস্ময়কর। অন্যান্য সাহিত্যের মত বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসার লৌকিক নহে—এখানে ইহা একটি দুঃসাধ্য ভগবদ সাধনা। ঈশ্বরলাভের উপায়স্বরূপ 'অভিসার' বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনধারায় মানুষ সমাজ ও সংসারের অসংখ্য ভোগ এবং কর্ম-বন্ধনে জড়িত। এই বন্ধন সে নিজে চেষ্টা করিয়া কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারে না। কিন্তু ইহারই মধ্যে ঈশ্বরের আহ্বান আসিয়া যখন তাহার দেহ-মনে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তাহার হৃদয়কে অবিরত আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন সে সমাজ সংসারের কথা বিস্মৃত হইয়া প্রিয়তম ঈশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করে। এইসময় সে সমাজ ও সংসারের ভয়, লজ্জা, শাসন, প্রভৃতি কিছুই গ্রাহ্য করে না। তুষার-শীতল শৈত্য, দারুণ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাত্রি, অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ, পথিপার্শ্বস্থ বিষধর সর্পভয় এই সকল বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভ করিবার সাধনায় তাহার সকল দেহাত্মবুদ্ধি তখন বিলুপ্ত হয়। এইভাবে দুঃসহ দুঃখকষ্টের সাধনায় জয়ী হইয়া সে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করে। অলৌকিক অভিসার ভিন্ন লৌকিক অভিসারের জন্য মানুষ কখনো এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে না বা চায় না। ইহা ছাড়া অভিসারের আর একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে বাধাবিঘ্ন বিপদ আপদের পথে অগ্রসর হইতে হয়। দুঃখজয়ের সাধনায় জয়ী

হইয়া তবেই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায়, অভিসার ইহাই শিক্ষা দেয়। বৈষ্ণব কবিগণ অভিসারের ব্যঞ্জনাটুকু লইয়া তাঁহার জয়গানে উচ্ছ্বসিত।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের কামনায় এই আশ্চর্য অভিসারের ব্যঞ্জনা রাধার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রাধার অভিসার গমন বৈষ্ণব সাহিত্যে লীলাতত্ত্বের মেরুদণ্ড। সমাজ সংসারের সকল প্রভাব বন্ধন তুচ্ছ করিয়া রাধা চলিয়াছেন কৃষ্ণাভিসারে। তাঁহার সকল মনপ্রাণ কৃষ্ণের সহিত মিলন বাসনায় আকুল। এই অভিসারের যে নিভৃত প্রস্তুতি তাহাও বড় ভয়ঙ্কর—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

এ প্রস্তুতি এমন প্রস্তুতি যে ইহার জন্য নিজের হাতের কঙ্কনের বিনিময়ে বেদের নিকট হইতে ‘ফনিমুখ বন্ধনের বিদ্যা’ শিক্ষা করিয়াছেন। প্রস্তুতিপর্বের পর সাজসজ্জা। প্রিয়তমের নিকট যাইতে হইবে। রূপলাবণ্য উজাড় করিয়া তাহার পায়ে ঢালিয়া দিতে হইবে। তাই রাধা অপরূপ সাজে সজ্জিত হইলেন—

নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর লাবণি বরণি না হোই।
নিরমল বদন হাসরস পরিমলে মলিন সুধাকর অম্বরে রোই॥

সাজসজ্জা করিয়া রাধা অভিসারে বাহির হইলেন। দুর্যোগঘন বর্ষণমুখরিত রাত্রি। আকাশে ঘনঘন মেঘগর্জন। অন্ধকারে নিজের শরীর দেখা যায় না। এই দুর্যোগে কেহ বাহির হয় না। সখী তাই রাধাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥

তাছাড়া প্রকৃতির বুকে যেন মহাপ্রলয়ের সূচনা দেখা দিয়াছে—

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরমে মরি যাত॥
দশদিশ দামিনি দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥

তাই কবি উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন তুলিয়াছেন—

সুন্দরি. কৈছে করবি অভিসার।

কিন্তু রাধা কোন নিষেধ শোনেন নাই। সীমার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তিনি অসীমের মধ্যে বিলীন হইতে চলিয়াছেন, ক্ষুদ্র গৃহের সীমানা ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষের আনন্দময় সত্তায় নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিতে চলিয়াছেন, এ সময় কি তাঁহার নিষেধ শুনিলে চলে? চলে না। তাই রাধা সমস্ত দুঃখকষ্ট জয় করিয়া অবশেষে তাঁহার দুঃখের দেবতাকে লাভ করিয়াছেন।

[‘অভিসার’ পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। ‘গোবিন্দদাস ও তাঁহার [illegible]’ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।]

প্রশ্ন ৭।—গৌরচন্দ্রিকার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর।—সাধারণভাবে 'গৌরচন্দ্রিকা' কথাটির অর্থ গৌরাঙ্গরূপ চন্দ্রের কিরণ অথবা গৌরাঙ্গ সম্পর্কিত পদাবলী। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে 'গৌরচন্দ্রিকা' বিশেষ একটি অর্থের ব্যাখ্যা করে—এই অর্থ মুখবন্ধ, ভূমিকা বা উপক্রমণিকা। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ রাধাকৃষ্ণের অপরূপ প্রেমলীলাকে সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিবার জন্য বিভিন্ন স্তরে ভাগ করিয়াছেন। যেমন পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, মাথুর, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি। বিভিন্ন পদকর্তা এই সকল বিষয় লইয়া অসংখ্য পদ রচনা করিয়াছেন। কীর্তনীয়াগণ বিভিন্ন কবি রচিত সমরসের পদাবলী সজ্জিত করিয়া পালাবদ্ধ কীর্তনের রূপ দিয়া আসরে গান করেন।

এই গান করিবার পূর্বে তাঁহাদের একটি অলিখিত সর্ত পালন করিতে হয়। তাহা হইল: আসরে যে বিষয়ে পালাগান করিবেন, সেই বিষয়ের ভাবের অনুরূপ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ তাঁহাদের পূর্বে গাহিতে হইবে। ইহাই গৌরচন্দ্রিকা। সুতরাং বলা যায়, রাধা-কৃষ্ণলীলার ভাবানুরূপ যে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ কীর্তনের প্রারম্ভে ভূমিকাস্বরূপ গাওয়া হয়, তাহাই গৌরচন্দ্রিকা। অতএব দেখা যাইতেছে, একমাত্র পালাবদ্ধ রস-কীর্তনের সময়েই গৌরচন্দ্রিকা অপরিহার্য্য।

গৌরাঙ্গ জীবনলীলা অবলম্বনে যে সকল পদাবলী রচিত হইয়াছে, তাহা গৌরপদাবলী নামে পরিচিত। সকল গৌরপদাবলী গৌরচন্দ্রিকা নহে, কারণ গৌরপদাবলী রাধা কৃষ্ণলীলার ভাবদ্যোতক নহে। বিশেষ বিশেষ যে সকল গৌরপদাবলী রাধা-কৃষ্ণলীলার ব্যঞ্জনা করে, তাহাই গৌরচন্দ্রিকা। সুতরাং গৌরচন্দ্রিকা মাত্রই গৌরপদাবলী; কিন্তু গৌরপদাবলী মাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নহে। যেমন—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক—মুকুল অবলম্ব
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব।

গোবিন্দদাসের এই পদটি গৌর-লীলার পদ। ইহার মধ্য দিয়া চৈতন্যের অপরূপ সৌন্দর্য ও মহিমার বিষয় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ—প্রেমলীলার কোন ভাব ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়া ইহাকে গৌরচন্দ্রিকা বলা যায় না। এই ধরনের আরো অসংখ্য পদ আছে যাহাদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কোন ভাবসাদৃশ্য নাই। এগুলির কোনটিই গৌর-চন্দ্রিকা নহে। যেমন—

পরশ-মণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হইল কত জনা॥

অথবা—

কি লাগিয়া দণ্ডধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ॥

মনে রাখিতে হইবে, রাধাকৃষ্ণ লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশিকা গৌরাঙ্গপদাবলীর অপর নাম গৌরচন্দ্রিকা।

শ্রীচৈতন্য ছিলেন রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের ভাব-বিগ্রহ। অন্তর-মানসে তিনি কৃষ্ণ, বহিরঙ্গ অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তিতে তিনি রাধা। এই জন্য তাঁহাকে বৈষ্ণব সাধকগণ 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' বলিয়াছেন। চৈতন্য রাধাভাবের সাধক ছিলেন। কৃষ্ণবিরহ কাতরা রাধার করুণ ক্রন্দন তাঁহার মধ্য দিয়া নিরন্তর ঝরিয়া পড়িয়াছে। তিনি ছিলেন বিপ্রলম্ভের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার জীবনলীলার পূর্বরাগ, বিরহ, প্রভৃতি যে সকল বিচিত্র ভাবোন্মাদনা ফুটিয়া উঠিত, তাঁহার সহচরবৃন্দ বারবার সেগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট এগুলি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার ভাব-প্রতিরূপ। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে বংশীবদন চট্ট, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের পদাবলীতে চৈতন্যের বিভিন্ন ভাবমূর্তি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহারাই গৌরচন্দ্রিকার আদি রচয়িতা। তবে চৈতন্যের সময়ে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার নিয়ম ছিল না। চৈতন্যের তিরোধানের পর লীলাকীর্তনের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং সেই সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকা অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে।

উদাহরণের সাহায্যে গৌরচন্দ্রিকার স্বরূপটি স্পষ্ট করা যাইতে পারে। ধরা যাক, কীর্তনীয়াগণ আসরে পূর্বরাগের পালাবদ্ধ কীর্তন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তার রচিত পূর্বরাগের পদগুলি ক্রমানুযায়ী গীতার্থে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। মূল পালা কীর্তন শুরু করিবার পূর্বে তাঁহারা আসরে এমন একটি গৌরাঙ্গ পদাবলী কীর্তন করেন যাহার মধ্যে রাধার পূর্বরাগের ব্যঞ্জনা আছে। যেমন—

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে বয়ান করই অবলম্ব॥
ক্ষণে ক্ষণে গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত॥

ইহা রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যের সুগভীর কৃষ্ণ-আর্তির চিত্র। এই পদ শুনিয়া রসজ্ঞ শ্রোতার মর্মজগতে রাধার পূর্বরাগের ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠে। তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে এইবার আসরে পূর্বরাগের পালাকীর্তন হইবে। ইহার পরই হয়ত কীর্তনীয়া মূল পূর্বরাগের পদাবলী কীর্তন শুরু করেন—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার—
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশাস সঘন

রাধাকৃষ্ণের অভিসার, বিরহ প্রভৃতি বিষয়ের পদাবলী সম্পর্কেও এই একই ব্যাপার। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ কৃষ্ণভাব লইয়াও বহু গৌরপদাবলী রচনা করিয়াছেন। এ সকল পদে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণভাবের সাধক। কৃষ্ণের বাল্যলীলা, কালীয়-দমন, পূর্ব গোষ্ঠ, উত্তর গোষ্ঠ প্রভৃতি বিষয় কীর্তন করিবার পূর্বে উপরোক্ত গৌরচন্দ্রিকা গীত হয়।

কীর্তন গানের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গাহিবার প্রধান কারণঃ বিচিত্র জন-মণ্ডলী পূর্ণ আসরে চৈতন্যের লোকোত্তর জীবন প্রভাব পূত আধ্যাত্মিক ভাব পরিবেশ সৃষ্টি করা। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রেমলীলা বৈচিত্র্য সাধারণ শ্রোতার নিকট প্রাকৃত প্রেমাশ্রিত বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ সাধারণ শ্রোতার নিকট রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যময় দিকটি সাধারণত অনাবিষ্কৃত থাকে। তাই কীর্তনের ভূমিকা স্বরূপ গৌরচন্দ্রিকা গীত হওয়ায় সমস্ত পরিমণ্ডলে গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গৌরচন্দ্রিকার আলোকে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা প্রাকৃত নরনারীর কামনা-বাসনাপূর্ণ প্রেমলীলা হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়া শ্রোতার মনে এক অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের বাণী বহন করিয়া আনে। গৌরচন্দ্রিকা প্রাকৃত লীলা সঙ্গীতকে Mystic Inteipritation দান করে। শ্রীকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গরূপে ধূলার ধরণীতে বিচিত্র লীলা করিয়া গিয়াছেন, শ্রোতার মনে এই ভাবটি জাগ্রত হয়। কীর্তনের প্রারম্ভে গৌরাঙ্গদেবের পবিত্র জীবনলীলা স্মরণ করিলে হৃদয় নির্মল পবিত্র হইয়া যায়। ইহার ফলে শ্রোতা বৃন্দাবন লীলার যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারেন। রায় রামানন্দের ভাষায়—"গৌরচন্দ্রিকা ব্রজলীলার পরমান্নে একবিন্দু কর্পূর।"

প্রশ্ন ৮।—ব্রজবুলির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর।—ব্রজবুলি কোন বিশেষ দেশের ভাষা নহে। ইহা একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা—শুধুমাত্র বৈষ্ণব পদ-রচনার ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার। ব্রজবুলির সৃষ্টি হইয়াছে মিথিলায় এবং ইহা ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে বাঙলা দেশে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ—এই দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া ব্রজবুলির ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে। তবে ব্রজবুলি নামটি সাম্প্রতিক কালের উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত। খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আর্য ভাষাভাষীদের মধ্যে আর্যাবর্তের কথ্য ভাষার সার্বভৌম সাধুরূপকে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্য্য রচনার ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার এক নাম অবহট্‌ঠ। এই লৌকিক ভাষা হইতেই ব্রজবুলির সৃষ্টি। বাঙলা-আসাম-উড়িষ্যায় এককালে ব্রজবুলিতে পদাবলী রচনার ব্যাপক অনুশীলন ছিল। সম্ভবত মৈথিল কবি উমাপতি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাবে ইহা হইয়াছিল। তাই প্রাচীন মৈথিলী ও ব্রজবুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য।

"তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য ব্রজবুলির একটি প্রধান বিশেষত্ব। ব্রজবুলির ছন্দ মাত্রামূলক, এবং পদান্ত অ-কার অলুপ্ত। সুতরাং ব্রজবুলি কবিতায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার যথেচ্ছ ও নির্বাধ। এই কারণে এবং লৌকিক মূলকতার জন্য অর্ধতৎসম শব্দের প্রয়োগও খুব আছে। বৈদেশিক আরবী-ফারসী শব্দ ব্রজবুলিতে নাই।" [ডঃ সুকুমার সেন।]

'ব্রজবুলি' সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে ইহা ব্রজের অর্থাৎ বৃন্দাবনের বুলি বা কথা। অনেকের বিশ্বাস রাধাকৃষ্ণ এই ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন। কিন্তু ইহা একেবারেই অর্থহীন। রাধার বাস্তব অস্তিত্বই যেখানে নাই, সেখানে তাঁহার কথা বলিবার মাধ্যম যে 'ব্রজবুলি' হইতে পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়। বৃন্দাবনবাসী কোন দিনই ব্রজবুলিতে কথা বলে নাই। ইহা একান্তভাবে বৈষ্ণব পদ রচনার ভাষা—বাঙলা, আসাম ও উড়িষ্যার অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের অন্যতম ফলশ্রুতি।

বাঙলা সাহিত্যে ব্রজবুলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পদ রচিত হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, যশোরাজ খাঁন সর্বপ্রথম ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন—

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আর পয়োধর গোর'

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে ব্রজবুলির বিশেষ প্রচলন হয় নাই। তাঁহার তিরোধানের পর 'ব্রজবুলি' ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতির রচনায় ব্রজবুলির নিদর্শন আছে—

তপন কিরণ যদি অংকুর দগধিল কি করব জল অভিষেকে।
দখভরে প্রাণ বাহির যদি নিকসিব কি করব ঔষধি বিশেখে॥

চৈতন্য পরবর্তীকালে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও রায়শেখর ব্রজবুলিতে পদ-রচনায় অসামান্য সাফল্যলাভ করিয়াছেন—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা তরুণ-চরণ চল চলই
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥

[গোবিন্দদাস]

কিংবা—

পাহু নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখে কত ভেল॥

[জ্ঞানদাস]

বাঙালী কবিগণ 'ব্রজবুলি' এত স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে মনে হয়, ইহা যেন তাঁহাদের মাতৃভাষা। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য 'ব্রজবুলি' এককালে ব্যাপকভাবে সমগ্র পূর্ব ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

১। ঔদার্যগুণ: 'ব্রজবুলি'র ঔদার্যগুণের জন্যই সম্ভবত বৈষ্ণব কবিগণ ব্যাপকভাবে ইহার অনুশীলন করিয়াছিলেন। ব্রজবুলির উদারতা ও নমনীয়তার জন্য যে কোন প্রাদেশিক ভাষার শব্দ ইহার মধ্যে অতি সহজে সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারিয়াছে। সকল প্রদেশের কবিগণ ইহার মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে পারিয়াছেন।

২] ছন্দোগুণ : ব্রজবুলির ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের সমাবেশে হিল্লোলিত। অধিকাংশ শব্দ স্বরান্ত। ছন্দের আন্দোলনের জন্য ব্রজবুলি কবিদের প্রিয়। তাঁহারা ব্রজবুলির মাধ্যমে ছন্দের সুললিত কারুকার্য দেখাইতে পারিয়াছেন। ব্রজবুলির ছন্দোগুণ অসামান্য।

৩] সার্বজনীনতা : 'ব্রজবুলি' বিশেষ কোন প্রাদেশিক ভাষা নহে বলিয়া সর্বভারতে ইহা সার্বজনীন আবেদন সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় আর্যাবর্তের বহুলোক বাঙলা পদাবলীর রসাস্বাদনের জন্য উৎসুক ছিলেন। অথচ তাঁহারা বাঙলা ভাষা জানিতেন না। তাই বাঙলাদেশের অনেক কবি ব্রজবুলির মতো সার্বজনীন সর্বজন উপভোগ্য ভাষার আশ্রয় লইয়াছিলেন।

৪] স্বতন্ত্রভাষা : গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসসাধনার নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি ভাষা থাকুক ; বৈষ্ণব কবিগণের ইহা কাম্য ছিল। বাঙলা এবং সংস্কৃত ভাষা সর্বজন ব্যবহৃত সাধারণ ভাষা। বৈষ্ণব সাধনার মতো অলৌকিক রসের অভিব্যক্তিতে তাই সাধারণ ভাষা বর্জন করিয়া ব্রজবুলির মতো স্বতন্ত্রভাষা গ্রহণ করা হইয়াছে।

৫] দুর্বোধ্যতার আবরণ : ব্রজবুলি সাধারণ পাঠকের নিকট বেশ দুর্বোধ্য। অনেক সময় কবিরা ইচ্ছাকৃতভাবে পদাবলীকে দুর্বোধ্যতার আবরণে আবৃত করিবার জন্য ব্রজবুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসার, পূর্বরাগ, মিলন প্রভৃতি বিষয়ক পদাবলী প্রাকৃত-ভাষায় রচিত হইলে সাধারণের নিকট তাহা অনেক সময় অশ্লীল বলিয়া মনে হইত। এই অশ্লীল ভাবটি পরিহার করিবার জন্যই কবিরা অনেক সময় ব্রজবুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

৬] প্রেমলীলার ভাষা : 'ব্রজবুলি' ভাষার শব্দ ও ছন্দোলালিত্য বেশী। তাই রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা-বৈচিত্র্য বর্ণনা করিবার পক্ষে এই ভাষা অত্যন্ত উপযোগী। ব্রজবুলিতে রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলা বৈচিত্র্য হৃদয়ের মধ্যে অলৌকিক রসাবেশ আনিয়া দেয়।

৭] জন চাহিদা : এককালে বাঙালী পাঠকগণ বাঙলা ভাষায় রচিত পদাবলীর চেয়ে ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলী খুব পছন্দ করিতেন। তাঁহাদের চাহিদার জন্য ব্রজবুলিতে অধিক সংখ্যক পদ রচিত হইত।

৮] সাঙ্গীতিক উপযোগিতা : বাঙলা ভাষার চেয়ে ব্রজবুলিতে রচিত পদাবলী কীর্তন, সঙ্গীত ও সুরের অলংকরণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ব্রজবুলি পদের সুরমাধুর্য কীর্তনের ক্ষেত্রে ইহার বিরাট চাহিদা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই চাহিদার জন্যও ব্রজবুলির পদ ব্যাপকভাবে রচিত হইয়াছিল।

ব্রজবুলির ধ্বনিমাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথও ব্রজবুলিতে কতিপয় সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন। তথাপি বৈষ্ণব কবিদের ব্রজবুলির আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের পদে যেন অনেকখানি অনুপস্থিত। রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব প্রেমলীলা বৈচিত্র্য দর্শনে মুগ্ধ কবিবর্গ তদগত চিত্তে হৃদয়ের

ঐকান্তিক ভক্তি ভালবাসা আন্তরিকতা লইয়া ব্রজবুলিতে যে সকল পদাবলী রচনা করিয়াছেন, সেগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

প্রশ্ন ৯। মাথুরের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া 'মাথুর' অংশের পদগুলির কাব্যমূল্য ও সৌন্দর্য বিচার কর।

উত্তর। সাহিত্যে বিরহ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রেমের পূর্ণতা মিলনে, কিন্তু বিরহই সেই মিলনকে গভীর মাধুর্য রসে পূর্ণ করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। বিরহের বেদনাই মিলনের আনন্দকে সম্পূর্ণতা দান করে। প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে বিরহের দুস্তর ব্যবধান, মিলনের জন্য উভয়ের মধ্যে উদগ্র ব্যাকুলতা, অথচ মিলনের কোন উপায় নাই। বিরহ সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় এক অব্যক্ত বেদনায় ক্রন্দন মুখরিত হইয়া ওঠে। বিরহের মধ্যে প্রেমিকার হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ নিবিড় বলিয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য বিরহের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে বিরহ অবলম্বন করিয়া বহু উৎকৃষ্ট পদ রচিত হইয়াছে। মিলনের নিবিড় আনন্দে রাধাকৃষ্ণের হৃদয় উদ্বেল। মিলনের পর বিরহের ব্যথা-বেদনা দুইটি হৃদয়কে দীর্ঘশ্বাসে মর্মরিত করিয়া আবার নূতন করিয়া মিলনের পটভূমি প্রস্তুত করিয়া দেয়।

'মাথুর' বিরহেরই অঙ্গরূপ। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কংসকে দমন করিবার জন্য মথুরা চলিয়া গেলেন, আর বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন না। কৃষ্ণের এই চিরতরে বৃন্দাবনত্যাগ করিয়া মথুরা গমনকে অবলম্বন করিয়াই মাথুরের পদগুলি রচিত হইয়াছে। বিরহ সাময়িক। কারণ বিরহের পর মিলনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু 'মাথুর' চির-বিচ্ছেদ। ইহার পর আর মিলনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তাই 'মাথুর' শুধু অন্তহীন ব্যথা বেদনারই পদাবলী।

রাধার জীবন কৃষ্ণময়। কৃষ্ণকেই তিনি দেহ-মন প্রাণ নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছেন। কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রবাহিত। কৃষ্ণের বাহিরে তাঁহার কোন জগৎ নাই। সেই কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য মথুরায় চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তাহার ঘর শূন্য, বৃন্দাবন নগরীতে নামিয়া আসিয়াছে শূন্যতার হাহাকার। যমুনার কূল তাঁহার প্রিয় স্থান—কারণ এখানে কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এখন কি ভাবিয়া তিনি যমুনার কূলে যাইবেন? কৃষ্ণের সহিত পাছে মিলনের বাধা জন্মে, তাই তিনি বক্ষে হার পরিতেন না, স্তনে চন্দন লেপন করিতেন না, সেই কৃষ্ণের সহিত এখন নদী ও পর্বতের চিরন্তন ব্যবধান। প্রাকৃতিক পরিবেশ রাধার দুঃসহ দুঃখকে যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণের মধ্যে প্রিয়-মিলনের জন্য হৃদয় যখন ব্যাকুল, তখন কৃষ্ণের অনুপস্থিতি তাঁহার হৃদয়কে যেন শতধারে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে—

এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

আকাশ বাতাস বর্ষার আবেশে আচ্ছন্ন। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। ময়ূর আনন্দ উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। ভেকের দল মনের আনন্দে ডাকিতেছে, ডাহুক ডাকিতেছে। এই সময় প্রিয় মিলনের জন্য তাঁহার হৃদয় অধীর। কিন্তু কোথায় তাঁহার কৃষ্ণ—

কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া

প্রচণ্ড দুঃখের আঘাতে রাধার জীবন্মৃত অবস্থা। কৃষ্ণবিচ্ছেদে তাঁহার জীবনধারণের কোন সার্থকতা নাই। তিনি এখন মৃত্যুপথ যাত্রিনী। ইহার পর যদি কখনও কৃষ্ণ আসেনও, তবে তাহাতে কোন লাভ হইবে না। কারণ নবজাত অঙ্কুর যদি প্রচণ্ড সূর্য কিরণে মরিয়া যায়, তবে তাহাতে বর্ষার জলসিঞ্চনেও কোন লাভ হয় না। তাঁহার এখন নবযৌবন—অথচ এই নবযৌবনই বিরহের তাপে শুষ্ক হইয়া গেল—

এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে।

কৃষ্ণ প্রেমের সিন্ধু। জগতবাসী তাঁহার প্রেম সমুদ্রে প্রেমপিপাসা চরিতার্থ করে। কিন্তু রাধার ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত অবস্থা। কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়েশ্বর হওয়া সত্বেও তাঁহার প্রেমপিপাসা মিটিল না। ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? চন্দনতরু সুগন্ধি ছড়ায়। অথচ তাঁহার ভাগ্যে ইহার বিপরীত হইল। কৃষ্ণরূপ চন্দন তরু তাঁহার কাছে প্রেমের সুগন্ধি ছড়াইলেন না। তাঁহার ভাগ্যে চন্দ্রও স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারা বর্ষণের বদলে অগ্নি বর্ষণ শুরু করিল। রাধার এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? তাঁহার ভাগ্যে শ্রাবণ মাস বৃষ্টিহীন; কল্পতরু বন্ধ্যা—

শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥

'মাথুর' শীর্ষক পদগুলির কাব্যমূল্য যথেষ্ট। বৈষ্ণব কবিগণ এই পদাবলীর মধ্যে রাধার হৃদয়ার্তি বর্ণনাকালে শাশ্বত প্রেমিকার অন্তহীন ব্যথা বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ যথার্থ জীবনরসিক। মানব জীবন প্রবাহে মিলনের আনন্দ অতি ক্ষণস্থায়ী, এবং সেই হিসাবে বিরহানুভূতিই যে জীবনের শাশ্বত সত্য, তাহা তাঁহারা অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাহাদের পদাবলীতে বিরহের ব্যাকুলতা এরূপ করুণ রসনিবিড়তায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মাথুরের মধ্যে যে বিচ্ছেদ, তাহা চির-বিচ্ছেদ, ইহার মধ্যে মিলনের সুদূরতম সম্ভাবনাও থাকে না। তাই মাথুরের পদ রচনায় বৈষ্ণব কবিগণ তাহাদের হৃদয়ার্তি উজাড় করিয়া রাধার বুকভাঙ্গা ক্রন্দনজর্জরিত হৃদয় বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন ১০। পূর্বরাগ কাহাকে বলে? পূর্বরাগের সহিত অনুরাগের পার্থক্য কি? পূর্বরাগ পর্যায়ে বিদ্যাপতির বা চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভার পরিচয় দাও।

উত্তর। বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্বরাগ একটি বিশেষ রস পর্যায়। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যকে যে বিশেষ বারোটি রসপর্যায়ে ভাগ করিয়াছেন, পূর্বরাগ তাহার প্রথম ধাপ। পূর্বরাগের সংজ্ঞায় "উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ মিলনের পূর্বে প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক দর্শন, বাক্য শ্রবণ প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্তে যে অনুরাগ জন্মে তাহাকে পূর্বরাগ বলা হয়।

পূর্বরাগ প্রেমিক প্রেমিকা উভয়ের মনেই জাগ্রত হয়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার পূর্বরাগের উপরেই বৈষ্ণব কবিগণ সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণের প্রতি তাহার প্রবল অনুরাগ ও আকর্ষণ অবলম্বন করিয়া অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণের অনুপম রূপমাধুরীই রাধার পূর্বরাগের উৎস। অবশ্য কৃষ্ণনাম শ্রবণে কিংবা কৃষ্ণের গুণগান শ্রবণেও রাধার হৃদয়ের অনুরাগের বিষয় বৈষ্ণব কবিগণ ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিছু কিছু পদে রাধার রূপদর্শনে কৃষ্ণের পূর্বরাগও বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বরাগের সঙ্গে অনুরাগের পার্থক্য আছে। পূর্বরাগ মিলনের পূর্বের প্রেমের অবস্থা। এই অবস্থায় মনে কিছুটা দ্বিধা সঙ্কোচ সংশয় থাকিয়া যায়। কিন্তু অনুরাগ প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ের তন্মাত আকর্ষণ। এই অনুরাগই প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় বন্ধন। উজ্জ্বল নীলমণিতে বলা হইয়াছে—

"যে প্রিয়তম সর্বদাই হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছেন, তাহাকে নব নব রূপে ও রাগে অনুভব করার নাম অনুরাগ। অনুরাগের উদাহরণ—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

(জ্ঞানদাস)

পূর্বরাগ যেহেতু বৈষ্ণব কবিদের প্রিয় বিষয়, তাই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রত্যেকেই পূর্বরাগ অবলম্বনে বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদ

বিদ্যাপতি রাধাকে কৃষ্ণের সহিত একাত্ম করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহার জীবনসর্বস্ব। তাই তাঁহার যাহা কিছু প্রিয় কৃষ্ণ যেন তাহারই প্রতিরূপ। কৃষ্ণ তাঁহার হাতের দর্পণ। এই দর্পণে নিজের প্রতিবিম্বের মধ্য

দিয়া তিনি যেন কৃষ্ণরূপই দর্শন করেন ; কৃষ্ণ তাঁহার নয়নের অঞ্জন—নয়নের স্নিগ্ধ জ্যোতিস্বরূপ আর মুখের তাম্বুল। এবং—

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥

বিদ্যাপতির কিছু পদে রাধার লাজরক্তিম অনুরাগদীপ্ত রূপেরও প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রবল, অথচ গুরুজন সঙ্গে থাকার জন্য কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছেন না। তাই চাতুরী করিয়া গুরুজনদের পশ্চাতে ফেলিয়া আগে চলিয়া গিয়াছেন—

সখি হে, অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব-জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তহি ফেরি॥

বিদ্যাপতির রাধা যেহেতু বুদ্ধিমতী চতুরা, তাই তাঁহার পূর্বরাগের মধ্যেও সেই চাতুর্য ও বুদ্ধিকৌশলের ছায়া পড়িয়াছে।

চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদ

চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে পূর্বরাগ ভাবমণ্ডিতা রাধার অপূর্ব ভাব মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি যেরূপে কৃষ্ণনামে ব্যাকুল রাধার হৃদয়ার্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি করিয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণ আরাধিকা। তাঁহার জীবন কৃষ্ণময়। তাই কৃষ্ণনাম শুনিয়াই তাঁহার হৃদয় অনুরাগে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে রাধা আনন্দে আত্মহারা। এই নামই তাঁহার জীবনশক্তি। নামের মধ্য দিয়াই কৃষ্ণকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে—

না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।

রাধা কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। কৃষ্ণপ্রেম তাঁহাকে ঘর-সংসার সম্পর্কে উদাসীন করিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ এত তীব্র যে তিনি বহিঃপ্রকৃতির মধ্যেও সর্বদা কৃষ্ণের সন্ধান করেন—

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।

কিংবা—

একদিঠি করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।

কৃষ্ণের আকর্ষণে রাধা ঘরে থাকিতে পারেন না। বারবার ঘর বাহির করেন। কৃষ্ণ কদমতলায় আসিয়া দাঁড়াইবেন। তাই তাঁহার দৃষ্টি কদম-তলায়। গুরুজন বা যে তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া ফেলিতে পারেন, সে তাঁহার মনে নাই। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি বারবার চমকাইয়া উঠেন।

কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই যে অপূর্ব অনুরাগ ইহার কোন তুলনা নাই। দুজনেই যেন দুজনের প্রাণের সহিত বদ্ধ। দুজনের এই প্রেম স্বর্গীয়। পৃথিবীতে প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের অনেক তুলনা করা হয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম তুলনাহীন—

জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।
— — — — —
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥

চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদগুলি ভাবগম্ভীরতায় হৃদয়স্পর্শী।

জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদ

জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদে কৃষ্ণের অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে রাধার সুতীব্র অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানদাস রূপসচেতন কবি। রূপের প্রতি তাঁহার গভীর আসক্তি। তাই এই রূপই পরিণামে কৃষ্ণের গুণগানে পরিণত হইয়াছে। তাই তাহার রাধা কৃষ্ণের আশ্চর্য রূপ দেখিয়া বলেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

কৃষ্ণের অনুপম রূপ রাধার হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণের প্রেমলাভের জন্য তাই তিনি এমন অস্থির—

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

কৃষ্ণকে রাধা মন-প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছেন। তাই কৃষ্ণের রূপ শতবার দেখিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় না—

রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥

কৃষ্ণের হাসিতে যেন মধু ঝরিয়া পড়ে। কৃষ্ণের হাসির মধ্যেই রাধা অমৃত রসের সন্ধান লাভ করেন। গুরুজনদের মধ্যে যখন থাকেন, তখন কৃষ্ণের

প্রসঙ্গ উঠিলে তাঁহার দেহ-মন আনন্দাচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেই আনন্দ এত গভীর যে চোখে জল আনিয়া দেয়—

পুলক ঢাকিতে করি যত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি॥

জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদাবলী ভাবগভীরতায় চিরস্পর্শী।

প্রশ্ন ১১। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অভিসার পদ রচনায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভার পরিচয় দাও।

উত্তর।—'অভিসার' কথাটির সাধারণ অর্থ—প্রেমিক প্রেমিকার পারস্পরিক অনুরাগ হেতু সঙ্কেতস্থানে গমন। প্রেমিক প্রেমিকা উভয়ের পক্ষেই অভিসার—সম্ভব। তবে বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়িকার অভিসার বর্ণনায় সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যে নায়িকা নিজে অভিসার করে বা নায়ককে অভিসার করায়, তাহাকে বলা হয় অভিসারিকা। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাই একমাত্র অভিসারিকা।

বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসারের একটি বিশেষ গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রহিয়াছে। বৈষ্ণব ভক্তের চোখে কৃষ্ণ হইতেছেন ভগবান। রাধা ভক্তের প্রতীক। ভগবানের কাছে ভক্তকে যাইতে হইবে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া—সুতীব্র দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া। সুখের বিলাস সম্ভোগে ভগবানকে লাভ করা যায় না। দুঃখ-কষ্টের কঠোর সাধনা ও তপস্যা ভগবান প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। কৃষ্ণের উদ্দেশে রাধার অভিসারের মাধ্যমে এই তত্ত্বটি ব্যক্ত হইয়াছে।

অভিসার নানাপর্যায়ের হইতে পারে। যথা: জ্যোৎস্নাভিসার, তমসাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থাভিসার, উন্মত্তাভিসার, বর্ষাভিসার, অসময়গমনাভিসার। বৈষ্ণব কবিগণের পদে এই সকল অভিসারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির অভিসারের পদ

বিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলীর মধ্যে রাধার অভিসারের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। কৃষ্ণের উদ্দেশে রাধার অভিসারের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তিনি অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রথমে তিনি রাধাকে ভয়চকিত বালিকা হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন। পরবর্তী পর্যায়ে রাধা অধিকতর সাহসিকা। তৃতীয় পর্যায়ে হৃদয়ের প্রেরণায় কৃষ্ণের উদ্দেশে অভিসার যাত্রা করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ

'অভিসার' পর্যায়ের পদে কবি গোবিন্দদাস অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে 'অভিসার' পদ রচনায় তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বস্বীকৃত।

গোবিন্দদাস অভিসারিকা রাধার অপূর্ব এক ভাবমূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন।

রাধা কৃষ্ণপদে নিবেদিতা। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁহার দেহ-মন ব্যাকুল। তাই সমাজ সংসার প্রাণভীতি—সব কিছু তুচ্ছ করিয়া তিনি অভিসারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গভীর অন্ধকারে তাঁহাকে পথ চলিতে হইবে। পথে পায়ে কাঁটা ফুটিতে পারে, সাপ কামড়াইতে পারে—তাই তিনি আগেই সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলিতে হইবে। তাই রাধা করযুগলে চক্ষু আবৃত করিয়া পথ চলা অভ্যাস করিতেছেন। সাপুড়ের কাছ হইতে সাপের মুখ বন্ধন শিক্ষা করিতেছেন—

কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগগুরু পাশে।

অভিসারে যাত্রার এই প্রস্তুতির জন্য গুরুজনরা নানা কথা বলেন। কিন্তু রাধার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। কৃষ্ণকে তিনি হৃদয় উজাড় করিয়া ভালোবাসিয়াছেন। কৃষ্ণই তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া আছে। তাই কোন কথা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—

গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমান॥

রাধার এই অভিসার যাত্রা যে কত বিপদসঙ্কুল, গোবিন্দদাস তাহা অপূর্ব বর্ণনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে, দশদিকে বিদ্যুতের ঝলক। ইহার মধ্যে জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে—

ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥

এই দুর্যোগের মধ্যে প্রচণ্ড বিপদ মাথায় লইয়া রাধা কিরূপে যে তাঁহার দয়িতের কাছে পৌঁছাইবেন, কবির মনে সে প্রশ্ন জাগিয়াছে—

সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥

কিন্তু ভক্ত যেখানে ভগবানের সহিত আত্মলীন হইতে চায়, সেখানে প্রাণভয় তো তুচ্ছ। তাই রাধার কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোন বাধাই নয়—

কুল মরিয়াদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঞে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥

রাধার অভিসার গোবিন্দদাসের পদে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে।

প্রশ্ন ১২। সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া উদাহরণ দাও—

প্রেমবৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ ও নিবেদন।

উত্তর। প্রেমবৈচিত্ত্য

প্রেমবৈচিত্ত্য হইতেছে প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ের বিচিত্র একটি ভাব। প্রেমিক নিকটেই অবস্থান করিতেছে, তথাপি প্রগাঢ় প্রেমব্যাকুলতায় প্রেমিকার মনে হয়, এই বুঝি প্রেমিককে তিনি হারাইয়া ফেলিতেছেন। ইহার ফলে হৃদয়ে যে বিরহবোধ জনিত বেদনার সৃষ্টি হয়, তাহাকেই বলা হয় প্রেমবৈচিত্ত্য। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিঃ স্যাৎ প্রেমবৈচিত্ত্য মিষ্যতে॥

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ প্রেমবৈচিত্ত্য অবলম্বন করিয়া অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন। রাধা কৃষ্ণকে মন-প্রাণ দিয়া ভালোবাসেন। তথাপি কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনুযোগের শেষ নাই—

বঁধু, কি আর বলিব তোরে,
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে।

প্রেমের জ্বালা বড় কঠিন। এই প্রেমের জ্বালায় জলিয়া রাধা বলেন—

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥

আক্ষেপানুরাগ

'আক্ষেপানুরাগ' প্রেমবৈচিত্ত্যেরই একটি অবস্থাভেদ। প্রেমিকের প্রতি তীব্র অনুরাগবশতঃ আক্ষেপ বা খেদোক্তি—ইহাই হইতেছে আক্ষেপানুরাগ।

কৃষ্ণকে রাধা প্রাণাধিক ভালোবাসেন তাঁহার উদ্দেশে তিনি দেহ-মন-প্রাণ নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়াছেন। তথাপি কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনুযোগের সীমা নাই। শুধু কৃষ্ণের প্রতি নয়, কৃষ্ণের মুরলীর প্রতি, কালো রঙের প্রতি, সখীগণের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি, এমন কি নিজের প্রতিও তাঁহার আক্ষেপ।

আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। রাধার কৃষ্ণ অন্ত প্রাণ। কৃষ্ণের বাহিরে তাঁহার জীবনের অস্তিত্ব নাই। কৃষ্ণেরও যে রাধা অন্ত প্রাণ, তাহা তিনি জানেন। এবং জানিয়াও বলিয়াছেন—

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥...

কোন বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই, ডাকি বন্ধু বলি॥

কৃষ্ণপ্রেমের সুতীব্র যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিয়াছে রাধার আক্ষেপোক্তির মধ্যে। কৃষ্ণকে তিনি সর্বসুখের আশ্রয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমের গভীর দহনজ্বালা তাঁহাকে যেন বেদনার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

সেই প্রেমের দহনজ্বালা যেন রাধার জীবনের অলঙ্ঘ্য নিয়তি—

সখি কি মোর করমে লেখি
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥

রাধা ভাবিয়াছিলেন যে প্রেমের মধ্যে বোধহয় সর্বসুখের আনন্দ। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখিলেন যে ইহা সুতীব্র যন্ত্রণাময়। ইহাতে পিপাসার শান্তি হয় না, পিপাসাকে আরও বাড়াইয়া দেয়—

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু—
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥

নিবেদন—

ভক্ত যেখানে ভগবানের পদতলে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করেন, তাহাকে নিবেদনের পদ নামে চিহ্নিত করা যায়। রাধা ভক্তশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ তাঁহার ভগবান। কৃষ্ণের নিকট নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পান—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥

কৃষ্ণের জন্য রাধা সমাজ-সংসার সব ত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বিনা তাঁহার গতি নাই—

ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর।

কৃষ্ণের মধ্যেই তাঁহার পৃথিবী। কৃষ্ণের জন্য তিনি সব নিন্দা কলঙ্ক সহ্য করিতেও প্রস্তুত—

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

প্রশ্ন ১৩। বিদ্যাপতির প্রার্থনা পদগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। বৈষ্ণব পদাবলীতে 'প্রার্থনা' পদ পর্যায়ের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। পূর্বরাগ হইতে শুরু করিয়া মাথুর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্কের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, প্রার্থনার পদ তাহার ব্যতিক্রম। এখানে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক অনেক দূরাবস্থিত। ভক্ত যেন জীবন অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া পরিণত জীবনে ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গের প্রার্থনায় ব্যাকুল। বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যান্য পদ যেমন মানবিক রসে উজ্জ্বল, প্রার্থনার পদ কৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপে সমৃদ্ধ।

বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলি ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গের বাসনায় ভাবগম্ভীর। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে ঈশ্বরই মানুষের শেষ আশ্রয়। ঈশ্বরের নিকট নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করা ভিন্ন উপায় নাই। তাই কবি তিল তুলসী দিয়া নিজেকে কৃষ্ণপদে সমর্পণ করিয়াছেন—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

কবি জানেন যে তাঁহার জীবনের দোষ-গুণ বিচার করিবার কালে গুণের ভাগ বেশী পাওয়া যাইবে না। ইহার পরের জন্মে পশুপাখী প্রভৃতি যে ভাবেই জন্ম হোক না কেন, তাঁহার চিত্ত যেন ঈশ্বরের পাদপদ্মেই থাকে এই তাঁহার প্রার্থনা—

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥

ঈশ্বরের কাছে ভক্তের পরীক্ষা কর্মের মধ্যে। ভক্ত যদি পুণ্যকর্মে জীবন অতিবাহিত করে, তবে তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভ কঠিন হয় না। কিন্তু কবির পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। জীবনের অনেকাংশ কাটিয়া গিয়াছে ভোগবিলাসের মধ্যে—

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥

কবির অর্ধেক জীবন কাটিয়া গিয়াছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে, নারী সঙ্গে ভোগবিলাসের মধ্যে যৌবনের দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে। এইরূপ জীবন-যাপনের পরিণতি যে ভয়াবহ কবি তাহা জানেন। তথাপি কৃষ্ণের প্রতি আছে তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস—

তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।

গৌরাঙ্গের স্বর্ণকান্তি গৌর অঙ্গ সঞ্চরমান। কবির মনে হইয়াছে যে স্বর্ণবৃক্ষ সঞ্চরণ করিতেছে—

কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥

ইহা তো সাধারণ বৃক্ষ নহে—লক্ষ লক্ষ ভক্তের অভীষ্ট প্রদান করেন, তাই তিনি 'কল্পতরু'। ভ্রমরের মতোই ভক্তবৃন্দ তাঁহার প্রতি ধাবমান।

গৌরাঙ্গদেব নিরন্তর অপার্থিব প্রেমামৃত বিতরণ করিয়া চলিয়াছেন ভক্তবৃন্দকে—

অবিরত প্রেম— রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

গোবিন্দদাসের পদে একদিকে যেমন গৌরাঙ্গের অসমান্য রূপ-লাবণ্যের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তাঁহার বিবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও প্রকাশ ঘটিয়াছে—

চম্পক শোন— কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর তনু লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ মনোমোহন ভাঙনি রে॥

গৌরাঙ্গ তাঁহার প্রেমধর্মের মাধ্যমে, কলিযুগের কাল ভুজঙ্গের ভয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—

ত্রিভুবন-মণ্ডল কলিযুগ-কাল
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে॥

গৌরাঙ্গ মৃদু মৃদু হাসেন। গদগদ বচনে মধুর বাক্য বলেন, নিজের আনন্দে নৃত্য করেন। গৌরাঙ্গের প্রেমরসে ভাসিয়া "অবশ মহিমণ্ডল"। গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে চৈতন্যের অসামান্য ভাবালেখ্য নির্মাণ করিয়াছেন।

———

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক! উর তবে, উর, দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত; উরি দাসে দেহ পদছায়া!
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ! শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা ঝলসি নয়নে!
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা,
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মুরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলীলহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?

এ হেন সভায় বসি রক্ষঃকুলপতি
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,

যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত,
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
এক মাত্র বাঁচে বীর, যে কাল-তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি।
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কতক্ষণে চেতনা পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ,—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল-সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এ শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভু সম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ, হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে:—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে,—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"

উত্তর করিলা তবে লঙ্ক-অধিপতি;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"

এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,

আদেশিলা;—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত;—"লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে, কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা, বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর,—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি রবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হেমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহুসহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা;—"সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ-ছটা,
তরুরাজী; ফুলকুল—চক্ষুঃ-বিনোদন,

যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ-রতন-পূর্ণ, এ জগতে যেন
আনিয়া নিখিল ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রিদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে !
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ ! শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে,
পাকসাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তস্রোতে !
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !
চূর্ণ রথ, অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে ! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনু,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রিদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ-দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে !
পড়িয়াছে বীরবাহু— বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র-কেশরী !

কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?"
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম
প্রশস্ত ; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধুপানে চাহি ;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায় এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি, প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি ;
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে !
হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু, অশ্রুবারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী, কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
'একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?"

উত্তর করিলা, তবে দশানন বলী ;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে।
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তূলারাশি, এ বিপুল-কুল
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ, শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে, তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা,—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
কিন্তু ভেবে দেখ নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন লোভে, কহ, রাজা এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ! হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !"
এতেক কহিলা বীরবাহুর জননী
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এতদিনে" (কহিলা-ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম। এ কাল-সমরে,
আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি !
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে

বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পুরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক-শিরস্ক-শিরে, ভাস্বর-পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে বর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি, সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পুরস্ত—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বল।
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হ্রেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসি(র) ঝন্ ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে!
টলিল, কনকলঙ্কা বীরপদভারে,—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দ; কারাগারে রোধিতে সবারে।
হাসিয়া কহিলা দেব;—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ;—সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণ কমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙ্গা পা দু'খানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ; গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,

ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণ পাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ-উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ
খদ্যোতিকাদ্যুতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রানন!
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল আসনে;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?
পবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা, প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি
ইন্দিরা—
রক্ষঃ কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে
লাগিলা,—
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো
মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম! সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে
রমার আশার বাস হরির উরসে;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে।
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা
রূপসী;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটী, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দু'খানি
তেঁই পাণি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—"হায় লো
স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি।
ওই যে ক্রন্দন ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী
বিদরে হৃদয় মম, শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী।"
সুধিলা মুরলা;—"কহ শুনি
মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো
মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল বালা রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগর-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর
ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কালদণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।

রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে ;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি ! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
সুরীশ্বর সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে ?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না ;—
"হায়, সখি, বীরশূন্য স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী !
মহারথিকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে ! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি !
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড় রথে,
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষেড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি !
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি ! সমর মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন ! অন্যান্য যত কত আর কব ?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী ,
—"কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরী মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে ?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল-সমরে ?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী ;—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে ! কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা ! কেমনে এথানে
আর বাস করি আমি ? যাও চলি, সখি,
প্রবাল আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল ধনুঃ-
বিবিধ-রতন কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জুকুঞ্জবনে !
উতরি জলধি-কূলে পশিলা সুন্দরী
নীল অম্বুরাশি। হেথা কেশব বাসনা
সুরাক্ষী, চলিলা রক্ষঃকুল লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসবত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কতক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড় ; চারিদিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;
বহিছে বাসন্তানিল ; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে
রত্নরাজী, তূণে শর, মণিময় ফণী।

উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাশর শর; কিন্তু খরতর
আয়ত লোচনে শর। নবীন-যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে, নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী;
সঙ্গীত তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারিদিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর-সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে, কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারুকূলে।
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাসা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা;—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা:—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব,
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি, তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল-সমরে, রক্ষঃ চূড়ামণি!"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল-মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে!"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর, কিংবা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেনকালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী;—"কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?" হাসি উত্তরিলা

বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"

উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িয়া মৈনাক শৈল, অম্বর উজলি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘমাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা
জলধি।

সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে
মাতি,—
বাজিছে রণ-বাজনা, গরজিছে গজ,
হ্রেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী,
উড়িছে কৌষিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা! হেনকালে তথা
দ্রুতগতি উত্তরিলা মেঘনাদ রথী।

নাদিল কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা;—"হে রক্ষঃ-
কুল-পতি,
শুনেছি মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না
পারি;
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শির, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল-সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু:—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা
মোরে,
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!

কহিলা রাক্ষসপতি;—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর; বীরমণি।
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে,
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"

এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে,
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃকুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রাণি, দেখ ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র-কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরি! ধন্য রক্ষঃ পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!

কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্য-চর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক লঙ্কা জয় জয় রবে।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা-রবে।
আইলা সুচারু তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা-দেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রয়ে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা হরিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা-মাঝে
হেমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা! রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে! রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ, হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী,
রক্ষঃ কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা, "হে সুরপতি, কেন যে আইনু,
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র; "হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা-পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মাগো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্যফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এতদিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব! বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হ'তে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।

মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব: কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহী নাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃকুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!'
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা, আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে।
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি!
কহিলেন সুরীশ্বর; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার! সর্ব্বশুচি-বরে,
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী,—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে। কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা"—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।
সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি রথ, চাহি শচী-পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুরবচনে
একান্তে, "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি।
পরিমল সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উত্তরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর-নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেববান, সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয় অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে!
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে!
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী

শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন।
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ!
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ সুরীশ্বরী,
প্রবেশিলা সুরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!
পূজিলা শক্তির পদ মহাশক্তিভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা:—"কহ দেব, কুশলবারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে?"
কর যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী,—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি পদে? কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতি।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিষধর শেষ, তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অম্বে!
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!"
উত্তরিলা কাত্যায়নী;—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহাস্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি, তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা;—
"পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর পতি—
দেব দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃসত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতন মাত্র তাহার আছিল
অমূল্য, যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট। হায়, মা, স্মরিলে,
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ জ্ঞান করে দেবগণে।
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি?"
নীরবিলা সুরীশ্বর; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী সুরীশ্বরী মধুর-সুস্বরে;
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোকবনে বসি দিবানিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা-চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড; কে দণ্ডিবে, দেবি,

এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি!
মরি, মা, সরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"
হাসিয়া কহিলা উমা;—"রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনি
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে!
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা! মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ-কুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূরিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র! কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম।
কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন;—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-
দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ-কুল, রাখ
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা;
হ্রাসো বসুধার ভার, বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির, বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গলনিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর-কুঞ্জবনে পিককুল মিলি!
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা;—"লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে
অকালে?"
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গগনে,
নিবেদিলা হাসি সখী, "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে
বারি-সংঘটিত ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুনাথ
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে
অভয় প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিণি!"
কাঞ্চন আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী;—
"দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে। যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈমগেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইয়া বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা, কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকসিত
কুসুম রতন-রাজী, বাজিল চৌদিকে
বাদ্যদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক
মোহিল!
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুরধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয় পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগিব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা!
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভবানী
ভাবিলা, "কি ভাবে আজি ভেটিব
ভবেশে?"
ক্ষণকাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-

যায় তরঙ্গিণী-রূপে, বসিলা নিমিষে।
বাজিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
জতগতি বায়ু-পথে কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে বিবাস্পতি-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা, নমি
সুকেশিনী;—"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর-বপুঃ, আনি
নানা আভরণ; হেরি যে সবে পিণাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা!"
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনাইলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি-খচিত; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী,
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা; রসানে মাজ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে,
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল-সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে,—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ: আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!
কহিলা শৈলেন্দ্রসুতা;—"চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙ্গিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে, ধরি ফুল-ধনুঃ হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে:
হায়, মা, কত জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে,
কেহ না আইল। ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগোস্তম আমি ভাবিয়া ভবেশে;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"
আশ্বাসি মদনে হাসি, কহিলা শঙ্করী;—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী

বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিস্তার কৌশলে !"
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা ; "অভয় দান্ কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে ;—
কেমনে মন্দির হ'তে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-
বেশে ?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগৎ, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান-সবে এ দাসের শরে !
অধর-অমৃত-আশে, ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে।
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে
মুখে।
মলম্বা-অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ, বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর।" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ-বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী ! কিংবা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !
কিংবা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেক দেবশত্রু সুধাংশু-মণ্ডলে !
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা ! সাথে মন্মথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী !

কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উতরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে !
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপস্বী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারু-হাসিনী,—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি ?
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে !
শিহরিলা শূলপাণি। নড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজী যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু ! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধক্‌ধকি উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-
কোলে,
গম্ভীর-নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে !
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।
মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি ;—"কেন হেথা একাকিনী
দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা ;—"এ দাসীরে,
ভুলি,
হে যোগীন্দ্র বহু দিন আছ এ বিরলে ;

তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার!" আদরে ঈশান,
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে—
প্রফুল্লিত ফুলকুল; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইলা ধাইয়া;
বহিল মলয়-বায়ু; গাইল কোকিল;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হ'তে!) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর জাল;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু!
মোহন মুরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব;—"জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন;
কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?
পাঠাও কামেরে উমা, দেবেন্দ্র-সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখ সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদ,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেনকালে মধু-সখা উতরিলা তথা
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুকাইল অশ্রু-বিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে শারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে; "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন!
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে?
বামদেব-নামে নাথ, সদা কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্বকথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর!" সুমধুর হাসে,
উত্তরিলা পঞ্চশর; "ছায়ার আশ্রয়ে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
সুবর্ণ আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর-নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কতক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,

সুরকুল-রথিবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে ?
গৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা ;—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-
বিমোহিনি !"
আশীষি সুধিলা দেবী :—"কহ, কি
কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?"
উত্তরিলা দেবপতি ;—"শিবের
আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণকাল চিন্তি দেবী কহিলা
বাসবে ;—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে ; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে ; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণি-পূর্ণ নাগ-লোক যথা !
ওই দেখ ধনুঃ, দেব !" কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, বলী, দেবরাজ ;
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময় ! বিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে !
অগ্নি-শিখা-সম অসি মহাতেজস্কর !
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি
জগতে ?"

"শুন দেব", কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী
"ওই সব অস্ত্র-বলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্র-বলে, বলী
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রেরু তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুল-কুল-সখী ঊষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্র-কেশরী
ইন্দ্রজিৎ-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে !"
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে ;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্র কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার ; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তাঁরে করিও সুমতি !
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী-সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে ; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে ; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা ;
[illegible]"

প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা ; "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি, শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে ; লহ মেঘদলে ;
বন্দ্ব ক্ষণকাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে !" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে ; গিরি (দেখিলা)
নড়িছে

অম্বরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে,
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল ! কাঁপিল মহী ; গর্জ্জিল
জলধি !

তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণ-রঙ্গে মাতি !
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত ; হাসিল
ক্ষণপ্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগারি
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে ; মহা ঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টির শিলা তড়-তড়-তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার
ঘরে।

যথায় শিবির-মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উত্তরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে ! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
দোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে !

কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী ? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে,
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা ; "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা-রূপে ?—কেন হেথা
আজি,

নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায় !" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি,
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে ; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে !
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে
কালি

নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া !"
কহিলা রঘুনন্দন ; "আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ-সংবাদে !
অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব,
কৃতজ্ঞতা ? এই কথা জিজ্ঞাসি
তোমারে।"

হাসিয়া কহিলা দূত ; "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি ;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা ; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌশিক [illegible]

অবহেলা করে দেব, দাতা যে যত্তপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে।"
প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী; পালে পালে গৃধিনী,
শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে।

কবি জীবন পরিচয়

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদ তীরবর্তী সাগড়দাড়ি গ্রামে মধুসূদনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মাতার নাম জাহ্নবী দেবী।

মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বাল্যকালেই তাঁহার মনকে আবিষ্ট করিত। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজে ভর্তি হইলেন। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে হিন্দু কলেজের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। এই কলেজের শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালী ছাত্রসমাজ এক সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী ও বলিষ্ঠ জীবন চেতনার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভের জন্য যে সকল প্রতিভাবান ছাত্রের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মধুসূদন ছিলেন সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। প্রতিভায়, বাকবৈদগ্ধ্যে, বুদ্ধিমত্তায়, কবিত্বশক্তিতে ও হৃদয়াবেগে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না।

হিন্দু কলেজে পাঠকালে মধুসূদন ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। এই সকল কবিতা 'Bengal spectator,' 'Literary Gleaner', 'Calcutta Literary Gezette', 'Comet' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এই কলেজে পড়িবার সময় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার এই ধর্মান্তর তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য তিনি হিন্দু কলেজে পড়িবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন। ইহার পর তিনি শ্রীরামপুর বিশপস কলেজে ভর্তি হইলেন।

১৮৪৮ সালের প্রথমদিকে মধুসূদন মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন। এখানে তিনি সাত বছর বসবাস করেন। এই সময় তিনি রেবেকা ম্যাক্টাভিসকে বিবাহ করেন। 'The Captive Ladoy, ও 'Visions of the past' নামক কাব্যদ্বয় প্রকাশিত হয়। রেবেকার সহিত বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইবার পর তিনি হেনরিয়েটাকে গ্রহণ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া নানাবিধ কাজের সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও শুরু করেন। পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে রচনা করিলেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। একে একে প্রকাশিত হইল 'পদ্মাবতী' 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ', 'কৃষ্ণকুমারী', 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' 'বীরাঙ্গনা কাব্য।' স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি শিক্ষিত বাঙালী চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়া দিতে সক্ষম হইলেন।

কলিকাতায় মধুসূদন কবিখ্যাতি লাভ করিলেও আর্থিক সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করিলেন। ফ্রান্সে বাসকালে তিনি তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাগুলি রচনা করেন। দেশে ফিরিয়া ব্যারিস্টারি করিয়াও তিনি আশানুরূপ অর্থ উপার্জন করিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। হেনরিয়েটাও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুন তিনি চিরবিদায় লইলেন।

মধুসূদনের কবিপ্রতিভার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

মধুসূদন অসাধারণ কবিপ্রতিভার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কবিমানস পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবকল্পনার বিভিন্ন বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে। একদিকে তিনি যেমন বাল্মীকি কালিদাস কৃত্তিবাস ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবি রচিত বিশিষ্ট কাব্য হইতে তাঁহার কবিমানসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, অন্যদিকে হোমার মিল্টন, ট্যাসো প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাকবিদের কাব্য হইতেও তাঁহার কবিসত্তার উপযোগী উপকরণ গ্রহণ করিয়াছে। মাতা জাহ্নবী দেবীর প্রভাবে বাল্যকালেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি কাব্যের কাহিনী তাঁহার মানসলোককে উদ্দীপিত করিত। মধুসূদন জীবনীকার যোগেন্দ্রনাথ বসু এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন "জাহ্নবী দেবী তৎকালেও লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাংলা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত কণ্ঠস্থ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের নানা অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন আট দশ বৎসর বয়সের সময় মাতাকে এবং অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই গ্রন্থপাঠ করিয়া শুনাইতেন, এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়াছেন, মনুষ্য মাতৃস্তন দুগ্ধের সহিত যাহা শিক্ষা করে, জীবনে তারা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন না। মধুসূদনের জীবনে এ কথা অতি সুন্দর ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বহু ভাষার এবং বহু গ্রন্থের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও মাতৃ প্রদত্ত শিক্ষার ফলে বাঙ্গালা রামায়ণ এবং মহাভারত সম্পর্কে মধুসূদনের অনুরাগের কখনও খর্বতা হয় নাই।" ইহা হইতে বুঝা যায়, মধুসূদন রামায়ণ মহাভারত হইতে বাল্যকালেই তাঁহার কবিমানসের উপযোগী প্রাণরস লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্যের—ব্যাপক গভীর অনুশীলন তাঁহার ভাব-

মানসে নানা কল্পনায় পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাব্য প্রভাবে তাঁহার মানসলোকে একদিকে যেমন প্রাচ্য কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্নিগ্ধ ছায়া পড়িয়াছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্য কাব্যলক্ষ্মীর চরণচিহ্নে পবিত্র হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্য মন্থন করিয়া কবি যে কাব্যামৃতের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন; তাহাই দিয়া তিনি নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার কাব্যের তিলোত্তমা। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রারম্ভে সেই কাব্যলক্ষ্মীকে তিনি আবাহন করেছেন—

উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে। গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত, উরি দাসে, দেহ পদচ্ছায়া।

সুতরাং, মধুসূদনের কবিস্বভাবের মূলে আছে তাঁহার বাল্যসংস্কার, ইহারই পরিণতি বিশ্বজনীন কাব্যচেতনা। এই কাব্যচেতনার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

রাবণের প্রিয়পুত্র বীরবাহু রামচন্দ্রের সঙ্গে সম্মুখসমরে নিহত হইবার পর মেঘনাদকে সেনাপতি পদে বরণ করা হইল। মেঘনাদ তখন পত্নী প্রমীলার সহিত প্রমোদ উদ্যানে বাস করিতেছিলেন। কমলা প্রভাষা ধাত্রীর ছদ্মবেশে মেঘনাদের নিকট যাইয়া বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ দিলে মেঘনাদ লঙ্কাপুরীতে চলিয়া গেলেন। মেঘনাদ যাহাতে লক্ষ্মণের হাতে নিহত হয়, দেবতারা সেজন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাহারা শিবকে তুষ্ট করিয়া কার্তিকেয়র অস্ত্র লক্ষ্মণকে দান করিলেন।

এদিকে প্রমীলাও বীরাঙ্গনা বেশে সখিগণ সহ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

সীতাকে অশোকবনে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিভীষণ পত্নী সরমা তাঁহাকে দেখাশোনা করিতেন।

মেঘনাদ যুদ্ধে যাইবার পূর্বে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবের পূজায় বসিলেন। সেই সময় লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে সেখানে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় তাহাকে হত্যা করিলেন।

রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পড়িলেন।

রাবণ বিষন্নচিত্তে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন প্রমীলাও স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইলেন।

প্রথম সর্গের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ :—

১। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট কবির প্রার্থনা
২। রাজসভায় রাবণের শোকস্তব্ধ রূপ
৩। ভগ্নদূত কর্তৃক বীরবাহুর মৃত্যু ঘটনা বর্ণনা
৪। প্রাসাদ শিখরে উঠিয়া রাবণের যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন ও রাজসভায় প্রত্যাবর্তন
৫। রাজসভায় চিত্রাঙ্গদার আগমন ও রাবণের প্রতি অভিযোগ

৬। বারুণী ও মুরলার আলোচনা
৭। মুরলা ও কমলার আলোচনা
৮। কমলা কর্তৃক মেঘনাদকে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন
৯। প্রমোদ উদ্যানে প্রমীলা ও মেঘনাদের কথোপকথন
১০। মেঘনাদের লঙ্কা আগমন ও সেনাপতি পদে অভিষেক

দ্বিতীয় সর্গের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ :—

১। ইন্দ্রের রাজসভায় কমলার আবির্ভাব ও ইন্দ্রকে মহাদেবের নিকট গমনের নির্দেশ দান
২। শচীদেবী সহ ইন্দ্রের কৈলাস গমন ও উমার নিকট আবেদন
৩। কন্দর্পদেব সহ উমার কৈলাসে মহাদেবের নিকট গমন
৪। উমা ও মহাদেবের মিলন—ইন্দ্রের প্রতি নির্দেশ দান
৫। মায়াদেবীর নিকট ইন্দ্রের আগমন ও কার্তিকেয়র অস্ত্রলাভ
৬। চিত্ররথের মাধ্যমে লক্ষ্মণকে অস্ত্র দান

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে—সামনাসামনি যুদ্ধে। প্রাচীনকালে দুই পক্ষ মুখোমুখি হইয়া যুদ্ধ করিত। **বীরচূড়ামণি**—বীরশ্রেষ্ঠ। **বীরবাহু**—রাবণের পুত্র। মাতার নাম চিত্রাঙ্গদা। কৃত্তিবাসী রামায়ণে চিত্রাঙ্গদাকে চিত্রসেন গন্ধর্বের কন্যা বলা হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণে বীরবাহু হত্যার কাহিনী নাই, কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। মধুসূদন কৃত্তিবাস হইতে কাহিনীটি গ্রহণ করিয়াছেন। **চলি যবে গেলা যমপুরে**—বীরবাহু মৃত্যুর পর যখন মৃত্যুপুরীতে চলিয়া গেলেন। **অকালে**—অসময়ে। বীরবাহু তরুণ বয়সে মৃত্যুবরণ করিলেন। এই শব্দটি মধুসূদন হোমারের 'ইলিয়াড' কাব্যের 'untimely sent' কথা হইতে লইয়াছেন। **হে দেবী অমৃতভাষিণি**—'অমৃত ভাষিনী' দেবী বলিতে প্রাচ্য দেবী সরস্বতীকে বুঝানো হইয়াছে। তবে ইহার সহিত পাশ্চাত্য দেবী Muse এর কল্পনাও মিশিয়া গিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মধুসূদন বুঝি শুধু দেবী সরস্বতীকে বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। তিনি প্রধানত সরস্বতী ও তাঁহার সহিত Museকে মিশ্রিত করিয়া একজন কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার উদ্দেশে বন্দনা করিয়াছেন। এই বন্দনার সঙ্গে হোমার ও ভার্জিলের দেবী বন্দনার সাদৃশ্য আছে।

হোমার 'ইলিয়াডে' লিখিয়াছেন—

'A chilles' wrath to Greece the direful spring,
Of owes un numbered, heavenly Goddess Sing!
... ...
Declare, O Muse! in what ill fated hour
Sprung the strife······

ভার্জিল 'ইনিড' কাব্যে লিখিয়াছেন—

O Muse! the cause and crimes relate
what Goddess was provoked, and whence her hate...

রক্ষঃকুলনিধি—রাক্ষস বংশের আশ্রয়। **রাঘবারি**—রামচন্দ্রের শত্রু, রাবণ। **কি কৌশলে**—কি চক্রান্তে। লক্ষ্মণ অন্যায় যুদ্ধে, হীন চক্রান্ত করিয়া মেঘনাদকে হনন করিয়াছিলেন। এই 'চক্রান্তকে'ই এখানে কৌশল বলা হইয়াছে। **রাক্ষস ভরসা**—রাক্ষসকুলের আশা ভরসা মেঘনাদকে বুঝানো হইয়াছে। **ইন্দ্রজিত**—মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি হইয়াছিল 'ইন্দ্রজিৎ'। **মেঘনাদ**—রাবণের এই পুত্র জন্মমুহূর্তে মেঘ গর্জনের ন্যায় গর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছিল মেঘনাদ। **অজেয়**—যাহাকে জয় করা যায় না। **উর্মিলাবিলাসী**—লক্ষ্মণের পত্নীর নাম উর্মিলা। সেই উর্মিলাতে যিনি বিলাস করেন, তিনি হইলেন লক্ষ্মণ। উর্মিলাবিলাসী বলিতে লক্ষ্মণকে বুঝানো হইয়াছে। **নিঃশঙ্কিলা**—নির্ভয় করিল। ('নিঃশঙ্ক') কথাটি বিশেষণ। ইহাকে ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করিয়া নামধাতু করা হইয়াছে। **বন্দি**—বন্দনা করি। **চরণারবিন্দ**—পদ্মফুলের মতো চরণ। **আবার**—'আবার' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কবি ইহার পূর্বে 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' রচনাকালে একবার কাব্যদেবীকে আবাহন করিয়াছিলেন। এবার মেঘনাদ বধ কাব্য রচনাকালে পুনরায় আবাহন করিতেছেন। তাই 'আবার' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। **শ্বেতভুজে ভারতি**—শুভ্র বাহুবিশিষ্ট বাগদেবী। **যেমনি মাতঃ···বাল্মীকির রসনায়**—যেমন ভাবে প্রাচীনকালে দেবী বাল্মীকির জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখানে একটি প্রাচীন কাহিনীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। বাল্মীকি পূর্বে ছিলেন দস্যু রত্নাকর। ব্রহ্মার নির্দেশে তিনি তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তপস্যাকালে তাঁহার দেহ বল্মীকে আবৃত হইয়া যায় বলিয়া তাঁহার নাম হয় বাল্মীকি। একদিন প্রাতে তমসা নদীতে স্নান করিয়া তিনি যখন আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, একটি ব্যাধের তীরের আঘাতে ক্রৌঞ্চ পাখী নিহত হইয়াছে, ক্রৌঞ্চী তাহার চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া বিলাপ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ দিয়া দুই পঙক্তির একটি শ্লোক বাহির হইয়া গেল—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনা দেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

(অর্থাৎ হে ব্যাধ; তোমার এ নিষ্ঠুর কাজের জন্য কখনো প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি পাইবে না। কারণ তুমি প্রেমাসক্ত ক্রৌঞ্চযুগলের একটিকে বধ করিয়াছ।) এই পঙক্তি দুইটি মুখ দিয়া বাহির হইবার পর বাল্মীকি অবাক হইয়া ভাবিলেন, তাহার মুখ দিয়া এ কি বাহির হইল? ইহার নাম কি? পরে নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে ইহার নাম শ্লোক। **খরতর শরে**—তীক্ষ্ণ তীরের আঘাতে। **তেমনি দাসেরে আসি দয়া কর, সতি**—কাব্যলক্ষ্মী যেমন বাল্মীকিকে দয়া করিয়া তাঁহাকে দিয়া রামায়ণ মহাকাব্য লিখাইয়া লইয়াছিলেন, তেমনি মধু কবিকেও তিনি দয়া করুন। কবি তাঁহার ভৃত্য-

স্বরূপ। তিনি যেন তাঁহার প্রসাদে মেঘনাদ বধ মহাকাব্য লিখিতে পারেন। **ভবমণ্ডলে**—পৃথিবীতে। **নরাধম**—অতিশয় নিকৃষ্ট মানুষ। **মৃত্যুঞ্জয়**—যে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে। **উমাপতি**—মহাদেব। **নরাধম আছিল…উমাপতি** —কবির বক্তব্য: বাল্মীকি পূর্বে ছিলেন নরাধম দস্যু। কাব্যলক্ষ্মীর দয়ায় তিনি হইলেন মহাদেবের মতো মৃত্যুঞ্জয়ী অমর। **বরদে**—বরদায়িনী। **চোর রত্নাকর**—দস্যু রত্নাকর। **কাব্য রত্নাকর কবি**—বাল্মীকির রামায়ণ যেন সাগরতুল্য। সাগরের মধ্যে যেরূপ মহামূল্যবান রত্নরাজি থাকে, রামায়ণও তেমনি রত্নবৎ অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্রের আকর। **সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে**—বিষবৃক্ষও সুগন্ধযুক্ত চন্দনবৃক্ষে পরিণত হয়। কবির বক্তব্য: কাব্যলক্ষ্মীর দয়ায় অকবি কবিতে পরিণত হইতে পারে। **হেন পুণ্য দাসে** —কবির বক্তব্য: বাল্মীকি পুণ্যবান। তাই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর বরলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এমন কোন পুণ্য নাই যে তিনি দেবীর বরলাভ করিবেন। **গুণহীন**—যাহার কোন গুণ নাই। **মূঢ়মতি**—অজ্ঞান। **কিন্তু যে…সমধিক**—মাতার যে সন্তান গুণহীন ও দুর্বল, তাহার প্রতি জননীর স্নেহ যেমন বেশী থাকে, তেমনি কবির আশা, তিনি যখন বাল্মীকির তুলনায় অনেক কম প্রতিভাবান, তখন কাব্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি দয়া করিবেন। **উর তবে**—তাহা হইলে আবির্ভূত হও। **বিশ্বরমে**—বিশ্বের রমণীরা। **গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত**—মধুসূদন প্রথমে মেঘনাদ বধ কাব্যকে বীর রসাত্মক কাব্য হিসাবে রচনা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাব্য রচনা কালে তিনি মানস প্রবণতার জন্য সে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারেন নাই। এ সম্পর্কে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি পত্রে লিখিয়াছেন—I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my reader's with 'Vira Rasa'. **তুমিও আইস… মধুকরী কল্পনা**—মধুসূদন কল্পনাকে দেবী হিসাবে মর্যাদা দিয়া কাব্যসৃজনে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কল্পনা নামে প্রকৃতপক্ষে কোন দেবী নাই। 'প্যারাডাইস লষ্ট' কাব্যে মিল্টন কল্পনাকে দেবী হিসাবে বরণ করিয়াছেন। মধুসূদন মিল্টনের কাব্যপ্রেরণায় প্রভাবিত হইয়াছেন। **কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু**—বিশ্বের বিখ্যাত কবিদের চিত্তরূপ ফুলের বন হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া। এটি একটি সার্থক উপমা। কবির বক্তব্য: বিশ্ববিখ্যাত কবিগণ তাঁহাদের কাব্যে যে সকল ভাব ও সৌন্দর্য উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি সেগুলি আহরণ করিয়া তাঁহার কাব্যে প্রয়োগ করিবেন। বন্ধু রাজনারায়ণকে এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন: It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology on the present poem. I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki." **গৌড়জন**—বাংলার মানুষ। **গৌড়জন যাহে… নিরবধি**—মধুসূদন এমন একটি মহাকাব্য রচনা করিতে চান বাংলার মানুষ

যুগ যুগ ধরিয়া যাহা পাঠ করিয়া অমৃত পানের আনন্দ লাভ করিবে।
কনক আসন—স্বর্ণ সিংহাসন। **দশানন বলী**—বলবান ক্ষমতাশালী রাবণ। **হেমকূট**—হেমকূট নামক পর্বত। **হৈমশিরে**—স্বর্ণকান্তিযুক্ত মস্তকে। **শৃঙ্গবর**—বিরাট চূড়া। **হেমকূট‥যথা**—রাবণ স্বর্ণ সিংহাসনের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহাকে মনে হইতেছে হেমকূট পর্বতের স্বর্ণবর্ণ মস্তকে যেন বিশাল চূড়া। **তেজঃপুঞ্জ**—তেজের আধার। **পাত্রমিত্র**—সভাসদ ও বন্ধুবৃন্দ। **নতভাবে**—মাথা নত করিয়া। **ভূতলে**—পৃথিবীতে। **অতুল**—তুলনাহীন। **স্ফটিক**—মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ। **মানস সরস**‥মানস সরোবর। **মানস সরসে যথা**—রাবণের রাজসভা স্ফটিকে গঠিত। তাহাতে নানারূপ মূল্যবান রত্নরাজি শোভা পাইতেছে। মনে হইতেছে মানস সরোবরে যেন অপূর্ব সুন্দর পদ্মফুল ফুটিয়া আছে। **ফণীন্দ্র**—নাগরাজ বাসুকী। **ফণীন্দ্র যেমতি ‧ ধরারে**—রাবণের রাজসভায় স্বর্ণছাদ ধারণ করিয়া আছে শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণাঢ্য স্তম্ভ। মনে হইতেছে, নাগরাজ বাসুকী যেন সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে। **ঝুলিছে**—ঝুলিতেছে। **ঝলি**—ঝলমল করিতেছে। **মুকুতা**—মুক্তা। **পদ্মরাগ**—তাম্রবর্ণ মূল্যবান মণি। **মরকত**—হরিৎবর্ণ মূল্যবান মণি। **ব্রতালয়ে**—উৎসব গৃহে। **ক্ষণপ্রভা**—বিদ্যুৎ। **মুহুঃ**—ক্ষণে ক্ষণে। **রতন সম্ভবা বিভা**—রত্নসমূহ হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতি। **ক্ষণপ্রভা সম‥ঝলসি নয়নে**—ঝালরের উপর রত্নরাজি খোদাই করা আছে। বাতাসের দোলায় ঝালরটি এদিক ওদিক দুলিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে রত্নরাজি হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহাতে চোখ যেন ঝলসাইয়া যাইতেছে। **সুচারু**—সুন্দর। **চামর**—চামরী গাভীর লেজ হইতে প্রস্তুত বাতাস করিবার ব্যজন বিশেষ। **কিংকরী**—পরিচারিকা। **ঢুলায়**—দোলায়। **মৃণালভুজ**—মৃণালের মতো বাহু। **আন্দোলি**—আন্দোলন করিয়া। দোলাইয়া। **চন্দ্রাননা**—চাঁদের মতো সুন্দর মুখ যাহার। **ছত্রধর**—রাজার পিছনে বিশাল ছাতা ধরিবার কর্মী। **হরকোপানলে‥রূপে**—রাবণের মাথার উপর যে কর্মী ছাতা ধরিয়া আছে, তাহাকে দেখিতে এত সুন্দর যে মনে হইতেছে কন্দর্পদেব শিবের রোষের আগুনে দগ্ধ না হইয়া রাবণের মাথার উপর ছাতা ধরিয়া আছে। [এখানে একটি পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বর্গরাজ্য দৈত্যগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। শিবপুত্র ব্যতীত কেহই দৈত্য বধ করিতে পারিবেন না। শিব যোগাসনে মগ্ন। পার্বতীর সহিত মিলিত না হইলে পুত্র জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। তাই দেবতারা যুক্তি করিয়া কন্দর্পদেবকে শিবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য। কন্দর্পদেব পুষ্পধনু হইতে বাণ নিক্ষেপ করিলে শিবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। ক্রোধে তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে অগ্নিশিখা ছুটিয়া গেল। কন্দর্পদেব দগ্ধ হইলেন।] **দৌবারিক**—দ্বারপাল। **রুদ্রেশ্বর**—মহাদেব। **পাণ্ডব শিবিরে ‧ শূলপাণি**—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে মহাদেব যেমন রুদ্রমূর্তিতে পাণ্ডব শিবিরে পাহারা দিতেন, রাবণের দ্বারপালকেও সেইরূপ রুদ্রমূর্তি ভয়ংকর দেখাইতেছে। **মন্দে মন্দে**—ধীরে ধীরে।

অনন্ত বসন্ত বায়ু—রাবণের রাজসভায় চিরবসন্তের দক্ষিণ বাতাস প্রবাহিত। **কাকলী লহরী**—মধুর কলকল শব্দ। **বাঁশরী স্বরলহরী**—বাঁশীর স্বর তরঙ্গ। **গোকুল**—বৃন্দাবন। **বিপিনে**—বনভূমিতে। **কি ছার**—কি তুচ্ছ। **ময়**—ময়দানব। দানবদের মহাস্থপতি। ইনি ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব রাজসভা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। **তুষিতে পৌরবে**—পুরুবংশীয় পাণ্ডবদের তুষ্ট করিবার জন্য। **এ হেন সভায় পুত্রশোকে**—রাজসভায় রাবণ বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া আছেন। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুশোকে তিনি বাক্যহীন। **তিতিয়া**—ভিজাইয়া। **যথা তরু নীরবে ভগ্নদূত**—যুদ্ধের পরাজয় বার্তাবাহক। **ধূসরিত ধূলায়**—ভগ্নদূতের সমস্ত শরীর ধুলামাখা। **যোধ**—যোদ্ধা। **কাল তরঙ্গ**—করাল মৃত্যু। **নৈকষেয়**—রাবণের মাতার নাম নিকষা। তাই রাবণকে নৈকষেয় বলা হইয়াছে। **নিশার স্বপন সম**—রাত্রিবেলার স্বপ্নের মতো অলীক অবাস্তব। **অমরবৃন্দ**—দেবতাবৃন্দ। **ভুজবলে**—বাহুবলে। **রাঘব ভিখারী**—রামচন্দ্র রাজ্যচ্যুত রাজপুত্র। রাবণের দৃষ্টিতে তিনি ভিখারী-তুল্য। **শাল্মলী**—শিমুল। **ফুলদল দিয়া তরুবরে**—কোমল ফুলের পাপড়ি ছুঁড়িয়া শিমুল গাছের মতো শক্ত কঠিন গাছ কাটা যেমন অসম্ভব, তেমনি রামচন্দ্রের মতো দুর্বল লোকের পক্ষে বীরবাহুর মতো শক্তিশালী বীরকে হত্যা করা অসম্ভব। **কি পাপে ধনে**—রাবণ নিজের পাপ সম্পর্কে সচেতন নন। সীতা হরণকে তিনি পাপ বলিয়া মনে করেন না। ভগ্নী শূর্পণখার প্রতি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কৃত অসম্মান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্যই তিনি সীতা হরণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিতেছেন যে কি পাপে তিনি পুত্রকে হারাইলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। **রে দারুণ বিধি**—এখানে 'বিধি' বলিতে নিয়তি বা অদৃষ্টকে বুঝানো হইয়াছে। ইহারই নাম 'প্রাক্তন'। **কুলমান**—কুলের সম্মান। **কাল সমরে**—মৃত্যু-মুখর যুদ্ধে। **বনের মাঝারে নিরন্তর**—বনের মাঝে বিশাল গাছ কাটিবার আগে কাঠুরে যেমন আগে তাহার ডালগুলি কাটিয়া লয়, রামচন্দ্র তেমনি আগে তাঁহার পুত্র পরিজনকে হত্যা করিতেছেন। সব শেষে তাঁহাকে বধ করিবেন। **শূলী**—শূলধারী। **শম্ভুসম**—শিবের মতো। **কুম্ভকর্ণ**—রাবণের ভ্রাতা। **শূর্পণখা**—রাবণের বিধবা ভগ্নী। **কাল পঞ্চবটী বনে**—মৃত্যুরূপ পঞ্চবটী বনে। **কালকূট**—বিষ। **ভুজগ**—সর্প। **পাবক শিখারূপিনী**—অগ্নিশিখার মতো ভয়ংকর সৌন্দর্যময়ী সীতাদেবীকে। **এ মনের জ্বালা**—আত্মীয় পুত্র পরিজনের মৃত্যু-জনিত মানসিক যন্ত্রণা। **কুসুমদাম সজ্জিত**—ফুলের মালা দিয়া সাজানো। **দীপাবলী তেজে**—বহু প্রদীপের আলোয়। **দেউটি**—প্রদীপ। **রবাব**—তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। **মুরজ**—মৃদঙ্গ। **মুরলী**—বাঁশী। **বিলাপিলা**—বিলাপ করিল। **সচিবশ্রেষ্ঠঃ**—মহামন্ত্রী। **বুধঃ**—জ্ঞানী। **অভ্রভেদী**—আকাশ ভেদী। **ভূধর**—পর্বত। **অভ্রভেদী চূড়া পীড়নে**—আকাশ ছোঁয়া পর্বতচূড়া যদি বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি পর্বত এতটুকু বিচলিত হয় না। **হৃদয় বৃন্তে**—হৃদয়রূপ মৃণাল-ডাঁটায়। **বিকল**—অচল, বেদনাবিহ্বল। **কুবলয়ধন**—পদ্মফুল। **অমরত্রাস**—দেবতাদের ভীতিস্বরূপ। **মদকলকরী**—

শক্তিমত্ত হস্তী। **বীরকুঞ্জর**—বীরশ্রেষ্ঠ। **ইরম্মদ**—বজ্রের আগুন। **কোদণ্ড**—ধনুক। **ঘনাকার**—মেঘের আকার। **বিদ্যুৎঝলাসম**—বিদ্যুৎ ঝলকের মতো। **কলম্বকুল**—তীর সমূহ। **অম্বর প্রদেশে**—আকাশে। **নরেন্দ্র**—মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **কনক মুকুট শিরে**—মাথায় সোনার মুকুট। **ভীমধনু**—বিশাল ধনু। **বাসবের**—ইন্দ্রের। চাপ—ধনু। **মন্দোদরী**—রাবণ মহিষী। **মন্দোদরী মনোহর**—মন্দোদরীর সুন্দর স্বামী অর্থাৎ রাবণ। **সন্দেশবহ**—সংবাদবাহক। **দশাননাত্মজ**—দশাননের পুত্র বীরবাহু। **অগ্নিময় চক্ষু**—আগুনের ভাঁটার মতো লাল চোখ। **হর্যক্ষ**—সিংহ। **চৌদিকে এবে… উথলিল**—চারদিকে যেন যুদ্ধের উত্তাল ঢেউ উথলাইয়া উঠিল। **সিন্ধু যথা…নির্ঘোষে**—সমুদ্রের উপর ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হইলে যেমন উত্তাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। **ভাতিল**—শোভা পাইল। **চর্মাবলীর মাঝারে**—ঢালগুলির মধ্যে। **নাদিল**—শব্দ করিল। **কম্বু**—শঙ্খ। **অম্বুরাশি রবে**—সাগর কল্লোলের মতো ভীষণ শব্দে। **রিপু প্রহরণে**—শত্রুর অস্ত্রাঘাতে। **ক্ষত বক্ষস্থলে মম**—আমার বক্ষস্থলেই শুধু অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন। **পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা**—আমার পিঠে অস্ত্রের আঘাতের কোন চিহ্ন নাই। অর্থাৎ ভগ্নদূতের বক্তব্য: সে বীরত্বের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিয়াছে। তাই তাহার বক্ষে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। পলায়ন করিলে তাহার পিঠে অস্ত্রের আঘাত চিহ্ন থাকিত। **সাবাসি**—বাহবা দিতেছি। **বীরপুত্রধাত্রী**—বীর পুত্রের জন্মভূমি। **উদয়াচলে**—উদয় পর্বতে। **দিনমণি**-সূর্য। **অংশুমালী**—সূর্য। **হেমহর্ম্য**—স্বর্ণপ্রাসাদ। **সরঃ**—সরোবর। **উৎস**—ঝরণা। **রজঃছটা**—রজতের ন্যায় শুভ্র ছটাযুক্ত। **চক্ষুঃ বিনোদন**—চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক। **হীরাচূড়াশির**—হীরকমণ্ডিত চূড়া। **জগত বাসনা**—পৃথিবীর কামনা। **যুবতীযৌবন কথা**—যুবতীর যৌবনের মতো মনোহর ও আকর্ষণীয়। **অচল যথা**—পর্বতের মতো। **শৃঙ্গধর**—পর্বত। **বৈদেহীহর**—সীতা হরণকারী (রাবণ)। **বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে**—সমুদ্রতীরে বালুকারাশি যেমন অগণ্য, রামচন্দ্রের সেনাবাহিনীও তেমন অগণ্য। **থানা**—চৌকি। **নল**—মহা শক্তিশালী বানর। **অঙ্গদ**—বানররাজ বালির পুত্র। **করভসম**—নবীন হস্তীশিশুর মতো। **কঞ্চুক**—সর্পের খোলস। **হিমান্তে**—শীতের শেষে। **ঊর্ধ্বফণা**—উন্নত ফণা বিশিষ্ট। **লুলি**—লকলক করিয়া, দোলাইয়া। **অবলেপে**—তেজে। **দাশরথি**—রামচন্দ্র। **কৌমুদীবিহনে**—জ্যোৎস্না ব্যতীত। **শত প্রসরণে**—শত বেষ্টনে। **কেশরী কামিনী**—সিংহিনী। **শিবাকুল**—শৃগালসমূহ। **পাকসাট মারি**—বিস্তৃত পক্ষ দ্বারা আঘাত করিয়া। **খেদাইছে**—তাড়াইয়া দিতেছে। **সমলোভী**—একই প্রকার লোভী। **কুঞ্জরপুঞ্জ**—হস্তিদল। **নিষাদী**—হস্তির পিঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধরত সৈনিক। **সাদী**—অশ্বারোহী সৈনিক। **শূলী**—শূলধারী সৈনিক। **বর্ম্ম**—কবচ। **চর্ম্ম**—চাল। **ভিন্দিপাল**—বর্শাজাতীয় অস্ত্র। **পরশু**-কুঠার। **কিরীট**—মুকুট। **শীর্ষক**—পাগড়ি। **ধ্বজবহ**—পতাকাবাহক। **যমদণ্ডাঘাতে**—মৃত্যুরূপ ভয়ংকর দণ্ডের আঘাতে।

চাপি রিপুচয়—শত্রুদের উপর চাপিয়া। **গরুড়**—পক্ষীরাজ। **ঘটোৎকচ**—

ভীমের পুত্র। **কালপৃষ্ঠধারী**—কর্ণের ধনুকের নাম কালপৃষ্ঠ। কালপৃষ্ঠধারী বলিতে কর্ণকে বুঝানো হইয়াছে। **একাঘ্নী বান**—কর্ণের বাণ। কর্ণ এই বাণ লাভ করিয়াছিলেন ইন্দ্রের কাছ হইতে। এই বাণের আঘাতে তিনি ঘটোৎকচকে হত্যা করেন। **বীরকুলসাধ**—বীরবৃন্দের ইচ্ছা। **মকরালয়**—সমুদ্র। **ফণাময় যথা ফণিবর**—সমুদ্র যেন অসংখ্য ফণাযুক্ত নাগরাজ বাসুকী। **উথলিছে**—উথলাইয়া পড়িতেছে। **নির্ঘোষে**—শব্দ করিয়া। **মহামানী**—অত্যন্ত মান সম্মানের অধিকারী। **বীরকুলর্ষভ**—বীরকুল শ্রেষ্ঠ। **কি সুন্দর মালা**—সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন মালার মতো মনে হইতেছে। **প্রচেতঃ**—সমুদ্র। **জলদলপতি**—সমুদ্র। **প্রভঞ্জনবৈরী**—বাতাসের শত্রু। **নিগড়**—খাঁচা। **বীতংস**—ফাঁদ। **অধম ভালুকে বীতংসে**—ভালুক অধম, তাই যাদুকর তাহাকে লোহার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া খেলা দেখাইতে পারে। কিন্তু সিংহকে ওইরূপ ভাবে খাঁচায় বন্দী করিয়া খেলা দেখাইতে পারে, এমন কাহার সাধ্য। সমুদ্র এত বিশাল ও মহিমময়। তথাপি তাহাকে সামান্য শিলা দ্বারা বন্দি করা হইয়াছে, ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয়। **কৌস্তুভ রতন**—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থিত মূল্যবান রত্ন। **ভালে**—কপালে। **রোদন নিনাদ মৃদু**—মৃদু ক্রন্দন ধ্বনি। **চিত্রাঙ্গদা**—রাবণের মহিষী। বীরবাহু জননী। **আলুথালু**—এলোমেলো। **কবরী**—কেশবিন্যাস। **হিমানীতে**—শীতে। **পদ্মপর্ণ**—পদ্মপাতা। **কুলায়ে**—পাখীর নীড়ে।

শোকের ঝড় বহিল সভাতে—চিত্রাঙ্গদা পুত্রকে হারাইয়া অত্যন্ত শোকার্ত ও বিক্ষুব্ধ। তিনি সভায় প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন শোকের ঝড় বহিয়া গেল। **আসার**—বৃষ্টিধারা বর্ষণ। **জীমূতমন্দ্র**—মেঘের গুরু গুরু গর্জন। **বামাদল**—নারীবৃন্দ। **নিকোষিল**—কোষমুক্ত করিল। **একটি রতন**—'রতন' বলিতে পুত্র বীরবাহুকে বুঝানো হইয়াছে। **দীন আমি**—চিত্রাঙ্গদা রাবণের অনেক পত্নীর মধ্যে একজন। তাই তিনি রাজমহিষী হইয়াও নিজেকে দীন মনে করেন। **গঞ্জনা**—ভর্ৎসনা। **গ্রহদোষে দোষী জনে**—রাবণের ধারণা, ভাগ্য তাঁহার প্রতি বিরূপ। তাই প্রতি পদেই তাঁহাকে বিপর্যস্ত হইতে হইতেছে। **নিদাঘে**—গ্রীষ্মকালে। **বারুইর**—পান চাষীর। **শিমুলশিম্বী**—শিমুলের ফল। **বিধুমুখী**—সুন্দরী। **বীর প্রসূনের**—বীর পুত্রের। **প্রসূ**—জননী। **দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত**—ইন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত। **কাকোদর**—সর্প। **অরাবণ অরাম বা**—রাবণহীন অথবা রামহীন। **শূরসিংহ**—বীরশ্রেষ্ঠ। **দুন্দুভি**—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। **কর্ব্বুরবৃন্দ**—রাক্ষসবৃন্দ। **বারী**—হস্তিশালা। **বারণযূথ**—হস্তিদল। **মন্দুরা**—অশ্বশালা। **বাজীরাজী**—অশ্বসমূহ। **মুখস**—লাগামের সহিত সংযুক্ত লৌহখণ্ড। **রড়ে**—দ্রুতগতিতে। **শিরস্ক**—শিরস্ত্রাণ। **ভাস্বর পিধানে**—উজ্জ্বল খাপে। **আয়সী**—লৌহনির্মিত বর্ম। **মেঘবরাসনে**—মেঘের সুন্দর আসনে। **বজ্রপাণি**—ইন্দ্র। **অশ্বিনীকুমার**—দেববৈদ্য। **ভীমাকার**—ভয়ংকর। **ভিন্দিপাল**—অস্ত্রবিশেষ। **কেতনবর**—ধ্বজা। **হয় বূহ**—অশ্বের বূহ। **হ্রেষিল**—ঘোড়া ডাকিল। **শ্রবণপথ**—কর্ণ। **বারীশ**—সমুদ্র। **কনক পঙ্কজ বনে**—স্বর্ণকান্তি পদ্মবনে। **বারুণী**—বরুণ

পৃথিবী। **আরাব**—সমুদ্রের গর্জন। **জলেশ পাশী**—পাশ অস্ত্রধারী জলাধিপতি বরুণ। **বায়ুবৃন্দে**—প্রচণ্ড বাতাসে। **প্রভঞ্জন**—বায়ু। **বৈদেহী**—সীতা। **বিগ্রহ**—সংগ্রাম। **চটুলা সফরী**—চঞ্চলা পুঁটিমাছ। **রজঃকান্তি**—রূপালি রঙ। **বিভাবসু**—সূর্য। **বসন্তানিল**—মলয় বায়ু। **সুস্বরে**—সুমিষ্ট স্বরে। **দীপিছে**—জ্বলিতেছে। **সুরভি** সুগন্ধ। **খদ্যোতিকাদ্যোতি**—জোনাকির আলো। **ইন্দিরা**—লক্ষ্মীদেবী। **বিন্যাসিয়া**—স্থাপন করিয়া। **মুরলা**—বারুণীর সহচরী। **হরির উরসে**—নারায়ণের বক্ষদেশে। **বারীন্দ্রাণী**—বারুণী। **পাশী প্রণয়িনী**—বারুণী। **যাদঃপতি**—সমুদ্র। **চলোর্ম্মি**—উত্তাল তরঙ্গ। **যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে**—যেমন উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রতীর যেমন প্রতিনিয়ত ধ্বসিয়া পড়িতেছে, অধর্মাচারের আঘাতে রাবণও তেমনি দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন। **অকম্পন** জনৈক রাক্ষস সৈন্য। **প্রমদাকুল**—নারীবৃন্দ। **দুকূল বসনা**—পট্টবস্ত্র পরিহিতা। **কাঞ্চী**—মেখলা। **কৃশ**—ক্ষীণ। **চক্রনেমি**—চাকার পরিধি। **অধীরিয়া**—অধীর করিয়া। **বসুধা**—পৃথিবী। **দন্তী** হস্তী। **নিক্বণে**—বাদ্যধ্বনিতে। **কেতু**—পতাকা। **কুসুম-আসার**—পুষ্পবৃষ্টি। **ত্রিদিববিভব**—স্বর্গের ঐশ্বর্য। **বাসব**—ইন্দ্র। **সুরীশ্বর**—ইন্দ্র। **প্রক্ষ্বেড়ন**—লৌহধনু। **কালনেমি**—রাবণের মাতুল। **তালজঙ্ঘা**—রাক্ষস বিশেষ। **প্রমত্ত**—রাক্ষস বিশেষ। **মহীরুহ ব্যূহ**—বৃক্ষের ব্যূহ। **মুক্তালয়**—মুক্তার প্রাসাদ। **শিখণ্ডিনী**—ময়ূরী। **আখণ্ডল ধনু**—ইন্দ্রধনু। **মঞ্জু**—মনোহর। **বাসবত্রাস**—ইন্দ্রের ভীতি স্বরূপ। **বৈজয়ন্ত ধাম**—ইন্দ্রপুরী।

নন্দনকানন—ইন্দ্রের উদ্যান। **নিষঙ্গ**—তীর রাখিবার আধার, তূণীর। **যমুনে**—যমুনা নদীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে।' **প্রভাষা**—মেঘনাদের ধাত্রীর নাম। **কুণ্ডল**—কর্ণের অলঙ্কার। **রথীন্দ্রর্ষভ**—শ্রেষ্ঠ রথী। **হৈমবতী সুত**—কার্তিকেয়। **কিরীটী**—অর্জুন। **বিরাটপুত্র**—বিরাট রাজার পুত্র উত্তর। **উদ্ধারিতে**—উদ্ধার করিতে। **ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী**—ইন্দ্রধনুর মতো ধ্বজা। **তুরঙ্গম**—অশ্ব। **আশুগতি**—দ্রুতগতি। **প্রমীলা**—মেঘনাদের পত্নী। **হেমলতা**—স্বর্ণলতা। **তরু কুলেশ্বর**—বিরাট বৃক্ষ। **ব্রততী**—লতা। **দৃঢ়বাঁধে**—দৃঢ় প্রেমের বন্ধনে। **রথবর**—বিশাল রথ। **হৈমপাখা**—সোনার পাখা। **মৈনাক শৈল**—হিমালয় ও মেনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র। পর্বত। ইহার পাখা ছিল। ইন্দ্র ইহার পাখা কাটিয়া দিয়াছিলেন। **শিঞ্জিনী**—ধনুকের গুণ। **ভৈরবে**—ভীষণ শব্দে। **কৈশিক ধ্বজ**—রেশম বস্ত্র নির্মিত ধ্বজা। **কাঞ্চন কঞ্চু বিভা**—সোনার কবচের জ্যোতি। **মায়া**—চাতুরী। **বাম**—প্রতিকূল। **ডরাও**—ভয় পাও। **ঘুষিবে**—প্রচারিত হইবে। **মেঘবাহন**—ইন্দ্র। **রুষিবেন**—ক্রোধ করিবেন। **দুইবার আমি হারানু রাঘবে**—মেঘনাদ দুইবার রামচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। একবার রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্দী করিয়াছিলেন। অন্যবার নিশারণে অলক্ষ্যে থাকিয়া বাণবর্ষণে রামচন্দ্র ও অন্যান্য সকলকে মৃতপ্রায় করিয়াছিলেন। **জাগানু অকালে**—কুম্ভকর্ণকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অকালে জাগানো হইয়াছিল। **বরিনু**—বরণ

করিলাম। **হে রাক্ষস পুরি**—লঙ্কাকে বিষাদময়ী নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। **বৈজয়ন্ত ধাম**—ইন্দ্রপুরী। **পাশুপত**—শিবের ভয়াবহ অস্ত্র। **কামিনীরঞ্জন**—নারীর নিকট যিনি মনোহর। **রক্ষঃকুল কালি**—রাক্ষস কুলের কলঙ্ক স্বরূপ। **দণ্ডক**—দাক্ষিণাত্যের দণ্ডকারণ্য। **শ্রীমেঘনাদ বধ কাব্য**—সংস্কৃত কাব্যের রীতি অনুযায়ী কাব্যকে পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া তাহার পূর্বে শ্রী ব্যবহার করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় সর্গ

দিনমণি—সূর্য। **একটি রতন ভালে**—গোধূলি যেন ললাটে একটি রত্ন লইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম আকাশের শুকতারাকে গোধূলির রত্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। **কুমুদী**—শাপলা ফুল। **কূজনি**—কূজন করিয়া। **কুলায়ে**—নীড়ে। **গোষ্ঠগৃহে**—গোশালায়। **শর্ব্বরী**—রাত্রি। **সুস্বনে**—সুমধুর রবে। **ক্রোড়নীড়ে**—কোলের আশ্রয়ে **দেবীর**—নিদ্রাদেবীর। **নিশিপ্রিয়া**—চাঁদকে রাত্রির প্রিয়া বলা হইয়াছে। **ত্রিদশ আলয়ে**—দেবলোকে। **পুলোম নন্দিনী**—পুলোমার কন্যা দেবরাজ পত্নী শচী। **চারুনেত্রা**—সুন্দর চক্ষু বিশিষ্টা। **সুসমীরণ**—সুন্দর বাতাস। **ত্রিদিব বাদিত্র**—স্বর্গীয় বাদ্য। **দেবভোজন** দেবঅন্ন। **কেশর**—সুগন্ধদ্রব্য বিশেষ। **মন্দার দাম**—পারিজাত ফুলের মালা। **শচীকান্ত**—ইন্দ্র। **পুণ্ডরীকাক্ষ**—বিষ্ণু। **বারীন্দ্রসুতে**—লক্ষ্মী। **সুরনিধি**—দেবরাজ। **বৃত্র বিজয়ি**—ইন্দ্র। **বিক্রমকেশরী**—মহাশক্তিমান। **আক্রমিবে**—আক্রমণ করিবে। **নিকুম্ভিলা যজ্ঞ**—লঙ্কার পশ্চিমদিকে একটি গুহায় নিকুম্ভিলা দেবীর অবস্থান। মেঘনাদ এই গুহায় দেবীর সম্মুখে যজ্ঞ করিতেন। **দম্ভী**—অহংকারী। **বৈনতেয়**—গরুড়। **কেশব বাসনা**—কেশবের বাসনাকস্পাত্রী যিনি অর্থাৎ লক্ষ্মী। **মুঞ্জরিত**—পুষ্পিত। **স্বরীশ্বর**—স্বর্গের অধিপতি। **পন্নগ**—সর্প। **দম্ভোলি**—বজ্র। **বিমুখয়ে**—বিমুখ করে। **সর্বশুচি**—অগ্নি। **উপেন্দ্র**—বিষ্ণু। **চন্দ্রশেখর**—শিব। **অনন্ত**—শেষ নাগ। **বিরূপাক্ষ**—শিব। **ত্র্যম্বকে**—মহাদেবকে।

অম্বিকা—পার্বতী। **অনম্বর পথে**—আকাশ পথে। **পরিমল সুধা**—সুন্দর গন্ধ। **মৃণালের রুচি**—পদ্মের ডাঁটার শোভা। **বিকচ**—প্রস্ফুটিত। **দেবযান**—স্বর্গের রথ। **বাসরে**—শয্যাগৃহে। **মানস সকাশে**—মানস সরোবরের নিকট। **কৈলাসশিখর**—কৈলাস পর্বতের শিখর। **আভাময়**—দীপ্তিময়। **নিঝর ঝরিত**—ঝরণা হইতে উৎক্ষিপ্ত। **বিশদ**—শ্বেত। **চর্চিত**—লেপিত। **বপুঃ**—দেহ। **পদব্রজে**—পায়ে হাঁটিয়া। **ঈশ্বরী**—পার্বতী। **বিজয়া**—পার্বতীর সখি। **দম্ভোলি নিক্ষেপী**—বজ্রনিক্ষেপকারী ইন্দ্র। **পরন্তপ**—শত্রু পীড়নকারী। **মনোনীত বর**—অভীষ্ট বর। **বিশ্বধর শেষ**—পৃথিবী বহনকারী শেষ নাগ। **অন্নদে**—পার্বতী। **বিশ্বনাশী**—জগৎ ধ্বংসকারী। **কুলিশে**—বজ্রকে। **নিস্তেজে**—নিস্তেজ করে। **কুলোদ্ভব**—শ্রেষ্ঠ বংশ। **ত্রিশূলী**—শিব। **তৈঁই**—সেজন্য। **নিশাচর**—রাত্রিতে যে চরিয়া বেড়ায়।

দুর্মতি—দুষ্ট বুদ্ধি। **সুশীল**—সুচরিত্র। **পরদার**—পরস্ত্রী। **পামর**—পাপী। **বীণাবাণী**—বীণার ধ্বনির মতো মধুর। **বিধুবদনা**—চন্দ্রের মতো সুন্দর মুখ বিশিষ্ট। **বৈদেহী রঞ্জনে**—রামচন্দ্রকে। **শরমে**—লজ্জায়। **পরাভবে**—পরাজিত করে। **জিষ্ণু**—বিজয়ী ইন্দ্র। **মঞ্জুনাশিনী**—অতিশয় সুন্দরী। **পুর্ণিতে**—পূর্ণ করিতে। **বৃষধ্বজ**—মহাদেব। **ত্রিপুরারি**—মহাদেব। **হ্রাসো**—হ্রাস করো। **দৈত্যরিপু**—দৈত্যের শত্রু। **গন্ধামোদে**—গন্ধের মদিরতায়। **ভবেস ভাবিনী**—পার্বতী। **নগনন্দিনী**—পার্বতী। **বারি সংঘটিত ঘটে**—জলপূর্ণ ঘটে। **তার**—ত্রাণ কর। **বিকট শিখর**—ভয়ংকর পর্বত শীর্ষ। **দ্বিরদগামিনী**—গজ গমনা। **তারাকারা**—তারার আকৃতি-বিশিষ্টা। **কবরী**—খোঁপা। **চিররুচি**—চিরসুন্দরী।

চির বিকচিত—চির প্রস্ফুটিত। **মোহিল**—মুগ্ধ করিল। **যোগীব্রজ**—যোগীবৃন্দ। **ভেটিব**—দেখা করিব। **মন্মথ**—কন্দর্প। **বরাননা**—সুন্দর মুখযুক্তা। **বিহারিতেছিলা**—বিহার করিতেছিল। **নিশান্তে**—রাত্রি শেষে। **ত্বিষাম্পতি**—সূর্য। **ত্বিষাম্পতি দূতী**—উষা। **মদনপ্রিয়া**—রতি। **সমাধি**—বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্যানস্থ অবস্থা। **বরবপুঃ**—সুন্দর দেহ। **পিনাকী**—শিব। **মধুকালে**—বসন্ত ঋতুতে। **কুসুম কুন্তলা**—পুষ্পখচিত কেশরাশি। **কেশর**—পুষ্পরেণু। **রত্নসঙ্কলিত আভা**—রত্নের দ্যুতি বিশিষ্ট। **লাক্ষারস**—আলতা। **চিত্রিলা**—চিত্রিত করিল। **নগেন্দ্রবালা**—অম্বিকা। **স্মর**—কন্দর্পদেব। **স্মর হরপ্রিয়া**—কন্দর্পদেবকে ভষ্ম করিয়াছিলেন মহাদেব, তাঁহার প্রিয়া পার্বতী। **স্মর-প্রিয়া**—রতিদেবী। **ফুলধনু**—পুষ্পধনু। **শৈলেশসুতা**—পার্বতী। **মায়ার নন্দন**—কন্দর্পদেব। [শিবের কোপে কন্দর্পদেব দগ্ধ হইবার পর পুনরায় কৃষ্ণের পুত্ররূপে তাঁহার জন্ম হইল। শিব তাহাকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিলেন। একটি বিশাল মাছ শিশুটিকে গিলিয়া ফেলিল। একটি ধীবর মাছটি পাইয়া শম্বর দানবকে দিল। শম্বরের প্রাসাদে রতিদেবী 'মায়া' নামে দাসীবৃত্তি করিতেছিল। সে মাছটি কুটিতে গিয়া তাহার মধ্যে শিশুকে পাইয়া পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিল।] **হিমাদ্রি**—হিমালয় পর্বত। **গ্রহিলা**—গ্রহণ করিল। **বামদেব**—মহাদেব। **আক্রমে**—আক্রমণ করে। **কুলগ্নে**—অশুভ মুহূর্তে। **বিভাবসু**—অগ্নি। **ভবেশ্বরি**—মহাদেবী। **ক্ষেমঙ্করী**—দেবী কাত্যায়নী। **মোহিনী বেশে**—সুন্দররূপে। **দিতিসুত**—কশ্যপ-পত্নী দিতির পুত্র। **বিবাদিল**—বিবাদ করিল। **শ্রীপতি**—বিষ্ণু। **হৃষীকেশ**—বিষ্ণু। **নত্রশির**—নত মস্তক। **মন্দর আপনি**—স্বয়ং মন্দর পর্বত। **মন্দর কুচযুগে**—মন্দর পর্বত ছিল সচল। মোহিনী বেশী বিষ্ণুর উন্নত স্তনযুগল দেখে মন্দর পর্বত স্থির হইয়া গেল। **মলশা**—স্বর্ণপাত্র। **অম্বর**—বস্ত্র। **ঘন**—মেঘ। **চক্র প্রসরণে**—চক্রের বেষ্টনীতে। **সুধাংশু মণ্ডলে**—চন্দ্রালোকে। **দ্বিরদ-রদ-নির্মিত**—গজদন্তনির্মিত। **সুহাসিনী**—সুন্দর হাস্যকারিণী। **মন্মথ**—কন্দর্পদেব। **খরতর ফুল শর**—কন্দর্পদেবের পাঁচটি পুষ্পবাণ। যথা—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা, নীলোৎপল। **ভৃগুমান**—হনুমান। **জলকান্ত**—সমুদ্র। **তমঃ**—অন্ধকার। **কপর্দী**—জটাধারী শিব। **বিভূতি**

তুষি—তুষারাচ্ছাদিত। **বাহ্যজ্ঞান হত**—বাইরের জগৎ সম্পর্কে অচেতন।
সমর অরি—কন্দর্পদেব। **হাঁটু পাড়ি**—নতজানু হইয়া। **মীনধ্বজ**—
কন্দর্পদেব। **শিঞ্জিনী**—ধনুর্গুণ। **চিত্রভানু**—অগ্নি। **জ্বলনে**—দীপ্তিতে।
কেশরী কিশোর—সিংহ শিশু। **কেশরিণী**—সিংহিনী। **ঘোষে**—শব্দ করে।
কালানল—মৃত্যুবাহী অগ্নি। **উন্মীলি**—উন্মীলন করে। **ধূর্জটি**—মহাদেব।
গণেন্দ্র-জননি—গণেশমাতা পার্বতী। **মৃগেন্দ্র**—পশুরাজ সিংহ। **ঈশান**—
শিব। **অজিন আসনে**—ব্যাঘ্র চর্মাসনে। **প্রফুল্লিল**—প্রফুল্ল হইল। **মকরন্দ**
—মধু। **শিলীমুখবৃন্দ**—ভ্রমরবৃন্দ। **কুসুমেষু**—কন্দর্পদেব। **বিভাবসু**—
অগ্নি। **বিহঙ্গমরাজ**—পক্ষিরাজ। **সুখসদন**—সুখের স্থান। **প্রসূনাসার**—
পুষ্পবৃষ্টি। **মধুসখা**—বসন্তের সখা মদন। **পসারি**—বিস্তৃত করে। **আশু**
শীঘ্র। **কিরে**—শপথ। **পঞ্চশর**—কন্দর্পদেব। **উত্তরি**—উত্তরণ করিয়া।
সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র। **আভাময়**—দীপ্তিমান। **কুহকিনী**—মায়াবিনী। **শক্তি-
শ্বরী**—শক্তির ঈশ্বরী। **অদিতি নন্দন**—ইন্দ্র। **সৌমিত্রি**—লক্ষ্মণ।
কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ—কৃত্তিকা প্রভৃতির প্রিয় কার্তিকেয়। **বৃষধ্বজ**—মহাদেব।
ফলক—ঢাল। **কৃতান্ত**—মৃত্যু। **সুনাসী**—ইন্দ্র। **বিষাকর**—বিষের আকর।
দিবাকর পরিধি—সূর্যের পরিধি। **ষড়ানন**—কার্তিকেয়। **পূর্বাশার**—
পূর্ব দিগন্তের। **পদ্মকর**—পদ্মের মতো সুন্দর হাত। **ত্রিদশ আলয়ে**—
দেবলোকে। **গন্ধর্ব-কুলপতি**—চিত্ররথ। **চপলা**—বিদ্যুৎ। **দম্ভোলি
গম্ভীর নাদে**—বজ্রের গম্ভীর শব্দে। **প্রভঞ্জনে**—বাত্যাকে। **বারিনাথ**—
সমুদ্র। **লম্ফী**—লম্ফ প্রদানকারী। **তিমিরাগারে**—অন্ধকার গৃহে। **অম্বু-
রাশি**—জলরাশি। **জাঙ্গাল**—বাঁধ। **তরঙ্গ আবলী**—ঢেউগুলি। **জীমূত**—
মেঘ। **ক্ষণপ্রভা**—বিদ্যুৎ। **তারানাথ**—তারকাপতি চন্দ্র। **পাবক**—অগ্নি।
উগরি—উদ্গিরণ করিয়া। **মড়মড়ে**—মড়মড় শব্দ করিয়া। **আসার**—বৃষ্টি।
বৃষ্টিল—বৃষ্টি হইল। **তড়তড় তড়ে**—তড়তড় শব্দ করে। **সারসন**—কটিবন্ধ।
দৈববিভা—দেবতার সৌন্দর্য। **পাদ্য**—পা ধুইবার জল। **অর্ঘ্য**—সংবর্ধনার
উপাদান। **আবির্ভাবি**—আবির্ভূত হইয়া। **বলি**—পূজার উপহার। **শান্তিলা**
—শান্ত হইল। **কৌমুদিনী**—জ্যোৎস্না। **রজোময়**—রজত নির্মিত। **ভীম
প্রহরণ ধারী**—ভয়ংকর অস্ত্রধারী।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা

১। নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্য রত্নাকর কবি।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বরে বাল্মীকির কবিত্ব লাভের বিবরণটি এখানে বিবৃত হইয়াছে।

বাল্মীকির পূর্বনাম ছিল রত্নাকর। দস্যুবৃত্তি ছিল তাঁহার জীবিকা। ব্রহ্মার উপদেশে তাঁহার মনে দিব্যজ্ঞান জন্মিল। তিনি তখন সাধনা করিয়া অসাধারণ কবিত্বশক্তি লাভ করিলেন। এবং রামায়ণ রচনা করিয়া পৃথিবীতে অমর হইলেন। মহাদেব যেমন মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, বাল্মীকিও তেমনি মৃত্যুকে জয় করিয়া অমর হইয়াছেন। যিনি ছিলেন দস্যু রত্নাকর, তিনি হইলেন কাব্য রত্নাকর। তাঁহার কাব্য প্রকৃত পক্ষে একটি সমুদ্র। ইহার মধ্যে অসংখ্য রত্নবৎ ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়াছে। কাব্য লক্ষ্মী যদি কৃপা করেন, তবে মধুসূদনও অমরত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

২। তোমার পরশে,
সুচন্দন—বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে।
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কবি কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট কবিত্ব শক্তি লাভের প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

কবির দৃঢ় বিশ্বাস, কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। অকবিও কবিত্ব শক্তি লাভ করে। অলৌকিক করুণধারায় সাধারণের মধ্যেও দেখা দেয় অসাধারণত্বের দীপ্তি। বিষবৃক্ষের স্পর্শে মৃত্যু সুনিশ্চিত। অপর পক্ষে চন্দনতরুর সুগন্ধে দশদিক আমোদিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, চন্দনতরুর সান্নিধ্যে আসিলে বিষবৃক্ষ তাহার স্বভাবধর্ম হারাইয়া চন্দনতরুর মাহাত্ম্য লাভ করে। কবির ধারণা পুরাকালে বাল্মীকি কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বরলাভ করিয়াই মহাকবি হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কবিও দেবীর কাছে অনুরূপ কৃপাপ্রার্থী কিন্তু এই সঙ্গে তাহার মনে জাগিয়াছে সংশয়। তিনি তো আর—বাল্মীকির মতো প্রতিভাবান নহেন। তাই দেবী কিরূপে তাঁহাকে দয়া করিতে পারেন? তবে এইসঙ্গে তাঁহার মনে ভরসাও জাগিয়াছে এই ভাবিয়া যে তিনি প্রতিভাহীন বলিয়াই দেবী হয়তো তাঁহাকে দয়া করিবেন। কারণ মাতা তাঁহার বহু সন্তানের মধ্যে অক্ষম অকৃতী সন্তানের প্রতিই বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখান। কবির বিশ্বাস, এই কারণেই তিনি দেবীর কৃপালাভে সক্ষম হইবেন।

৩। কবির চিত্তফুলবন মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে শাশ্বত কাব্য রচনায় জন্য কবিহৃদয়ের আকুতি প্রকাশিত হইয়াছে।

কাব্য সাহিত্যকে যথার্থ রসোত্তীর্ণ করিয়া তুলিতে যে সকল গুণ

অলঙ্কার। কল্পনাকুশলতা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কল্পনার বিশালতা ও ব্যাপকতা দ্বারা কাব্যের রসনিষ্পত্তি হয়। মধুসূদনও তাই কাব্য সৃষ্টিতে কল্পনার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তাই কল্পনা তাঁহার নিকট দেবীর নবরূপ লাভ করিয়াছে। মৌমাছির দল যেমন ফুলবন হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র রচনা করে। এবং সেই মধুপানে অনাবিল তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে। মধুকবিও তেমনি আশা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ভাবকল্পনার যে বিশাল ফুলবন আছে। তাহার মধু লইয়া তিনি এমন সুন্দর এক মহাকাব্য রচনা করিবেন যাহা যুগ যুগ ধরিয়া বঙ্গবাসীকে অমৃত আস্বাদনের আনন্দদান করিবে। তাঁহার সেই মহাকাব্য চিরদিন বঙ্গবাসীকে অনাবিল আনন্দ দান করিবে।

৪। নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিলা সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর মতো বীরের মৃত্যু যে কতখানি অসম্ভব ব্যাপার, তাহাই বর্ণনা প্রসঙ্গে রাবণের খেদোক্তি এখানে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগ্নদূত আসিয়া রাবণকে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ জানাইলে রাবণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর মতো মহাবীরের নিধন রাত্রিকালের স্বপ্নের মতো অসম্ভব বা অলৌকিক বলিয়া মনে হইয়াছে। রাত্রিকালে ঘুমের মধ্যে মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যেই শুধু নানা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, বা অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়। রাত্রি শেষে ঘুম ভাঙিলে সে স্বপ্নের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন বোঝা যায়, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা একান্তই অবাস্তব। তেমান বীরবাহুর মৃত্যুও রাবণের নিকট অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য ঘটনা। এই ঘটনা যে সম্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি মনে করেন না। শিমুল গাছ অতিশয় কঠিন ও শক্ত। তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারাও ইহা ছেদন করা দুরূহ। কেহ যদি বলে, যে ফুলের পাপড়ি ছুড়িয়া শিমুল গাছ ছেদন করা হইয়াছে, তখন তাহা অসম্ভব বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কেন না ফুল ছুড়িয়া শিমুল কখনই ছেদন করা যায় না। তেমনি যে বীরবাহুর মতো মহাবীরের বীরত্বে দেবতারাও সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন, সেই বীরবাহুকে রামচন্দ্র হত্যা করিয়াছেন, ইহা যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রামচন্দ্রের কতটুকু ক্ষমতা বা শক্তি সামর্থ্য যে বীরবাহুর মতো বীরকে হত্যা করিতে পারেন।

৫। কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিভিছে দেউটি।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। বীরবাহু ও অন্যান্য বড় বড় বীরের মৃত্যুতে লঙ্কাপুরীতে যে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বর্ণনা প্রসঙ্গে রাবণ এই খেদোক্তি করিয়াছেন।

রামচন্দ্র লঙ্কাপুরী অবরোধ করিবার পর হইতেই সর্বনাশ শুরু হইয়াছে। লঙ্কাপুরীতে বীরের অভাব ছিল না। রাবণ স্বর্গ মর্ত পাতাল জয় করিয়াছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন বড় বড় বীরের দল। এই সকল বীর যেন এক একটি উজ্জ্বল প্রদীপ। তাহাদের পূর্ণ বিকাশে লঙ্কাপুরী উজ্জ্বলিত নাট্যশালার সঙ্গে তুলনীয়। অভিনয়কালে নাট্যশালা অসংখ্য প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে ও ফুলে পল্লবে সুসজ্জিত থাকে। কিন্তু অভিনয় যেই শেষ হইয়া যায়, প্রদীপগুলি নিভিয়া যায়। ফুলগুলি শুকাইয়া যায়। নাট্যশালা হইয়া পড়ে সৌন্দর্যহীন নিষ্প্রাণ। তেমনি লঙ্কাপুরীর বড় বড় বীরের দল একে একে নিহত হইয়াছে। লঙ্কার সেই গৌরব ও সৌন্দর্য নাই। এখন সমগ্র পুরীতে হতাশা ও শোকের আঁধার নামিয়া আসিয়াছে। এখানে কোন আনন্দানুষ্ঠানের চিহ্ন নাই। এই নিষ্প্রাণ পুরীতে বাস করাও যেন অসম্ভব।

৬। তোর কথা শুনি,
কোন বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভগ্নদূত মকরাক্ষের মুখে বীরবাহুর অসামান্য শৌর্য-বীর্যের বিবরণ শুনিয়া রাবণের বীরহৃদয় কিরূপে উদ্দীপিত হইয়াছে, এখানে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

বীরবাহুর অকাল মৃত্যুতে রাবণের পিতৃহৃদয় শোকাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি। কিন্তু রাবণ নিজে মহাবীর। পুত্রের মৃত্যুশোক সাময়িকভাবে বিস্মৃত হইয়া তিনি পুত্রের বীরত্বে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। বীরবাহুর এ মৃত্যু গৌরবের মৃত্যু। বীরবাহুর মৃত্যু তাঁহাকে এমনভাবে উদ্দীপিত করিয়াছে যে তিনিও যুদ্ধে যাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। কালসর্প গর্তের মধ্যে দিন কাটায় অলসভাবে। এই অবস্থায় তাহার সর্বাঙ্গে শিথিলতা। কিন্তু যেমনি ডমরুধ্বনি তাহার কানে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক চেতনায় তাহার সমস্ত শৈথিল্য দূরীভূত হইয়া যায়। সে তড়িৎগতি গর্ত হইতে বাহির হইয়া পড়ে। রাবণও এতক্ষণ শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু বীরবাহুর বীরত্ব তাঁহাকে নব উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে।

৭। হায় রে যেমতি
স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেতে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। লঙ্কার বীর রাক্ষসবৃন্দ যুদ্ধে নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া আছে। এই করুণ দৃশ্যের এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাবণ পাত্রমিত্র সহ প্রাসাদের শীর্ষে উঠিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। রামচন্দ্রের সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে অসংখ্য বীর রাক্ষস নিহত হইয়াছে। এই সকল বীর জীবিতকালে ছিল দেশ ও জাতির অমূল্য সম্পদ। তাহারাই লঙ্কাপুরীর রক্ষাকর্তা। কিন্তু রামচন্দ্রের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া তাহাদের মৃতদেহ ধূলায় পড়িয়া আছে। তাহাদের অবস্থা কৃষক কর্তৃক কর্তিত স্বর্ণশীর্ষ শস্যের মতো। স্বর্ণশীর্ষ শস্য ক্ষেতের সৌন্দর্য। কৃষক সেই শস্য কাটিয়া ফেলিলে সেগুলি মাটিতে হতশ্রী অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ক্ষেতের কোন সৌন্দর্য থাকে না। তেমনি রাক্ষসবৃন্দের পতনে লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য ম্লান হইয়া গিয়াছে।

৮। অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখসুখ যত
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন!

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন রাবণকে সান্ত্বনাদানের জন্য মন্ত্রী সারণ এই উক্তি করিয়াছেন।

বীরবাহুর অকাল মৃত্যুতে রাবণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি মহাবীর তথাপি তিনি কিছুতেই যেন পুত্রের বিয়োগ বেদনা ভুলিতে পারিতেছেন না। তখন মন্ত্রী সারণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলিলেন, যে এই পৃথিবী মায়াময়। মানুষ মাত্রেই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষের জীবনে নানা দুঃখ কষ্ট শোকের আঘাত আসিতে পারে। কিন্তু এই দুঃখ কষ্ট শোকের আঘাত পৌরুষের সাহায্যে প্রতিহত করিতে হইবে। যত বাধাবিঘ্ন আঘাত আসুক না কেন, অবিচলিত অবস্থায় নিজের কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। পর্বতের উপরে থাকে উচ্চতম শৃঙ্গ। বজ্রের আঘাতে অনেক সময় সে শৃঙ্গ ভাঙিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু পর্বত ইহাতে এতটুকু বিচলিত হয় না। সে থাকে অনড় অবিচলিত। তেমনি রাবণের পক্ষেও বীরের ন্যায় এই পুত্রশোকে অবিচল থাকা কর্তব্য।

৯। হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকলহৃদয়
ডোবে শোক সাগরে, মৃণাল যথা জলে
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই উক্তির মধ্য দিয়া রাবণের পুত্র-শোকাতুর মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

বীরবাহুর অকাল মৃত্যুতে রাবণ গভীর শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর মতো মহাবীরের মৃত্যু তাঁহার নিকট অকল্পনীয়। মন্ত্রী সারণ তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলে রাবণ বলিলেন যে তাঁহার অবস্থা ছিন্নপদ্ম মৃণালের মতো। মৃণালের অগ্রভাগে পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে। এই পদ্মফুলের জন্য মৃণালের শোভা সৌন্দর্য ও অস্তিত্ব। যদি কেহ পদ্মফুলটি ছিঁড়িয়া লয়। তবে মৃণাল হতশ্রী হইয়া পড়ে, এবং তাঁহার অস্তিত্বের কোন মূল্যই থাকে না। রাবণও প্রকৃতপক্ষে বীরবাহুকে অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া ছিলেন। বীরবাহু ছিল পদ্মফুল সদৃশ সুন্দর। রামচন্দ্র যেন সেই পদ্মফুলটি ছিঁড়িয়া লইয়াছেন। এখন তাঁহার অস্তিত্বই অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর তিনি কাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিবেন।

১০। অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। সমুদ্রকে শৃঙ্খলিত দেখিয়া রাবণের খেদোক্তি এখানে প্রকাশিত হইয়াছে।

বীরবাহুর মৃত্যুর পর রাবণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পাত্রমিত্রদের লইয়া তিনি রাজপ্রাসাদের শিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে সমুদ্রকে রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী যেন সেতুর শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইহার উপর দিয়া সেনাবাহিনী পারাপার করিতেছে। ইহা দেখিয়া দুঃখে ক্ষোভে রাবণের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমুদ্র ছিল লঙ্কার প্রহরী। সমুদ্র পার হইয়া কাহারও পক্ষে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের সাধ্য ছিল না। এখন রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করায় লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ সকলের পক্ষেই সুগম হইয়া পড়িয়াছে। এখন অধম ভালুকের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা। ভালুককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহাকে যাদুকর নিজের খুশিমতো নাচায়। ভালুকের কোন সম্মান বা মর্যাদা নাই। কিন্তু সিংহকে বন্ধন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সে রাজকীয় মর্যাদা ও শক্তি-সামর্থ্যে সমৃদ্ধ। শৃঙ্খলিত সমুদ্র যেন অধম ভালুকের মতো রামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ।

১১। কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ। হা ধিক, ওহে জলদল পতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়! এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। সমুদ্রকে শৃঙ্খলিত দেখিয়া রাবণ তাঁহার প্রতি যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহাই এখানে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী অজেয় সমুদ্রকে বন্ধন করিয়া তাহার উপর সেতু নির্মাণ করিয়াছে। ইহার উপর দিয়া সেনাবাহিনী পারাপার করিতেছে। সমুদ্র চিরদিন অজেয় অলঙ্ঘ্য। কেহ তাহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই। সমুদ্র চির স্বাধীন। অবাধ মুক্তির মধ্যেই তাহার সৌন্দর্য। আজ রামচন্দ্রের হাতে তাহার বন্ধন দশা ঘটিয়াছে। ইহাকে মনে হইতেছে যেন বন্ধনমাল্য। সমুদ্রের অঙ্গে যেন বন্ধনের মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা তাহার পক্ষে একান্ত বেমানান। সমুদ্র জলের অধিপতি। তাহার রূপ অতি বিরাট। তাহাকে কখনো লঙ্ঘন করা যায় না, বা তাহাকে জয় করা যায় না। রামচন্দ্রের হাতে বন্ধনদশা গ্রহণ করায় তাহার সমস্ত মর্য্যাদা যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার গৌরব বিপর্যস্ত। সমুদ্রের এই হৃত গৌরব দেখিয়া রাবণ বিক্ষুব্ধ অন্তরে তাহার প্রতি বিদ্রূপবাক্য নিক্ষেপ করিয়াছেন।

১২। কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্রধন রক্ষণ রাজধর্ম : তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকাতুরা মাতা চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ বাক্য এখানে প্রকাশিত হইয়াছে।

রানী চিত্রাঙ্গদা রাবণের অন্যতম মহিষী। তিনি প্রধান মহিষী নহেন, এইজন্য স্বামীর সান্নিধ্যলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। পুত্র বীরবাহুকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবনধারা প্রবাহিত হইত। পুত্র ছিল তাঁহার নয়নমনি। বীরবাহু রামচন্দ্রের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইবার পর তাঁহার জীবন শূন্য হইয়া গিয়াছে। পুত্রহারা অবস্থায় তিনি কাঙালিনী। বীরবাহুকে তিনি রাবণের নিকট রাখিয়াছিলেন। তাঁহাকে রক্ষা করাই ছিল রাবণের রাজধর্ম। কিন্তু রাবণ সে রাজধর্ম পালন করেন নাই। রাবণ যদি বীরবাহুকে রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন। তবে বীরবাহু অকালে মরিত না বা তাঁহার জীবনও এমনভাবে অন্ধকার হইয়া যাইত না। বীরবাহুকে যুদ্ধে পাঠাইবার আগে রাবণের চিত্রাঙ্গদার কথা ভাবা উচিত ছিল। এখন তিনি কি করিবেন, বুঝিতে পারিতেছেন না। পুত্রহারা অবস্থায় তাঁহার পক্ষে জীবণধারণই কষ্টকর।

১৩। এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদার অনুযোগের উত্তরে রাবণের শোকার্তি এই অংশে প্রকাশিত হইয়াছে।

বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণ মহিষী চিত্রাঙ্গদা অতিশয় শোকার্ত। পুত্র ছিল তাঁহার জীবনের অবলম্বন। সেই পুত্রবিহনে তাঁহার জীবন শূন্য হইয়া গিয়াছে। রাবণের কুকার্যের ফলেই তাঁহার পুত্রের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু রাবণ

তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার বক্তব্য, বিধি বিমুখ বলিয়াই লঙ্কাপুরীর এই শোচনীয় বিপর্যয়। চিত্রাঙ্গদার পুত্র বীরবাহু যুদ্ধে নিহত। তাই তিনি শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু তাঁহার নিজের শত শত পুত্র যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে। চোখের সামনে লঙ্কার বড় বড় বীরেরা নিহত। দিবারাত্র তাঁহার বুকের মধ্যে মৃত্যু-বেদনা উৎসারিত। তথাপি তিনি ভাঙিয়া না পড়িয়া নিজের কর্তব্য করিয়া যাইতেছেন। হৃদয়ের যন্ত্রণা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া তিনি রামচন্দ্রের সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছেন।

১৪। কাকোদর সদা,
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ। উর্ধ্বফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদা রাবণের প্রতি যে অনুযোগ করিয়াছেন, তাহাই এখানে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিষধর সর্প স্বাভাবিক অবস্থায় মাথা নত করিয়া চলে। এই অবস্থায় সে নম্র এবং স্বভাবত কাহারও অনিষ্ট করে না। কিন্তু কেহ যদি তাহাকে প্রহার করে। তবে সে নত মস্তক উঁচু করিয়া দংশন করে। রামচন্দ্রও স্বভাবত বিনম্র শান্ত প্রকৃতির। তিনি সীতাদেবীকে লইয়া নিভৃতে পঞ্চবটীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি কাহারও ক্ষতি করেন নাই। কিন্তু রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া আসিলেন। তখন তিনি হিংস্র রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া লঙ্কাপুরীর ধ্বংসলীলায় মত্ত হইয়া উঠিলেন। রাবণই লঙ্কাপুরীর এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। তাঁহার কৃতকর্মের জন্যই আজ সমগ্র লঙ্কাপুরীতে ধ্বংসের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তিনি যদি সীতাকে হরণ না করিতেন, তবে এসব কিছুই ঘটিত না। সীতাকে হরণ করিবার ফলে তিনি নিজেও ধ্বংস হইতে বসিয়াছেন, আর রাক্ষসকুলেরও ধ্বংসের কারণ হইয়াছেন।

১৫। উঠিলা পবন পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল ধনুঃ—
বিবিধ রতন কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে !

আলোচ্য অংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে বারুণী সখী মুরলার রূপ বর্ণনা এবং তাহার লঙ্কাপুরী ত্যাগের বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাবণ রামচন্দ্রের সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধের জন্য রাক্ষস সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন। রাক্ষস বাহিনীর পদঘাতে সমুদ্রের তলদেশ প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সমুদ্র পত্নী বারুণী ইহাতে বিচলিত হইয়া ইহার কারণ,

জিজ্ঞাসা করিলে নদী মুরলা রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতির বিষয় জানাইল। বারুণীর নির্দেশে সে লঙ্কাপুরী ত্যাগ করিয়া লঙ্কাদেবীর নিকট উপস্থিত হইল। লঙ্কাদেবী তাহাকে বলিলেন যে রাবণের পাপের জন্য লঙ্কা বীরশূন্য হইয়া পড়িতেছে। তখন সেই সংবাদ দানের জন্য মুরলা আবার বারুণীর উদ্দেশে আকাশ পথে উড়িতে লাগিল। তাহার অপূর্ব রূপ যেন শতধারে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। মনে হইল সে যেন এক রূপসী ময়ূরী। ইন্দ্রের ধনুতে যেমন বিবিধ রত্ন খচিত থাকে বলিয়া তাহা মনোরম বর্ণাঢ্য রূপ ধারণ করে, মুরলাকে সেইরূপ বর্ণাঢ্য মনে হইতেছিল।

১৬। নিশারণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে, তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রভাষার মুখে বীরবাহুর মৃত্যুর কথা শুনিয়া মেঘনাদের বিস্ময়-সূচক উক্তি এখানে প্রকাশিত।

বীরবাহু মহাবীর। তাই প্রভাষার মুখে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মেঘনাদ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি নিজে নিশাযুদ্ধে রামচন্দ্রকে বধ করিয়াছেন। প্রচণ্ড তীর বর্ষণ করিয়া রামচন্দ্রের সেনাবাহিনীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দুর্মোচ্য নাগপাশে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং রামচন্দ্রের পক্ষে জীবন লাভ করিয়া বীরবাহুকে বধ করা অবিশ্বাস্য ঘটনা। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। যে লোক মরিয়া যায়, তাহার পক্ষে পুনরায় জীবন লাভ করা সম্ভব না। সুতরাং প্রভাষার কথা বিশ্বাস্য নয়। তাই মেঘনাদ তাহাকে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি কোথায় এই অবিশ্বাস্য কথা শুনিয়াছেন, তাহা যেন শীঘ্র প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় সর্গ

শব্দার্থ টীকা-টিপ্পনী

আইলা .... ভালে—গোধূলিবেলায় পশ্চিম আকাশে শুকতারা দেখা যায়। এই শুকতারাকে কবি গোধূলির ললাটের রত্ন কল্পনা করিয়াছেন। **কুমুদী**—শাপলাফুল। **মুদিলা**—বন্ধ করিল। **মুদিলা ...... সরসে ..... নলিনী**—সূর্য অস্ত গেলে তাহার প্রিয়তমা পদ্মের চোখ অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং তাহার মুখ হইল বিষণ্ণ। **কুজনি**—কূজন করে। **কুলায়ে**—নীড়ে। **গোষ্ঠগৃহে**—

গোশালায়। **শর্বরী**—রাত্রি। **সুগন্ধবহ**—সুন্দর গন্ধবহনকারী বাতাস। **সুস্বরে**—সুমধুর স্বরে। **ক্রোড়নীড়ে**—মাতৃকোলরূপ বাসায়। **দেবীর**—নিদ্রাদেবীর। **নিশিপ্রিয়া**—রাত্রিতে চন্দ্র উদিত হয় বলিয়া তাহাকে রাত্রির প্রিয়া বলা হয়। **ত্রিদশ আলয়ে**—দেবলোকে। [দেবতাদের তিনটি দশা—শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। তাহাদের প্রৌঢ়ত্ব বা জরা নাই। তিনটি দশার জন্য দেবতাদের ত্রিদশ বলা হয়।] **পুলোমনন্দিনী**—পুলোমার কন্যা শচীদেবী। **চারুনেত্রা**—সুন্দর চক্ষু বিশিষ্টা। **চামরী**—চামরধারী। **সুসমীরণ**—মনোরম বাতাস। **ত্রিদিব**—স্বর্গীয়। **বাদিত্র**—বাদ্য। **দেবঅন্ন**—দেবভোগ্য অন্ন। **কেশর**—বকুল পুষ্প। **মন্দার দাম**—পারিজাত পুষ্পমাল্য। **বৈজয়ন্ত ধামে**—ইন্দ্রলোকে। **শচীকান্ত**—শচীর পতি ইন্দ্র। **আশীষিয়া**—আশীর্বাদ করিয়া। **পুণ্ডরাকাক্ষ**—বিষ্ণু। **বক্ষে নিবাসী**—বক্ষে অবস্থান কারিণী অর্থাৎ লক্ষ্মী। **বারীন্দ্র**—সমুদ্র। **বিশ্বরমে**—বিশ্বের রমণীয়া। **সুরনিধি**—দেবরাজ। **নিজ কর্মদোষে……পাপী**—রাবণ পাপ করিয়াছেন। আর প্রজাগণ তাহার ফলভোগ করিতেছে। **কারাগার**—লক্ষ্মীদেবীর কাছে লঙ্কা এখন কারাগার বলিয়া মনে হইতেছে। **বৃত্র বিজয়ী**—ইন্দ্র। **বিক্রম-কেশরী**—সিংহের মতো বিক্রমশালী। **আক্রমিবে**—আক্রমণ করিবে। **দেবকুলপ্রিয়**—দেবকুলের প্রিয়। **নিকুম্ভিলা যজ্ঞ**—লঙ্কার পশ্চিমদিকে গুহা। ইহার মধ্যে নিকুম্ভিলা দেবীর অবস্থান। মেঘনাদ ইহার পূজা করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেন। **দম্ভী**—দর্পী। **সঙ্কটে**—বিপদে। **মন্দোদরীর নন্দন**—মেঘনাদ। **বিহঙ্গকুলে**—পক্ষিকুলে। **বৈনতেয়**—গরুড়।

বলজ্যেষ্ঠ—সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। **শূরমণি**—বীরশ্রেষ্ঠ। **কেশববাসনা**—কেশব অর্থাৎ বিষ্ণুর কামনার ধন লক্ষ্মী। **স্বকর্ম**—গীতবাদ্যাদি নিজ নিজ কাজ। **মঞ্জুরিত**—পুষ্পিত। **স্বরীশ্বর**—স্বর্গের অধিপতি। **বিশ্বনাথ**—বিশ্বেশ্বর মহাদেব। **পন্নগ**—সর্প। **অশনে**—খাদ্য। **পন্নগ-অশনে**—গরুড়কে। **দম্ভোলি**—বজ্র। **বিমুখয়ে**—বিমুখ করে। **সর্বশুচি**—অগ্নি সকল কিছু শুদ্ধ করে বলিয়া তাহাকে সর্বশুচি বলা হয়। **উপেন্দ্র**—বিষ্ণু। **উপেন্দ্র প্রিয়া**—বিষ্ণুর প্রেয়সী। **চন্দ্রশেখর**—শিব। **অনন্ত**—অনন্ত নামক নাগরাজ। **অনন্ত ক্লান্ত এবে**—অনন্ত নাগ পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু পৃথিবী পাপের ভারে ভারী বলিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। **বিরূপাক্ষ**—শিব। **অবিরল**—অবিরত। **জটাধরে**—জটাধারী শিবকে। **ত্র্যম্বকে**—মহাদেবকে। **অম্বিকা**—পার্বতী। **অম্বর পথে**—আকাশ পথে। **অধোদেশে**—নিচের দিকে। **পরিমল সুধা**—সুগন্ধরূপ অমৃত। **মৃণালের রুচি**—পদ্মের নালের সৌন্দর্য। **বিকচ**—প্রস্ফুটিত।

দেবযান—স্বর্গীয় রথ। **লজ্জাশীলা কুলবধূ**—কুলবধূ ভাবল যে রাত শেষ হইয়া গিয়াছে, তাই সে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। **মানস সকাশে**—মানস সরোবরের নিকট। **কৈলাস শিখরী**—কৈলাস পর্বত। **আভাময়**—দীপ্তিমান। **ভবের**—মহাদেবের। **নির্ঝর**—ঝরনা। **ঝরিত**—ঝরিতেছে। **বিসদ চন্দনে**—শ্বেত চন্দনে। **চর্চিত**—অবলিপ্ত। **বপুঃ**—দেহ। **পদব্রজে**—পায়ে হাঁটিয়া। **আনন্দ ভবনে**—আনন্দপূর্ণ শিবের আলয়ে। **রাজ রাজেশ্বরী রূপি**—

মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞীর মতো। **ঈশ্বরী**—অম্বিকা। **বিজয়া**—পার্বতীর সখী। **জয়া**—পার্বতীর অন্য সখী। **হায়রে··বিভা**—শিবের আলয়ের সৌন্দর্য সম্পদ তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। **দম্ভোলী নিক্ষেপী**—বজ্রক্ষেপণকারী ইন্দ্র। **আকুল বিগ্রহে**—ভয়ঙ্কর যুদ্ধে। **পরন্তপ**—শত্রুপীড়নকারী। **ইষ্টদেব**—উপাস্য দেবতাকে। **বিশ্বধর শেষ**—পৃথিবী বহনকারী শেষ নাগ। **তিনিও আপনি**—স্বয়ং লক্ষ্মীও। **অম্বদে**—পার্বতী। **বিশ্বনাশী**—বিশ্ব ধ্বংসকারী। **কুলিশে**—বজ্রকে। **নিস্তেজে**—নিস্তেজ করে। **শৈবকুলোত্তম**—শ্রেষ্ঠ শিবভক্ত। **নৈকষেয়**—রাবণ। **ত্রিশূলী**—ত্রিশূলধারী শিব। **সম্ভবে**—সম্ভব হয়। **তাপসেন্দ্র**—যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব। **তেঁই**—সেজন্য। **দুর্মতি**—দুষ্টবুদ্ধি। **সুশীল**—সচ্চরিত্র। **পরদার**—পরস্ত্রী। **পামর**—পাপী। **স্বরীশ্বরী**—ইন্দ্রের পত্নী শচী। **বিধুবদনা**—চন্দ্রের মতো সুন্দর মুখ যাহার। **বৈদেহী রঞ্জনে** বিদেহ রাজকন্যা সীতার প্রিয় পতি রামচন্দ্রকে। **দাসীরে কলঙ্ক ভঞ্জ**—তোমার দাসী শচীর কলঙ্ক দূর কর। **শশাঙ্কধারিণী**—শিবের পত্নী। **শরমে**—লজ্জায়। **পরাভবে**—পরাজিত করে। **জিষ্ণু**—বিজয়শীল ইন্দ্র। **মঞ্জুনাশিনী**—সৌন্দর্যহরণকারিণী। শচীদেবী এত সুন্দরী যে তাহার সৌন্দর্যে অন্যান্য অপ্সরাদের সৌন্দর্য ম্লান হয়। **পুরিতে**—পূর্ণ করিতে। **বৃষধ্বজ**—বৃষাতেন মহাদেব। **ঘনঘনাবৃত**—ঘন মেঘে ঢাকা। **অদিতিনন্দন**—অদিতির পুত্র ইন্দ্র। **জগদম্বে**—জগন্মাতা। **ত্রিপুরারি**—ত্রিপুর নামক অসুরের প্রাণহন্তা মহাদেব। **হ্রাসো**—হ্রাস করো। **দৈত্যরিপু**—দৈত্যশত্রু ইন্দ্র। **গন্ধামোদে**—গন্ধের মাদকতায়। **মঙ্গল নিক্বণ**—কাঁসর ঘন্টাদির মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি। **ভবেশ ভাবিনী**—হরপ্রিয়া। **নগনন্দিনী**—পার্বতী। **বারি সংঘটিত ঘটে**—জলপূর্ণ ঘটে। **নীলোৎপলাঞ্জলি**—নীলপদ্মের অঞ্জলি। **তার**—ত্রাণ কর। **দেব-দম্পতিরে**—মহেন্দ্র ও শচীকে। **বিকট শিখর**—ভয়ঙ্কর পর্বতশীর্ষ। **দ্বিরদ-গামিনী**—গজগমনা। **তারাকারা**—তারার আকৃতিবিশিষ্টা। **কবরী**—খোঁপা। **চির-রুচি**—চিরসুন্দরী। **চির-বিকচিত**—চির-প্রস্ফুটিত। **কুসুম রতন-রাজী**—উত্তম পুষ্পসমূহ। **মোহিল**—মুগ্ধ করিল। **যোগীব্রজ**—যোগীসকল। **সেবিব**—সেবা করিব। **মন্মথ**—কামদেব। **বরাননা**—মনোহর আননবিশিষ্টা। **বিহারিতেছিলা**—বিহার করিতেছিল। **পরিমলময়-বায়ুতরঙ্গিনীরূপে**—পুষ্পগন্ধ বায়ুস্রোতে। **সরসে**—রসযুক্ত হইয়া; নিশার শিশিরে সিক্ততাহেতু রসযুক্ত হইয়া। **নিশান্তে**—রাতের শেষে; প্রভাতে। **ত্বিষাম্পতি-দূতী**—আলোকেশ্বর-সূর্যের আগমন-বার্তাবাহিনী। [রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে পূর্বদিগন্ত রক্তিমাভ হইয়া উঠে যে কালে, তাহাকে বলে উষা. উষাকে তাই কবি সূর্যের দূতী কল্পনা করিতেছেন।] **মদন প্রিয়া**—রতি। **হরপ্রিয়া**—পার্বতী। **যোগীন্দ্র**—যোগিরাজ শিব। **সমাধি**—বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্যানস্থ অবস্থা। **সুকেশিনী**—রুচির কুন্তলা। **বরবপুঃ**—মনোহর দেহ। **পিনাকী**—পিনাকধারী। শিবের ধনুর নাম পিনাক। **মধুকালে**—বসন্ত ঋতুতে। **কুসুমকুন্তলা**—পুষ্পখচিত কেশ। বনের শাখা পল্লবকে বনের কেশ এবং ফুল সে কেশে পরিহিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। **কেশর**—পুষ্পরেণু। **রত্ন সঙ্কলিত আভা**—রত্নের দ্যুতিবিশিষ্ট। **লাক্ষারস**—

আলতা। পূর্বে লাক্ষাকীটের লালা হইতে আলতা তৈরী হত। **চিত্রিলা**—চিত্রিত করিল। **চারুনেত্রা**—রুচির নয়না। **নগেন্দ্রবালা**—পর্বতরাজদুহিতা অম্বিকা। **স্মর-হর-প্রিয়া**—মদন ভস্মকারী শিবের পত্নী পার্বতী। **ফুলধনুঃ**—পুষ্পময় ধনুর্ধর কন্দর্পদেব। **শৈলেশসুতা**—গিরিরাজ কন্যা পার্বতী। **মায়ার নন্দন**—মায়াদেবীর পুত্র কন্দর্পদেব। [শিবের ক্রোধের অগ্নিতে কন্দর্পদেব অগ্নিদগ্ধ হইলেন। তারপর কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে তাঁহার পুনর্জন্ম হইল। তখন মহাদেব আবার তাহাকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিলেন। একটি বৃহৎ মাছ তাহাকে গিলিয়া ফেলিল। এক ধীবর মাছটি ধরিয়া শম্বর দানবকে তাহা দান করিল। সম্বরের ঘরে রতিদেবী মায়া নামে দাসীবৃত্তি করিতেছিলেন। তিনি মাছটি কাটিতে গিয়া শিশুটি পাইলেন, এবং তাহাকে অপত্যবৎ পালন করিতে লাগিলেন। এইজন্য কন্দর্প দেবকে মায়ার নন্দন বলা হইয়াছে।] **হিমাদ্রি**—হিমালয় পর্বত। **গ্রহিলা**—গ্রহণ করিল। **হিমাদ্রির ফুলশর**—দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া শিব সতীর শব কাঁধে লইয়া পাগল হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সতীর শবদেহ টুকরো টুকরো হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ইহার পর শিব ধ্যানমগ্ন হইলেন। সতী হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল উমা। তিনি শিবের জন্য আবার তপস্যা করিলেন। ইন্দ্র কন্দর্পদেবকে পাঠাইলেন শিবের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য। কন্দর্পদেব পুষ্পশর নিক্ষেপ করিলে শিবের ললাট নেত্রের অগ্নিতে তাঁহাকে দগ্ধ হইতে হইল। **কুলগ্নে**—অশুভ মুহূর্তে। **বামদেব**—মহেশ্বর। **আক্রমে**—আক্রমণ করে। **বিভাবসু**—অগ্নি। **ভবেশ্বরি**—মহেশ্বরি। **ভবেশ্বর ভালে**—শিবের ললাটে। **ভগ্নোদ্যম**—হতোৎসাহ। **ক্ষেমঙ্করি**—কাত্যায়ণী। **অনঙ্গ**—মদন। **মোহিনী বেশে**—মনোহররূপে। **মাতিবে**—মত্ত হইবে। **হিতে বিপরীত**—রামচন্দ্রের কল্যাণ করিতে যাইয়া পৃথিবীর অকল্যাণ ডাকিয়া আনা হইবে। **দিতিসুত**—কশ্যপ পত্নী দিতির গর্ভজাত দৈত্যগণ। **বিবাদিল**—বিবাদ করিল। **শ্রীপতি**—বিষ্ণু। **ছদ্মবেশী**—মোহিনী নারীর বেশধারী। **হৃষীকেশ**—বিষ্ণু। **নম্রশিরঃ**—নত মস্তক। **মন্দর আপনি**—স্বয়ং মন্দর পর্বত। **মলম্বা**—স্বর্ণপাত্র। **অম্বর**—আচ্ছাদন। **মলম্বা অম্বরে**—সোনার পাতে মোড়ান। **ঘন**—মেঘ। **চক্রপ্রসরণে**—চক্রের বেষ্টনীতে। **সুধাংশু মণ্ডলে**—চন্দ্রলোকে। **শক্র**—ইন্দ্র। **দ্বিরদ-রদ-নির্মিত**—গজদন্ত নির্মিত। **সুহাসিনা**—মধুর হাস্যময়ী। **মন্মথ**—কন্দর্পদেব। **খরতর ফুলশরে ভরা**—কন্দর্পদেবের পঞ্চ পুষ্পবাণ—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল। **কৈলাস শিখরি শিরে**—কৈলাশ পর্বতের উপরিভাগে। **ভৃঙ্গমান**—সাঙ্গুমান। **ভৈরব নিনাদী**—ভয়ংকর শব্দকারী। **জলকান্ত**—সমুদ্র। **তমঃ**—অন্ধকার। **তমঃ যথা ঊষার হসনে**—ঊষার হাসিতে অন্ধকার কাটিয়া যায়। **কপর্দী**—জটাধারী শিব। **তপসী**—তাপস। **বিভূতি**—ভস্ম। **বাহ্যজ্ঞান হত**—বাহিরের চেতনা লুপ্ত। **সুচারুহাসিনী**—মধুর হাস্যময়ী। **সম্বর অরি**—কন্দর্পদেব। **হাঁটু পাড়ি**—নতজানু হইয়া। **মীনধ্বজ**—কন্দর্পদেবের পতাকা মৎস্য চিহ্ন অঙ্কিত বলিয়া তাহাকে মীনধ্বজ বলা হয়। **শিঞ্জিনী**—ধনুর্গুণ। **সম্মোহন শরে**—সম্মোহন নাম বাণে। **চিত্রভানু**—অগ্নি। **জ্বলনে**—দীপ্তিতে। **কেশরী-**

কিশোর—সিংহ শিশু। **কেশরিণী**—সিংহী। **নির্ঘোষে**—নিনাদে। **ঘোষে**—শব্দ করে। **ঘনদল**—মেঘরাশি। **কালানল**—মৃত্যুবাহী অগ্নি। **ঝলসে**—ঝলসাইয়া দেয়। **উন্মীলি**—উন্মীলন করে। **ধূর্জটি**—মহাদেব। **পশুপতি**—মহেশ্বর। **গণেন্দ্রজননি**—গণেশমাতা পার্বতী। **মৃগেন্দ্র**—পশুরাজ সিংহ। **কিঙ্কর**—ভৃত্য। **শঙ্করী**—পার্বতী। **পতিপরায়ণা**—পতিব্রতা। **ঈশান**—মহেশ। **আজিন আসনে**—ব্যাঘ্রচর্মে। **প্রফুল্লিল**—প্রফুল্ল হইল। **মকরন্দ**—মধু। **শিলীমুখবৃন্দ**—ভ্রমরবৃন্দ। **কুসুম আসার**—পুষ্পধারা। **কুসুমেষু**—কন্দর্পদেব। **বিভাবসু**—অগ্নি। **বিহঙ্গমরাজ**—পক্ষিরাজ। **সুখসদন**—সুখের স্থান। **প্রসূনাসার**—পুষ্পবৃষ্টি। **কুমুদী**—শাপলা। **মদনমোহিনী**—রতিদেবী। **মধুসখা**—বসন্ত সখা মদন। **বামদেব**—শিব। **হিংসক**—হিংসাকারী। **কিরে**—শপথ। **ভাস্কর করে**—সূর্য কিরণে। **উত্তরি**—উত্তীর্ণ হইয়া। **অকম্প চামর শিরে**—অগ্নির মতো তেজস্বী অশ্ব দ্রুতগতিতে ছুটিতেছে। ইহার ফলে ঘাড়ের কেশর পর্যন্ত কাঁপাইবার অবকাশ পাইতেছে না। **সহস্রাক্ষ**—ইন্দ্র। **দেউলে**—মন্দিরে। **কুহকিনী**—মায়াবিনী। **শক্তিশ্বরী**—শক্তির ঈশ্বরী। **সৌমিত্রি**—সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ। **বিরূপাক্ষ**—মহাদেব। **বিমুখি**—বিমুখ করে। **কৃত্তিকাকুল বল্লভ**—কৃত্তিকা প্রভৃতির প্রিয় কার্তিকের। **বৃষভধ্বজ**—মহাদেব। **ফলা**—ঢাল। **কৃতান্ত**—মৃত্যু। **সুনাসীর**—ইন্দ্রের। **বিষাকর**—বিষের খনি। **দিবাকর পরিধি**—সূর্যের পরিধি। **ষড়ানন**—কার্তিকের। **পূর্বাশার**—পূর্ব দিগন্তের। **হৈমহার**—সুবর্ণখচিত হার। **পদ্মকর**—পদ্মতুল্য কর। **বীরেন্দ্রকেশরী**—বীরসিংহ। **গন্ধর্বকুলপতি**—গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ। **চপলা**—বিদ্যুৎ। **দেবকুল নাথ**—সুরপতি বাসব। **প্রভঞ্জনে**—বায়ুদেবকে। **প্রলয়ঝড়**—প্রচণ্ড ঝড়। **সত্বরে**—তাড়াতাড়ি করিয়া। **ঘন**—সংঘাত। **বারিনাথ**—সমুদ্র। **নির্ঘোষে**—শব্দ সহকারে। **লম্ফী**—লম্ফ প্রদানকারী। **তিমিরাগারে**—অন্ধকার গৃহে। **গিরিগর্ভে**—পর্বতের অভ্যন্তরে। **হুহুঙ্কারি**—হুংকার ছাড়িয়া। **তরঙ্গ আবলী**—ঢেউগুলি। **কল্লোলিল**—শব্দ করিল। **মন্দ্রে**—সশব্দে। **জীমূত**—মেঘ। **তারানাথ**—চন্দ্র। **পাবক**—অগ্নি। **উপাড়ি**—উপড়াইয়া ফেলে। **মড়মড়ে**—মড়মড় শব্দে করে। **আসার**—বৃষ্টি। **প্রলয়ে**—প্রলয়ের জন্য। **বৃষ্টিল**—বৃষ্টি হইল। **পশিল**—প্রবেশ করিল। **বিরাজেন**—অবস্থান করেন। **সারসন**—কটিবন্ধ। **সৌর কিরীটের**—দেব মুকুটের। **দৈববিভা**—দেবসম্ভব দীপ্তি। **পাত্ত**—পা ধুইবার জল। **অর্ঘ্য**—সংবর্ধনার উপাদান। **কুশাসনে**—কুশতৃণনির্মিত আসনে। **আশীষিয়া**—আশীর্বাদ করিয়া। **সুস্বরে**—মধুর কণ্ঠে। **গন্ধর্বকুল আমার অধীনে**—আমি গন্ধর্বদের অধিপতি। **অনুজে**—অনুজকে। **আবির্ভাবি**—আবির্ভূত হইয়া। **দেবকুলপ্রিয়**—দেবগণের প্রিয়পাত্র। **সুপ্রসন্ন অম্বিকা**—অম্বিকা যখন রামের প্রতি প্রসন্ন, তখন তাঁহার চিন্তার কোন কারণ নাই। রাবণের ধ্বংস অনিবার্য। **এ শুভ সংবাদে**—দেবী রামচন্দ্রের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন, এই শুভ সংবাদে। **নৈবেদ্য**—দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ফলমূলাদি সামগ্রী। **বলি**—পূজার উপহার। **সারকথা**—সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাক্য।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা

(১) ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর আদি
দেবীর চরণাশ্রয়ে বিশ্রাম লভিলা।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এখানে কবি দিবা অবসানের অব্যবহিত পরমুহূর্তের রাত্রি সমাগমের মনোরম বিবরণ দান করিয়াছেন।

দিবাভাগে জীবকুল নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। কাজের মধ্যে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। দিনের শেষে আসে রাত্রি। এবার সকলেই ক্লান্ত দেহে নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরিয়া যায়। নিদ্রাদেবীর স্নেহময় ক্রোড় জীবকুলের পরম আশ্রয়। নিবিড় অন্ধকারে যখন স্বর্গ-মর্ত্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন জীবকুল নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করে। শিশুরা যেমন খেলাধূলার শেষে মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করে, পক্ষিকুল নিজ নিজ নীড়ে বিশ্রাম লয়, জীবকুলও নিদ্রাদেবীর স্নেহচ্ছায়ায় বিশ্রাম লয়। তাহাদের সকল শ্রান্তি ক্লান্তির অবসান ঘটে।

(২) বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে ?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মেঘনাদ বধের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিবার জন্য লক্ষ্মীদেবীর ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি এখানে বিবৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মীদেবী রাবণের আশ্রয়ে আর বাস করিতে চান না। কেননা তিনি রাবণকে পাপী মনে করেন। তাঁহার পাপের জন্য তাঁহার ধ্বংস অনিবার্য। রাবণের মৃত্যু হইলে তিনি এখান হইতে মুক্তি পাইবেন। এখন রাবণকে ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইবার সাধ্য তাঁহার নাই। কারাগারে যে বন্দী আবদ্ধ থাকে, সে নিজের চেষ্টায় বাইরে যাইতে পারে না। কারাগারের দ্বার খুলিলে তবেই সে মুক্তি পায়। তেমনি লক্ষ্মীদেবীও নিজের চেষ্টায় বা ইচ্ছায় লঙ্কাপুরীরূপ এই কারাগারের বাইরে যাইতে পারিবেন না। যতক্ষণ না ইন্দ্রাদি দেবতাগণ রাবণকে হত্যার ব্যবস্থা না করেন। ততক্ষণ লঙ্কাপুরীর কারাগার হইতে তাঁহার মুক্তি নাই। রাবণের মৃত্যু হইলেই লঙ্কাপুরীর দ্বার খুলিয়া যাইবে। অতএব ইন্দ্র যেন রাবণ বধের নিমিত্ত তৎপর হইয়া ইহার নিমিত্ত উদ্যোগ আয়োজন করেন।

(৩) পরিমল সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার। মৃণালের রুচি
বিকচ কমলগুণে; শুন গো ললনে।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মেঘনাদ বধের নিমিত্ত ইন্দ্র কৈলাস পর্বতে শিবের নিকট গমন করিবেন। পত্নী শচীদেবীকে তিনি সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বাতাস জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। সকলেই বাতাস ভালোবাসে। বাতাসের সহিত যদি মিষ্ট পুষ্পগন্ধ মিশিয়া থাকে, তবে সেই ভালোবাসা যেন আরো বৃদ্ধি পায়। পুষ্পগন্ধ মিশ্রিত বাতাস-একদিকে যেমন প্রয়োজন মেটায়, অন্যদিকে মনকেও প্রফুল্ল করে। মৃণালের নিজস্ব কোন শোভা নাই। পদ্মফুলের জন্যই তাহার সৌন্দর্য। পদ্মফুল মৃণালের উপর ফুটিয়া থাকে বলিয়াই মৃণালকে লোকে আদর করে। হরপার্বতী ইন্দ্রকে স্নেহ করেন সত্য। কিন্তু ইন্দ্রের সহিত শচীদেবীকে দেখিলে তাহারা দ্বিগুণ আনন্দ লাভ করিবেন। তাহারা তখন দুইজনকে গভীর স্নেহাদর করিবেন। এইজন্য ইন্দ্র শচীদেবীকে তাঁহার সহিত হরপার্বতীর নিকট যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

(৪) তার শিরে ভবের ভবন,
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণফুল শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি, পীত ধড়া যেন!
নির্ঝর ঝরিত বারি রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মেঘনাদ বধের উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র ও শচীদেবী কৈলাস পর্বতে গমনের পর সেখানকার অনুপম শোভা-সৌন্দর্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

মেঘনাদ বধের উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র পত্নী শচীদেবীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন। কৈলাস পর্বতের শোভা সৌন্দর্যের কোন তুলনা নাই। কৈলাসের শিখরদেশে দেবাদিদেব মহাদেবের ভবন অবস্থিত। কৈলাসের উপর শিবের ভবন দেখিয়া মনে হয় কৃষ্ণের মস্তকের উপর ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। শ্যামবর্ণ কৈলাস পর্বতের নানাস্থানে কত যে সোনালী পুষ্প ফুটিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্যামবর্ণ কৈলাস পর্বতের গায়ে সোনালী পুষ্পকে কৃষ্ণের পীতধড়া বলিয়া মনে হইতেছে। নানাস্থানে ঝরনা হইতে জলধারা নির্গত হইতেছে। মনে হইতেছে শ্যামদেহে যেন শ্বেতচন্দন লেপন করা হইয়াছে।

(৫) দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্মতি,-তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদ-বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাবণের নিকট হইতে শক্তি ফিরাইয়া লইবার জন্য ইন্দ্র পার্বতীর নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন।

হর-পার্বতী রাবণকে স্নেহ করেন। কিন্তু এই স্নেহ অপাত্রে দান করা হইতেছে। ইন্দ্রের মতে, রাবণ এই স্নেহলাভের উপযুক্ত নহেন। তিনি একান্ত-ভাবে ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত। তাঁহার বিশাল ঐশ্বর্য এবং অনেক পত্নী আছে। তথাপি অপরের পত্নীর প্রতি তাঁহার লোভ যায় নাই। রামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করিয়া দরিদ্রের মতো বনের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। পত্নী সীতাদেবী ছিলেন তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। রাবণ তাঁহার সেই জীবন অবলম্বন হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং পার্বতীর পক্ষে এইরূপ দুরাচারী পরস্ত্রী অপহরণকারীকে স্নেহ করা ঠিক নয়। রাবণ হর-পার্বতীর স্নেহ লাভ করিয়া যুদ্ধে অজেয়। হর পার্বতীর স্নেহ হারাইলে তাঁহার আর কোন শক্তি থাকিবে না। তখন তাঁহার বিনাশ অনিবার্য। অতএব দেবী পার্বতী যেন রাবণকে স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে শক্তিহীন করেন, ইহাই ইন্দ্রের প্রার্থনা।

(৬) কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিরহে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ?

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। মেঘনাদ বধের জন্য প্রার্থনা করিয়া ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী পার্বতীর নিকট যাহা বলিয়াছেন, এখানে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

দেবরাজ ইন্দ্র পত্নী শচীদেবীর সহিত কৈলাস পর্বতে যাইয়া পার্বতীর নিকট রাবণের অত্যাচারের বিবরণ দান করিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া রামচন্দ্রের জীবনে বিপর্যয় আনিয়া দিয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রতি দেবীর করুণা কেন, ইহাই ইন্দ্রের জিজ্ঞাসা। ইহার পর শচীদেবীও সীতার দুঃখকষ্টের বিবরণ দান করিলেন। অশোক বনে বসিয়া দিবারাত্র তিনি ক্রন্দন করিতেছেন। রামচন্দ্রকে তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসেন। অথচ সেই রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটানো হইয়াছে। কি দুঃসহ দুঃখ সীতাদেবী ভোগ করিতেছেন, তাহা পার্বতীর অজ্ঞাত নহে। পতিবিরহের যে কি কষ্ট, তাহা পার্বতীও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানেন। রাবণ পার্বতীর আশ্রিত। সুতরাং পার্বতী যদি রাবণের দণ্ডবিধান না করেন, তবে কাহারও সাধ্য নাই, রাবণকে দণ্ডদান করে। শচীদেবীর প্রার্থনা, দেবী যেন রাবণকে দণ্ডদান করেন।

(৭) বিনাশি, দেবি, রক্ষকুল, রাখ
ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্মের মহিমা ;
হ্রাসো বসুধার ভার, বসুন্ধরা যথ
বাসুকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাঘবে।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাবণ বধের নিমিত্ত ইন্দ্র দেবী পার্বতীর নিকট যে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, তাহাই এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।

রাবণ হর-পার্বতীর অনুগত ভক্ত, তাহাদের আশ্রিত। সুতরাং কিরূপে পার্বতী আশ্রিত ভক্তের বধের পরামর্শ দিবেন। রাবণকে ধ্বংস করিতে পারেন একমাত্র শিব। কিন্তু ইন্দ্রের পক্ষে শিবের নিকট গমন ও রাবণ বধে রাজী করানো অসম্ভব। একমাত্র পার্বতীর পক্ষেই ইহা সম্ভব। তাই ইন্দ্র পার্বতীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। রাবণের অত্যাচারে ত্রিভুবনের সকলে ভীত সন্ত্রস্ত। ধর্মের মহিমা লুপ্ত হইয়া চারিদিকে অধর্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পৃথিবী পাপের ভারে পীড়িত। তাই বাসুকী যেন আর পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না। তাই ইন্দ্রের প্রার্থনা; দেবী রাবণ বধ করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করুন, ধর্মের মহিমা বৃদ্ধি হোক, পৃথিবীকে তিনি পাপের ভার হইতে যেন মুক্ত করেন। রাবণের মৃত্যুর মধ্য দিয়া পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরিয়া আসুক।

(৮) তথায় উমার ইচ্ছা পরিমল সম—
বায়ু তরঙ্গিনী রূপে, বহিল নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে!

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। পার্বতী রতিদেবীকে স্মরণ করিলে কিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই এখানে বিবৃত হইয়াছে।

দেবরাজ ইন্দ্র শচীদেবীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস পর্বতে যাইয়া পার্বতীর কাছে মেঘনাদ বধের নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এদিকে রামচন্দ্রও অকালে দেবীর বোধন করিয়াছেন। পার্বতী মহাদেবের নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি ভাবিলেন, কন্দর্পদেব এবং তাহার পত্নী রতিদেবীর সাহায্যে যোগমগ্ন শিবকে কামোন্মত্ত করিয়া দিতে হইবে, এবং ইহার পর কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। তিনি রতিদেবীকে স্মরণ করিলেন। রতিদেবী তখন কুঞ্জবনে কন্দর্পদেবের সহিত বিহার করিতেছিলেন। সেই সময় দেবীর মনোবাসনা তাঁহার নিকট বায়ু-স্রোতের মতো উপস্থিত হইল। রতির হৃদয় সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে দেবী প্রেমের প্রয়োজনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। অঙ্গুলির স্পর্শে যেমন বীণার তারে অপূর্ব সুর ঝংকৃত হইয়া ওঠে, পার্বতীর ইচ্ছার স্পর্শে রতীদেবীর হৃদয় তেমনি পুলকিত হইয়া উঠিল।

(৯) যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া মজেছে
জ্বালাইল, পুজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিজ্ঞার কৌশলে।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। পার্বতী কন্দর্পদেবকে অভয় দান করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে বিবৃত হইয়াছে।

মহাদেব কৈলাস পর্বতে যোগাসন শৃঙ্গে ধ্যানমগ্ন। তাঁহার ধ্যানভঙ্গ না হইলে রাবণ বধ সম্ভব নয়। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইলে কন্দর্পদেবের সাহায্য প্রয়োজন। একবার শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়া কন্দর্পদেবকে তাঁহার তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। তাই পুনরায় শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে তাঁহার সাহস হয় না। কিন্তু পার্বতী তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন, যে তাঁহার ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। ইহার আগে শিবের ধ্যান-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তিনি শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, তাই কন্দর্পদেবকে অগ্নিদগ্ধ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এবার সে রকম কোন ভয় নাই। এবার জীবকুলের মঙ্গলের জন্যই শিবের ধ্যানভঙ্গ করা দরকার। এবার অগ্নিই তাঁহার পূজা করিবে। বিষ সাধারণভাবে জীবন নাশ করে। কিন্তু বিদ্যার কৌশলে যদি বিষকে শোধন করা যায়, তবে তাহা দ্বারা জীবন বাঁচানো যায়। কন্দর্পদেব এবার জগতের মঙ্গলের জন্যই শিবের ধ্যানভঙ্গ করিবেন।

(১০) মলিনা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি মনোহর।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মোহিনী বেশধারিণী পার্বতীর অসামান্য সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কন্দর্পদেব এই উক্তি করিয়াছেন।

শিব কৈলাস পর্বতে যোগাসন শৃঙ্গে ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন। রাবণ বধের জন্য তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করা প্রয়োজন। একমাত্র পার্বতীর পক্ষেই তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করা সম্ভব। তাই পার্বতী অপরূপ সাজসজ্জায় মোহিনীবেশ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার তপ্ত কাঞ্চন বর্ণে সেই বেশ অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার এই মনোহর রূপ দেখিয়া পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিবে। তাই কন্দর্পদেব তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, পূর্বে বিষ্ণুর মোহিনীবেশ দেখিয়া দেবাসুরে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন পার্বতীর এই মোহিনীরূপ দেখিয়া বিশ্ববাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা বিষ্ণুর মোহিনীবেশ সোনার পাতে ঢাকা তামার সহিত তুলনীয়। আর পার্বতীর মোহিনীবেশ বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

(১১) যে রমণী পতিপরায়ণা
সহচরী সহ সে কি যায় পতিপাশে?
একাকী প্রত্যুষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার!

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত। ধ্যান ভঙ্গের পর পার্বতীকে দেখিয়া বিস্মিত শিবের জিজ্ঞাসার উত্তরে পার্বতী এই উক্তি করিয়াছেন।

কৈলাস পর্বতে শিব ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কন্দর্পদেবের সাহায্যে পার্বতী শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। দুর্গম শৃঙ্গে পার্বতীকে একাকিনী দেখিয়া শিব অতিশয়

বিস্মিত হইলেন। তখন পার্বতী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে পতিব্রতা নারী কখনই সখীর সহিত স্বামীর নিকট আসেন না। স্বামী সান্নিধ্য পতিব্রতা নারীর নিকট অত্যন্ত পবিত্র। সখী লইয়া আসিলে পতি সান্নিধ্যের পবিত্রতা ও মাধুর্য সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। তাই তিনি কোন সখী না লইয়াই এই দুর্গম স্থানে আসিয়াছেন। চক্রবাক দম্পতি রাত্রিকালে পৃথক থাকিয়া বিরহে রাত কাটায়। প্রভাতে চক্রবাকী একাকিনী তাঁহার প্রিয়জনের কাছে যায়। সেইরূপ পার্বতীও স্বামী সান্নিধ্যের জন্যই তাঁহার নিকট একাকিনী আসিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

(১২) শুকাইল অশ্রুবিন্দু যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয় শিখরে।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। কন্দর্পদেবের আগমনে রতিদেবীর চিত্তে যে প্রশান্তি আসিয়াছে, তাহাই এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।

যোগাসন পর্বতে ধ্যানমগ্ন শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে পার্বতী মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। কন্দর্পদেব নিকটে দাঁড়াইয়া পুষ্পধনু হইতে মদন বান নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত। তাঁহার পত্নী রতিদেবী হস্তীদন্ত নির্মিত প্রাসাদে একাকিনী দণ্ডায়মান। পতির বিরহে তিনি কাতর। তাঁহার হৃদয় আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ। একবার শিবের ধ্যান ভাঙাইতে যাইয়া তাঁহার যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখ অশ্রুপূর্ণ। এই সময় কন্দর্পদেব সেখানে আসিয়া তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। পতির সান্নিধ্যে রতির বিরহ-বেদনা দূর হইল, তাহার চোখের জলধারা শুকাইয়া গেল। সূর্যের উদয়ে পদ্মদলের উপরস্থিত শিশিরবিন্দু যেমন শুকাইয়া যায়, কন্দর্পদেবের আবির্ভাবে রতিদেবীর চোখের অশ্রু সেইরূপে শুকাইয়া গেল।

(১৩) দেবপ্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র পালন,
ইন্দ্রিয় দমন, ধর্মপথে সদা গতি;
নিত্য সত্য সেবীসেবায় চন্দন কুসুম
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র, আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ।

আলোচ্য অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। চিত্ররথ রামচন্দ্রের প্রতি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে বিবৃত হইয়াছে।

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ লক্ষ্মণের জন্য দৈবদত্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়াছেন রামচন্দ্রের নিকট। দেবতাদের অনুগ্রহে রামচন্দ্র অভিভূত। কিভাবে তিনি দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না। তখন চিত্ররথ বলিয়াছেন যে দরিদ্রের রক্ষণ, ইন্দ্রিয় দমন, ধর্মপথে জীবন যাপন—এইগুলি দেবতাদের কাম্য। দেবতার পূজায় সাধারণত চন্দন, পুষ্প, বস্ত্র, ভোজ্যাদি ও

নৈবেদ্য উপহার দেওয়া হয়। কিন্তু দেবতা কখনও এগুলির প্রতি গুরুত্ব দেন না। তিনি উপাসকের চিত্তশুদ্ধি ও পুণ্যের উপর গুরুত্ব দান করেন। যদি কেহ কায়মনোবাক্যে সৎ জীবন যাপন করেন, তবে সেই সৎ জীবনই হইল দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

আদর্শ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গের বিষয়বস্তু বিবৃত করিয়া এই সর্গটির সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর। লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র বীরবাহু অমিত শক্তিশালী। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বীরবাহু নিহত হইবার পর রাবণ শোকস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। পাত্রমিত্রগণের সহিত তিনি রাজসভায় বসিয়া আছেন। এমন সময় ভগ্নদূত মকরাক্ষ সেখানে প্রবেশ করিয়া রাবণের নিকট বীরবাহুর নিধনবার্তা নিবেদন করিল। বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে রাবণ বিস্মিত ক্ষুব্ধ। বীরবাহুর নিধনবার্তা যেন রাত্রিকালীন স্বপ্নের মতো অলীক। বীরবাহু মহাবীর। রামচন্দ্রের হাতে তাঁহার মৃত্যু অভাবনীয়। রাবণ শোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী সারণ তাঁহাকে ধৈর্য ধারণ করিতে বলিলেন।

রাবণ তখন নিহত পুত্রকে দেখিবার জন্ত প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য রাক্ষসসৈন্তের মৃতদেহের মধ্যে পুত্র বীরবাহুকে শায়িত দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব এক ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন যে, বীরবাহু দেশরক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছেন। ইহাতে গৌরব আছে। কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রের অকাল মৃত্যুর জন্ত তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল।

ইহার পর তিনি আবার রাজসভায় আসিয়া বসিলেন। বীরবাহু জননী চিত্রাঙ্গদা বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে সেখানে প্রবেশ করিলেন। পুত্রহারা তিনি যেন শোকের মূর্ত প্রতীক। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় যেন শোকের ঝড় বহিয়া গেল। তিনি রাবণকে বলিলেন যে পুত্রকে তিনি তাঁহার নিকট রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দোষেই সে অকালে নিহত। রাবণ তাঁহাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন যে বীরবাহু দেশের জন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার মতো বীরমাতার পক্ষে শোক করা শোভা পায় না। চিত্রাঙ্গদা বলিলেন যে, রাবণের পাপের জন্তই বীরবাহুর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন বলিয়াই লঙ্কাপুরীর আজ এই বিপর্যয়। ইহা বলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে রাজসভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

রাবণ ক্রোধভরে স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার সংকল্প ঘোষণা করিলেন। তাঁহার নির্দেশে রাক্ষস সেনাবাহিনী যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইল। চারিদিকে রণবাদ্যের ঝংকার। সেনাবাহিনীর পায়ের চাপে লঙ্কাপুরী টলমল করিতে লাগিল।

সাগরতলে প্রাসাদে বসিয়াছিলেন সাগরপত্নী বারুণী। তিনি তাঁহার মুরলাকে পাঠাইলেন সখী কমলার কাছে যুদ্ধের বিবরণ জানিবার জন্ত।

মুরলা লঙ্কাপুরীতে আসিলেন কমলার কাছে। কমলা তাঁহাকে রাবণের সেনাবাহিনীর যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব দেখাইলেন। মুরলা মেঘনাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কমলা জানাইলেন যে মেঘনাদ লঙ্কাপুরীর বাহিরে প্রমোদ উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এখনও বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ জানেন না। কমলা ধাত্রীর ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট যাইয়া বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন।

ইহার পর কমলা প্রভাষা ধাত্রীর ছদ্মবেশে মেঘনাদের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জানাইলেন। মেঘনাদ ক্রোধে তাঁহার শরীরের পুষ্পসজ্জা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বীরবাহুর মৃত্যুতে লঙ্কাপুরীর ঘোর বিপদ আর এদিকে তিনি প্রমোদ উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছেন। প্রমীলাকে তিনি বলিলেন যে, শত্রু সৈন্য বধ করিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন।

লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া তিনি রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাবণ তাঁহাকে ইষ্টদেবের পূজা করিয়া পরদিন প্রভাতে যুদ্ধে যাইবার নির্দেশ দিলেন। ইহার পর শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহাকে সেনাপতি পদে অভিষেক করা হইল।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গ নানাদিক দিয়া অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই সর্গে একদিকে যেমন কবিমানসের রূপরেখা প্রকাশিত হইয়াছে, তেমনি কাব্যসম্পর্কেও মোটামুটি একটি আভাস পাওয়া যায়। কবি কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট বিনম্র চিত্তে আশীর্বাণী প্রার্থনা করিয়াছেন, আর সেইসঙ্গে বীররসাত্মক কাব্য রচনার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। কাব্য রচনায় তাঁহার মানসকল্পনার পরিচয় এই সংকল্পবাণীর মধ্য দিয়া প্রকাশিত।

প্রথম সর্গেই কাব্যের প্রধান চরিত্র রাবণ ও মেঘনাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাবণ যে শুধুমাত্র রাক্ষসকুলের অধীশ্বর তাহা নহে, তিনি মানব মহিমায়ও ভাস্বর, তাহাও এই সর্গে পরিস্ফুট। বীরবাহুর মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয় শোকাচ্ছন্ন, আবার বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে বলিয়া গর্বিতও। মেঘনাদের মানবমহিমাও এই সর্গে উজ্জ্বল করিয়া দেখানো হইয়াছে। তিনি প্রেমময়ী স্বামী, কিন্তু যখনই কর্তব্যের আহ্বান আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পসজ্জা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের মূল বিষয়বস্তু মেঘনাদের শোচনীয় মৃত্যু এবং তজ্জনিত রাবণের মানস প্রতিক্রিয়া। প্রথম সর্গে মেঘনাদের সেনাপতি পদে অভিষেক ক্রিয়ার মাধ্যমে মেঘনাদ চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করা হইয়াছে।

রাবণ এই কাব্যের প্রধান চরিত্র। তাঁহার ঐশ্বর্যমহিমা, পুরুষকার এবং স্বদেশবোধের যথার্থ পরিস্ফুটন মধুসূদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্যে এই সর্গে রাবণের রাজসভার বর্ণাঢ্য বিলাসবহুল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই বর্ণনার মাধ্যমে রাবণের ঐশ্বর্য পরাক্রম ও মহিমা সম্পর্কে পাঠকহৃদয়ে একটি ধারণা জন্মিয়া যায়।

চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি মধুসূদনের অন্যতম সৃষ্টি। এই চরিত্রের মাধ্যমে কবি ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের নারী জাগরণের একটি রূপরেখার আভাস দিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা বীরবাহু জননী। পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত চিত্তে তিনি রাজসভায় আসিয়া রাবণের নিকট পুত্রের মৃত্যু সম্পর্কে অনুযোগ করিয়াছেন। রাবণ যখন বীরবাহুর মৃত্যুর জন্য তাঁহাকে বীরমাতা হিসাবে গর্বিত হইতে বলিয়াছেন, তখন চিত্রাঙ্গদা বলিয়াছেন যে নিজ কৃতকর্মের জন্য নিজেও মরিতে বসিয়াছেন, আর সমস্ত লঙ্কাপুরীর বিপর্যয়ও ডাকিয়া আনিয়াছেন।

ইহা ছাড়া প্রথম সর্গেই নানা ভাবে রাবণ ও লঙ্কাপুরীর আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। অগাধ ঐশ্বর্য, অপর্যাপ্ত শক্তি ও অনন্ত মহিমা সত্ত্বেও রাবণ যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা আলোচ্য সর্গে পরিস্ফুট। বিধির অলঙ্ঘ্য বিধানের কথাও নানাভাবে এই সর্গে বলা হইয়াছে। সুতরাং চরিত্র ও ঘটনার যথাযথ উপস্থাপনা, বর্ণনা ও ভাবব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রথম সর্গ সার্থক একথা বলা যায়।

প্রশ্ন ২। মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের বিষয় বস্তু বিবৃত করিয়া কাব্যমধ্যে এই সর্গটি সন্নিবেশিত করার সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর। বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদকে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেনাপতি পদে অভিষেক করা হইল। দেবতাবৃন্দের মধ্যে ঘোরতর আতঙ্কের সৃষ্টি হল।

লঙ্কার রাজলক্ষ্মী কমলা দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া মেঘনাদের সেনাপতি পদে অভিষেকের কথা জানাইলেন। মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবের পূজায় মগ্ন। পূজাশেষে যুদ্ধযাত্রা করিলে রামচন্দ্রকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। ইন্দ্র বলিলেন যে, এই ঘোর বিপদে একমাত্র মহাদেবই রক্ষা করিতে পারেন। অতএব তাঁহার নিকট যাওয়াই কর্তব্য।

ইন্দ্র পত্নী শচীদেবী সহ কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন। পার্বতী স্বর্ণাসনে বসিয়া ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পার্বতী বলিলেন যে তাঁহার স্বামী রাবণকে স্নেহ করেন। সুতরাং তিনি কিরূপে তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করিতে পারেন। রাবণ মহাদেবের আশ্রিত। মহাদেব ছাড়া কেহই তাঁহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। মহাদেব এখন যোগাসন পর্বতশৃঙ্গে ধ্যানমগ্ন। তাঁহার নিকট যাওয়া দুঃসাধ্য কাজ।

ইন্দ্র তাঁহাকেই অনুরোধ করিলেন যোগাসন পর্বতে মহাদেবের নিকট যাইবার জন্য। পার্বতীর দ্বিধা ছিল। কিন্তু এই সময় রামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে তাঁহার অকাল বোধন করিলেন। দেবী সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং মহাদেবের নিকট যাইতে মনস্থ করিলেন।

কন্দর্পপত্নী রতিদেবী পার্বতীকে মোহিনীবেশে সাজাইয়া দিলেন। কন্দর্পদেব মহাদেবের নিকট যাইতে ভয় পান। কেন না ইতিপূর্বে একবার তাঁহার ধ্যান ভাঙাইতে গিয়া তাঁহাকে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। পার্বতী তাঁহাকে অভয় দিলেন। তারপর কন্দর্পদেবকে সঙ্গে লইয়া যোগাসন পর্বতে মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মহাদেব ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কন্দর্পদেব তাঁহার প্রতি পুষ্পশর নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি পার্বতীকে লইয়া প্রেমলীলায় মাতিয়া উঠিলেন। তারপর তাঁহাকে বলিলেন যে নিজ কর্মদোষে রাবণের মৃত্যু অনিবার্য। কন্দর্পদেব মায়াদেবীর কাছে গেলে মেঘনাদ বধের অস্ত্র লাভ করিবেন।

কন্দর্পদেব ইন্দ্রের নিকট যাইয়া সকল কথা বলিলে ইন্দ্র স্বয়ং মায়াদেবীর নিকট গমন করিলেন। মায়াদেবী তাঁহাকে মেঘনাদ বধের অস্ত্রদান করিলেন। ইন্দ্র সেই অস্ত্র লইয়া গন্ধর্বরাজ চিত্ররথকে দিলেন তাহা রামচন্দ্রকে দিয়া আসিবার জন্য। চিত্ররথ সেই অস্ত্র লইয়া রামচন্দ্রকে দিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় সর্গের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলে ইহার গুরুত্ব ও সার্থকতা অনুধাবন করা যায়। মেঘনাদের অমিত শক্তি বলবীর্য পরাক্রমের ইঙ্গিত দেওয়া এই সর্গ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। মেঘনাদ কবির 'favourite Indrajit'। মেঘনাদ সাধারণ বীর নহেন, তিনি স্বর্গ মর্ত্য বিজয়ী। সুতরাং এই অসাধারণ বীরকে হত্যার আয়োজনও অসাধারণ করা হইয়াছে। মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে দেবতা ও মানবের সম্মিলিত শক্তি—স্বর্গলোক জুড়িয়া চলিয়াছে দেবতাদের বিরাট ষড়যন্ত্র। মানুষের পক্ষে মেঘনাদকে বধ করা সম্ভব নহে। একমাত্র দৈবানুগ্রহেই তাঁহাকে বধ করা সম্ভব। তাই তাঁহার বধের জন্য কমলা, ইন্দ্র, শচীদেবী, পার্বতী, কন্দর্পদেব, চিত্ররথ ও মহাদেবের মহাসম্মিলন পরিকল্পিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত এই সর্গের মাধ্যমে কবি নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান ও মানুষের অসহায়তার বিষয়ও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। মানুষের সমগ্র জীবনের উপর দৈব বা বিধির প্রভাব অলঙ্ঘনীয়। মানুষ দৈবের হাতের অসহায় ক্রীড়নক ছাড়া কিছুই নয়। কবি যেন ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন, যে মেঘনাদ নিষ্পাপ। রাবণের পাপকার্যের জন্য তিনি দায়ী নহেন। তিনি নিজে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করেন নাই। রামচন্দ্রও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ পোষণ করেন না। তথাপি মেঘনাদ রাবণের প্রধান শক্তি। এই শক্তি চলিয়া গেলেই রাবণ শক্তিহীন হইয়া পড়িবেন। তাই তাঁহাকে শক্তিহীন করিবার জন্যই মেঘনাদের মৃত্যু অপরিহার্য। তাই মহাদেবের ভক্ত হওয়া সত্বেও তিনি মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। স্বয়ং মহাদেব তাঁহার জন্য মৃত্যুদণ্ড দান করায় নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানের মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া জল স্থল অন্তরীক্ষের মধ্যে ঘটনাস্থল প্রসারিত করায় ইহার মধ্যে মহাকাব্যিক বিশালতা সৃষ্টি হইয়াছে। মহাকবি হোমারের কাব্যাদর্শে তিনি রামচন্দ্রের সাহায্যার্থে মেঘনাদ বধের প্রয়োজনে বিভিন্ন দেবদেবীর সম্মিলন ঘটাইয়াছেন।

এই সর্গেই প্রথম রাবণের প্রধান প্রতিপক্ষ রামচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আভাস দেওয়া হইয়াছে। চিত্ররথ গন্ধর্বের নিকট অস্ত্র লাভ করিয়া রামচন্দ্র দৈবানুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। রাবণের উজ্জ্বল পুরুষকারের পাশে তাঁহার আত্মহীন রূপ সহজেই চোখে পড়ে। সাক্ষাৎ [illegible]

কাব্যিক বিশালতা ও পরিকল্পনার জন্ম দ্বিতীয় সর্গের গুরুত্ব ও সার্থকতা অনুধাবন করা যায়।

প্রশ্ন ৩। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাজসভায় রাবণের ব্যক্তিত্ব কিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা লিখ।

উত্তর। লঙ্কেশ্বর রাবণ মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রধান চরিত্র। রাবণপুত্র মেঘনাদের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ও তজ্জনিত রাবণ মানসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যদিও আলোচ্য কাব্যের মূল উপজীব্য, তথাপি রাবণই এই কাব্যের আত্যন্ত প্রাধান্ত বিস্তার করিয়া আছেন। রাবণ মধুসূদনের কবি প্রতিভার অসামান্ত সৃষ্টিকর্ম। বাল্মীকি রামায়ণের রাবণ চরিত্র হইতে মধুসূদন মূল উপাদান গ্রহণ করিলেও তাঁহাকে সাজাইয়াছেন আপন মানস কল্পনার বর্ণাঢ্য বৈভবে। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ দুর্ধর্ষ মহাপরাক্রমশালী দুরাচারী রাক্ষসরাজ। কিন্তু মধুসূদনের রাবণ মনুষ্যত্বের মহিমায় উজ্জ্বল এক গৌরবদীপ্ত চরিত্র। তাই বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

The idea of Ravan elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow.

মধুসূদনের রাবণ উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের মূর্ত প্রতীক। তিনি বলিষ্ঠ মানবতাবাদ ও পুরুষকারের উজ্জ্বল বিগ্রহ। কবি একদিকে য়ুরোপীয় আদর্শ অন্তদিকে রেনেসাঁসের আদর্শের সংমিশ্রণে এই চরিত্রটির পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় "রাবণের চরিত্র সৃষ্টিতে একত্র দুইটি ভিন্ন উপাদানের সদ্ভাব ঘটিয়াছে। একদিকে য়ুরোপীয় পুরুষকারের আদর্শ—প্রকৃতির সহিত সংগ্রামশীলতা, সর্ববিধ নিয়তির উপর ভ্রূক্ষেপহীন আত্মপ্রতিষ্ঠা; অপরদিকে মানবতার আর এক আকুতি কবিকে তেমনই মুগ্ধ করিয়াছে।"

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণ নানাবিধ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। লঙ্কাপুরীর আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণাঢ্য রাজসভায় রাজকীয় মহিমায় রাবণ স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন—

> কনক আসনে বসে দশানন বলী—
> হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
> তেজঃপুঞ্জ।

রাজসভায় অতুল বৈভবের মধ্যে লঙ্কেশ্বর রাবণ রাজকীয় গাম্ভীর্যে ও মহিমায় পরিপূর্ণ। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে তাঁহার হৃদয় শোকাচ্ছন্ন। তিনি রাজাধিরাজ। উচ্চস্বরে বিলাপ তাঁহার পক্ষে অশোভন। অন্তর্হৃদয়ের ক্রন্দন তাঁহার চোখে অশ্রুধারা আনিয়া দিয়াছে—

> এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
> বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে
> অবিরল অশ্রুধারা

প্রথম সর্গে রাবণের মধ্যে একদিকে রাজকীয় মহিমা ও পুত্রস্নেহাতুর-হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়াছে। তিনি একাধারে সম্রাট, ও অন্তধারে স্নেহময়

পিতা। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ তাঁহার নিকট অভাবনীয়। তিনি স্বয়ং মহাবীর। তাই বীরবাহুর মতো মহাবীর রামচন্দ্রের হাতে নিহত, ইহা যেন তাঁহার নিকট নিশার স্বপ্নের মতো অলীক—

নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকাচ্ছন্ন, আবার রাজা হিসাবে তিনি গর্বিতও। বীরবাহুর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ দেশ ও জাতিকে গৌরবদান করিয়াছে। তাই তিনি ভগ্নদূতকে 'সাবাস' দিয়াছেন।

রাবণ লঙ্কার একচ্ছত্র সম্রাট। অতুল তাঁহার ঐশ্বর্য, অনন্ত তাঁহার পরাক্রম। স্বর্গ মর্ত্য তাঁহার ভয়ে কম্পমান। কিন্তু ইহাই তাঁহার সামগ্রিক পরিচয় নহে। তিনি লঙ্কাপুরীর আনন্দময় রাজপরিবারের স্নেহময় দায়িত্বশীল কর্তা। তাই লঙ্কাপুরীর ক্রমিক বিপর্যয়ে তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িতেছে। তিনি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে কি পাপে তাঁহার বা লঙ্কাপুরীর এই বিপর্যয়। তিনি শিশুর মতো সরল। আদিম শক্তিমান পুরুষের মধ্যে যেমন কোন পাপবোধ ছিল না, তাঁহার মধ্যে তেমনি কোন পাপবোধ নাই। তাই তিনি বিলাপ করিয়া বলেন—

কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই?

তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে লঙ্কাপুরীর বিপর্যয় আসন্ন। বনের মধ্যে কাঠুরিয়া যেমন আগে বিশাল বৃক্ষের শাখাগুলি ছেদন করিয়া পরে মূল বৃক্ষকে ছেদন করে, রামচন্দ্রও তেমনি তাঁহার পুত্র পরিজনকে বিনাশ করিয়া সর্বশেষে তাঁহাকে বিনাশ করিবেন। কিন্তু রাবণ অসামান্য মানসিক শক্তির অধিকারী। তাই শীঘ্রই এই বিচলিত ভাব কাটাইয়া সমস্ত বাধাবিঘ্নকে প্রতিহত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার সহিত কথোপকথনের মাধ্যমেও রাবণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। চিত্রাঙ্গদা রাবণমহিষী—কিন্তু প্রধানা মহিষী নহেন। বীরবাহু তাঁহার একমাত্র পুত্র। সেই একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে আত্মহারা হইয়া তিনি রাজসভায় প্রবেশ করিয়া রাবণের নিকট পুত্রের মৃত্যুর জন্য অনুযোগ করিয়াছেন। রাবণ তাঁহার অনুযোগের উত্তরে বলিয়াছেন—

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে।
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি।

ইহাতে বোঝা যায় রাবণের সহনশীলতা কত অপরিসীম। তিনি একটি বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর। একটি বৃহৎ পরিবারের তিনি কর্তা। একদিকে যেমন

প্রজার রক্ষার দায়িত্ব অন্যদিকে পরিবারের সকলের রক্ষার দায়িত্বও তাঁহার। কিন্তু এ দায়িত্ব তিনি পালন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার চোখের সম্মুখে একে একে আত্মীয় পরিজন নিহত হইতেছে। শোকে দুঃখে গ্লানিতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়, তবু তিনি বিচলিত হন না। ইহার মাধ্যমে রাবণের বলিষ্ঠ পৌরুষ ও হৃদয়বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্রাঙ্গদার প্রতি তাঁহার বক্তব্য: বীরবাহু দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু বীরের মৃত্যু—গৌরবের মৃত্যু। ইহার জন্য বীরমাতা হিসাবে চিত্রাঙ্গদার গর্ব করা উচিত। বীরবাহুর মৃত্যু দেশ ও জাতিকে যেমন গৌরব দান করিয়াছে। সেই সঙ্গে রাক্ষস রাজবংশকে উজ্জ্বল করিয়াছে। এই উক্তির মাধ্যমে রাবণের অসাধারণ দেশপ্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। তীব্র পুত্রশোক তিনি হৃদয়ে নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করিয়াছেন।

রাবণ প্রবল পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। প্রচণ্ড আঘাত ও বেদনার মধ্যে তিনি অবিচলিত। তাঁহার এই আত্মিক শক্তি তাঁহাকে অসাধারণ গৌরব দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য, ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে, ইহার রথ রথী অশ্বে গজে পৃথিবী কম্পমান ;···যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতে হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্মবিরোধী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্র তীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।"

প্রশ্ন ৪। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে মেঘনাদ চরিত্রের যে পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আলোচনা কর।

উত্তর। মেঘনাদ চরিত্রটি কবি মধুসূদনের এক সুন্দর সৃষ্টি। বাল্মীকি রামায়ণের এই দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ তাঁহার সৃজন কল্পনাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাই তিনি মেঘনাদ প্রসঙ্গে বন্ধুর কাছে লেখা পত্রে বারবারই 'favourite Indrajit' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুত বীর মেঘনাদের অসহায় শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুর ঘটনা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই কবি আলোচ্য কাব্য রচনা করিয়াছেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে মেঘনাদ চরিত্রের প্রেমময়তা ও কর্তব্য-সচেতনতার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যুর পর লঙ্কাপুরীর সকলে শোকাচ্ছন্ন। রাবণ ক্রোধদীপ্ত হৃদয়ে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মেঘনাদ কিন্তু এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি লঙ্কাপুরীর বাহিরে প্রমোদ উদ্যানে পত্নী প্রমীলার সান্নিধ্যে বিশ্রামরত। কমলা যখন ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, তখন তিনি বিস্ময়ে নির্বাক। কারণ ইহার আগের দিন তিনি স্বহস্তে রামচন্দ্রকে হত্যা করিয়াছেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে তিনি ক্রোধে ক্ষোভে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা নিহত, দেশ ও জাতি গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত। এই অবস্থায়

তাঁহার পক্ষে বিশ্রামসুখ অশোভন। তাই তিনি ক্রোধভরে তাঁহার পুষ্পসজ্জা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন—

> ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
> মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক বলয়
> দূরে।......

নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—

> 'ধিক মোরে' কহিলা গম্ভীরে
> কুমার, হা ধিক মোরে। বৈরিদল বেড়ে
> স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে।

মেঘনাদ মহাবীর। তিনি শত্রুকে প্রতিহত করিতে জানেন। নিজের বীরত্ব ও পরাক্রম সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

> আমি ইন্দ্রজিৎ, আন রথ ত্বরা করি
> ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুকুলে।

মেঘনাদ দেশপ্রেমিক বীর। দেশ ও জাতি তাঁহার কাছে সবচেয়ে বড়। ইহার কাছে ব্যক্তিজীবনও তুচ্ছ। প্রমীলাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসেন। কিন্তু দেশের প্রতি কর্তব্যের কাছে সে ভালোবাসাও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ইহার পূর্বদিন তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন রামচন্দ্রের সহিত। তথাপি বীরবাহুর মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। প্রমীলা আসিয়া কাতর বাক্যে বলিয়াছেন—

> কোথা প্রাণসখে,
> রাখি এ দাসীরে, কহ চলিলা আপনি
> কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
> এ অভাগী।

প্রমীলার একথা মেঘনাদকে বিচলিত করিতে পারে নাই, কিংবা তাঁহার কর্তব্য ভুলাইতে পারে নাই। তিনি প্রমীলাকে বলিয়াছেন—

> ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি—
> বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে—
> সে বাঁধে। ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
> কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
> রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি!

প্রমীলাকে তিনি গভীর মর্যাদা দিয়াছেন। আবার সেইসঙ্গে দেশের আহ্বানে সাড়া দিয়া গভীর কর্তব্যবোধেরও পরিচয় দিয়াছেন।

লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইয়া মেঘনাদ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রার জন্যে পিতা রাবণের নিকট অনুমতি চাহিয়াছেন। রামচন্দ্র একবার মরিয়া পুনরায় কিরূপে বাঁচিতে পারেন, তাহা তাহার বুদ্ধির অগম্য। তবে তিনি এবার তাঁহাকে

ভয় করেন না। আপন শক্তি-সামর্থ্য-পরাক্রমে তাঁহার গভীর আস্থা। তাই তিনি অনায়াসে বলেন—

নমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে;

মেঘনাদ শক্তিমান, তাঁহার এই শক্তির উৎস তাঁহার শ্রদ্ধা। রাবণকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করেন। তাই রাবণ যখন স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার কথা বলিয়াছেন। তখন তিনি বলিয়াছেন যে তিনি জীবিত থাকিতে রাবণের যুদ্ধযাত্রা শোভা পায় না। রাবণ মহাবীর—

থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।

সুতরাং মেঘনাদ যুদ্ধে যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর। রামচন্দ্রের পরাজয় ও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন দ্বিধা নাই, সন্দেহ নাই। তিনি দুর্বার, নির্ভীক। মৃত্যুভয় তাঁহার নিকট তুচ্ছ। রামচন্দ্রকে তিনি ইতিপূর্বে দুইবার হত্যা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার তৃতীয় মৃত্যু সম্পর্কে তিনি সন্দেহহীন। ইহার পর রাবণ তাঁহাকে সেনাপতি পদে অভিষেক করিয়াছেন।

মেঘনাদ মধুসূদনের মানস সন্তান; তাঁহার মানস কল্পনার আদর্শ রূপ। তাই মেঘনাদকে তিনি অসামান্য বীর এবং অসাধারণ হৃদয়বোধ সম্পন্ন পুরুষ হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এই চরিত্রটির মধ্যে কোন মলিনতা নাই। কোন আবিলতা নাই। প্রখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় "এ চরিত্র নিদাঘ দিবার মতো দীপ্ত ও নির্মল, কোনখানে মেঘ বা কুয়াশার লেশমাত্র নাই। ইহার অন্তঃকরণে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব প্রশ্ন সংশয় নাই। নৈরাশ্য নাই; প্রেম ভক্তি বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রস্ফুট কুসুমে কোথাও চিন্তাকীট প্রবেশ করে নাই। আর্য রামায়ণের মেঘনাদের সেই দৃপ্ত পশুবল মধুসূদনের মেঘনাদে অভয় মান মহৎ গুণের সমবায়ে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে—মায়ের দুলাল, পিতার নয়নমণি, পত্নীর কণ্ঠহার, শত্রুর দুঃস্বপ্ন এই মেঘনাদে মলিন অগ্নি মরুতের সন্নিপাতে মেদুর মেঘকান্তির মতো নয়নমনোহর হইয়াছে।"

প্রশ্ন ৫। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার কথোপকথনের মাধ্যমে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের যে পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আলোচনা কর। এই চরিত্রের অবতারণার সার্থকতা কি লিখ।

উত্তর। মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রাঙ্গদা চরিত্র স্বল্পকালীন অবস্থানের মধ্যেও পাঠকচিত্তে গভীর রেখাপাত করে। এই চরিত্রটি মধুসূদনের মৌলিক সৃজনক্ষমতার স্বাক্ষর। বাল্মীকি রামায়ণে চিত্রাঙ্গদা বলিয়া রাবণের কোন মহিষীর উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে শুধুমাত্র তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদন কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে চিত্রাঙ্গদা নামটি গ্রহণ করিয়া আপন কবিকল্পনায় তাঁহাকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

রাবণের অসংখ্য মহিষীর মধ্যে চিত্রাঙ্গদা একজন। রাবণের নিকট তাঁহার স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা বা গুরুত্ব নাই। তিনি একমাত্র পুত্র বীরবাহুকে লইয়া নিভৃতে বাস করিতেন। বীরবাহু তাঁহার নয়নমণি। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার উপেক্ষিত নারীহৃদয় সান্ত্বনা লাভ করিত। সেই নয়নমণি বীরবাহুর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনের অবলম্বন যেন হারাইয়া গিয়াছে। তিনি শোকার্ত হৃদয়ে রাবণের রাজসভায় প্রবেশ করিয়া বলিয়াছেন—

একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষকুল মণি··
কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?

রাবণ তাঁকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিয়াছেন যে, বীরবাহু দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছে। তাঁহার এ মৃত্যু গৌরবের মৃত্যু। চিত্রাঙ্গদা বীরমাতা। তাঁহার পক্ষে ক্রন্দন শোভা পায় না—

বীরকর্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে।

চিত্রাঙ্গদা কিন্তু রাবণের এই কথা স্বীকার করেন না। দেশের জন্য যে পুত্র যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেয়, তাঁহার জন্ম শুভক্ষণে। তাঁহার মাতা ভাগ্যবতী। কিন্তু এক্ষেত্রে রাবণের এ যুক্তি অচল। রামচন্দ্র লঙ্কাপুরী অধিকারের উদ্দেশ্যে এখানে আসেন নাই। রাবণ যেহেতু তাঁহার পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। তাই তাঁহাকে উদ্ধারের জন্য লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়াছেন। লঙ্কপুরীর ঐশ্বর্যের লোভে তিনি এত কষ্ট করিয়া এতদূরে আসেন নাই—

কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে
কোন লোভে, কহ, রাজা এসেছে এ দেশে
রাঘব?

চিত্রাঙ্গদার দৃষ্টিতে রামচন্দ্র নির্দোষ। পত্নীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি সঙ্গত কার্যই করিতেছেন। লঙ্কাপুরীর প্রতি যেহেতু তাঁহার কোন লোভ নাই। তাই তাঁহাকে দেশের শত্রুও বলা যায় না—

তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি?

পুত্রকে হারাইয়া চিত্রাঙ্গদা যেন প্রকৃত সত্য দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে রাবণের কৃতকর্মের জন্যই লঙ্কাপুরীর এই বিপর্যয়। তাঁহার পাপের জন্যই তাঁহার একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যু হইয়াছে। রাবণ রামচন্দ্রকে অন্যায়কারী অপরাধী বলিয়াছেন। কিন্তু রাবণই প্রকৃত অন্যায়কারী। রামচন্দ্র শান্তিপ্রিয় স্বভাবসম্পন্ন। কিন্তু রাবণের নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাকে দুর্ধর্ষ

করিয়া ভুলিয়াছে। সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্ত তিনি জীবনপণ করিয়া মৃত্যুসংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন—

কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।

রাবণের আঘাতে জর্জরিত রামচন্দ্র এখন রাবণকে মৃত্যু-আঘাত হানিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই।

চিত্রাঙ্গদা স্নেহময়ী জননী। পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকাহত। কিন্তু এই শোকের মধ্যেও তিনি স্বামী রাবণকে তাঁহার কৃতকর্ম সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিতে দ্বিধা করেন নাই। সমস্ত লঙ্কাপুরীতে একমাত্র চিত্রাঙ্গদা ছাড়া অন্ত কেহই রাবণকে তাঁহার কৃতকর্ম সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নাই। রাবণ যে অন্তায়কারী, এ বোধ যেমন তাঁহার নিজের নাই, তেমনি লঙ্কাপুরীর কাহারও নাই। মন্দোদরী, মেঘনাদ, প্রমীলা এবং অন্তান্ত সকলেই রবাণ সম্পর্কে অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। শুধুমাত্র চিত্রাঙ্গদার মুখ দিয়াই ভিন্ন সুর ধ্বনিত হইয়াছে। রাবণের কৃতকর্মই যে লঙ্কাপুরীর ভয়ংকর বিপর্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে, তাঁহার সীতাহরণজনিত পাপের জন্তই যে আত্মীয়-পরিজন নিহত তাহা তিনি প্রকাশ্যে বলিতে দ্বিধা করেন নাই—

কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—"বিধাতার ন্যায়দণ্ডকে বুক পাতিয়া লইবার মতো ধীরতা, কিংবা তাঁহার আঘাতে পাপীর যে যন্ত্রণা তাহাও নিজের বক্ষে অনুভব করিবার মতো প্রেম—কোনটাই তাহার নাই। তাই শোকে মুহ্যমান বিবশা রাবণবধূর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলে যেন বিধাতার রোষানলকেই প্রদীপ্ত হইতে দেখি।...রাজগৃহ বন্দিনী রূপসী চিত্রাঙ্গদার দুঃখ ও অভিমান, স্বামীস্নেহ বঞ্চিতা পুত্রহারা রমণীর নৈরাশ্যপীড়িত তেজস্বিনী মূর্তি—তাঁহার সেই অশ্রুপ্লাবিত করুণ সুন্দর চক্ষে আহত নারী হৃদয়ের বহ্নিবিভাস আমাদের মানসপটে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।"

প্রশ্ন ৬। মেঘনাদ বধ কাব্যে রাবণের রাজসভার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিচয় দাও।

উত্তর। রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর। বলবীর্য শক্তি সামর্থ্য পরাক্রমে তিনি অসাধারণ। তাঁহার রাজসভা রাজকীয় দীপ্তি ও গৌরবে সমুজ্জ্বল। পৃথিবীতে এইরূপ রাজসভা আর দ্বিতীয় নাই।

এই রাজসভার মেঝে আগাগোড়া স্ফটিকে নির্মিত। ইহার মধ্যে নানারূপ উজ্জ্বল মহার্ঘ্য রত্ন শোভা পাইতেছে। মানস সরোবরের বুকে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলগুলি যেমন অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে, স্ফটিকের মেঝের উপর রত্নরাজির সমাহার তেমনি অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়া আছে।

রাজসভার ছাদ বিশাল। ইহা সম্পূর্ণভাবে স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত। এই স্বর্ণছাদ দাঁড়াইয়া আছে নানাবরণের স্তম্ভের উপর। সেই স্তম্ভগুলির রঙই বা কত রকম। শ্বেত রক্ত নীল পীত নানাবরণের রঙের স্তম্ভ যেন নাগরাজ বাসুকীর মতো স্বর্ণছাদকে আদরে ধরিয়া রাখিয়াছে।

রাজসভার চারদিকে অপূর্ব সুন্দর ঝালর বাতাসে দুলিতেছে। সেই সকল ঝালরে মুক্তা, পদ্মরাগ, মরকত, হীরা প্রভৃতি মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত। বাতাসে যখন সেই ঝালর আন্দোলিত হইতেছে, তখন আলোর মধ্যে মণিমুক্তার উজ্জ্বলতা চোখকে যেন ঝলসাইয়া দিতেছে। মনে হইতেছে যেন ঘনঘন বিদ্যুৎ ঝলকাইতেছে।

রাজসভার দুইপাশে সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট কিংকরী তাঁহার মৃণাল বাহু দুলাইয়া সুন্দর চামর লইয়া ব্যজন করিতেছে। রাজসভায় রাবণের মাথার উপর অপূর্ব সুন্দর মূর্তি ছত্রধর ছত্র ধারণ করিয়া আছে। তাঁহার আকৃতি এত মনোহর যে মনে হয় স্বয়ং কন্দর্পদেব যেন সেখানে ছত্রধর রূপে দণ্ডায়মান।

রাজসভার দ্বারে ভয়ংকর দর্শন দৌবারিক প্রহরারত। কাহারও সেখানে প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

রাজসভার মধ্যে চারদিকে পাত্রমিত্রের সমাবেশ। ইহার মধ্যে স্বর্ণসিংহাসন স্থাপিত। তাহার উপর বিশাল দেহ সম্রাট রাবণ উপবিষ্ট। মনে হইতেছে "হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ।"

রাজসভায় অনন্ত বসন্ত বায়ু মৃদুমন্দে প্রবাহিত। সেই বায়ু আবার সুগন্ধিযুক্ত। বসন্ত বায়ুর সঙ্গে কাকলী লহরী অপূর্ব মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। রাবণের রাজসভা এত সুন্দর যে ইহার কাছে ময়দানব নির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজসভাও ম্লান হইয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন ৭। প্রথম সর্গে কবি মধুসূদন কাহার নিকট কি প্রার্থনা করিয়াছেন? তাঁহার এই প্রার্থনার তাৎপর্য কি?

উত্তর। কবি মধুসূদন দত্ত মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রারম্ভে কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট কাব্য রচনায় সাফল্যের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

এই কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অমৃতভাষিনী। তিনি শ্বেতভূজা দেবী ভারতী। তাঁহার করুণায় কবি কাব্য রচনায় সফল হইয়া অমরত্ব লাভ করেন। দেবীর করুণা ছাড়া কাব্য রচনায় সফল হওয়া যায় না। প্রাচীনকালে দস্যু রত্নাকরকে তিনি করুণা করিয়াছিলেন। দস্যু রত্নাকর দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তারপর অকস্মাৎ এক শুভক্ষণে দেবীর করুণায় তিনি অপূর্ব কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া আশ্চর্য মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিলেন। দেবীর কৃপায় ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ বধের পর তাঁহার মুখ দিয়া সেই আশ্চর্য শ্লোক বাহির হইয়াছিল।

দেবী যখন দস্যু রত্নাকরের প্রতি করুণাধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন, তখন কবির আশা, দেবী তাঁহার প্রতিও দয়া করিবেন। তাই দেবীর দয়া প্রার্থনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি।

কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহিমাময়ী। তাঁহার মহিমায় অকবিও কবিশক্তি লাভ করিয়া অমর হয়, নরাধমও কবিশ্রেষ্ঠের মর্যাদা লাভ করেন। তাঁহার করুণায় অসম্ভব সম্ভব হয়—তাঁহার স্পর্শে—

সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে।

কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করুণা লাভ করিয়াই নরাধম দস্যু মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিয়াছেন। চোর রত্নাকর হইলেন কাব্য রত্নাকর। দস্যু রত্নাকর দেবীর প্রসাদে এমন অপূর্ব মহাকাব্য রচনা করিলেন যাহার মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে অসংখ্য মূল্যবান রত্নের মতো ঘটনা ও চরিত্ররাজি। এই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়াই কবি কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে এই বর প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন তিনি মেঘনাদ বধ কাব্য রচনায় সাফল্যলাভ করিতে পারেন। তাঁহার প্রতিভার দৈন্য সম্পর্কে তিনি সচেতন। বাল্মীকি বা অন্যান্য মহাকবির মতো তাঁহার প্রতিভা নাই। কিন্তু দুর্বল সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ যেমন বেশী থাকে, তেমনি অল্প প্রতিভাবান বলিয়াই দেবী তাঁহাকে দয়া করিবেন, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তাই কবি দেবীকে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন—

উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া। ১

কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট এই প্রার্থনার মাধ্যমে কাব্য রচনায় কবির নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। কবি যেন কাব্য রচনার পূর্বে ভক্তিবিনম্র চিত্তে দেবীর আশীর্বাদ চাহিয়াছেন। আপন কবিশক্তি নয়, দেবীর আশীর্বাদই তাঁহাকে জয়যুক্ত করিবে, ইহাই কবির ধারণা।

প্রশ্ন ৮। **তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী**
কল্পনা। কবির চিত্ত ফুলবন মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

মধুসূদনের কবিমানসের আলোকে এই পঙ্‌ক্তিগুলির তাৎপর্য বিচার কর।

উত্তর। মধুসূদন যুগন্ধর কবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের ফলে বাংলার জাতীয় জীবনে যে ভাববিপ্লব ঘটিয়াছিল, মধুকবি তাঁহার যথার্থ রূপকার। তাঁহার রচিত মেঘনাদ বধ কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মর্মবাণী বহন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মেঘনাদ বধ কাব্য কেবলমাত্র একখানি অতীত জীবন বা পুরাণাশ্রিত [illegible] মহাকাব্য নহে, ইহার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নূতন যুগচেতনা মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ জীবনের প্রতিনিধিমূলক কয়েকটি চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের মধ্যে কবি কল্পনাকে দেবী হিসাবে আখ্যাত করিয়া তাঁহাকে আহ্বান জানাইয়াছেন; ইহার বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে। ভারতীয় বা পাশ্চাত্ত্য দেবদেবীদের মধ্যে 'কল্পনা' নামে কোন দেবী নাই। কাব্য রচনায়

কল্পনাশক্তির বা উদ্ভাবনশক্তির প্রয়োজনের কথা স্বীকার করিয়া লইয়া কল্পনা নামে এক দেবীর বিষয় চিন্তা করা হইয়াছে। ইংরাজ কবি জন মিল্টন তাঁহার বিখ্যাত 'প্যারাডাইস লষ্ট' কাব্যে কল্পনা নামে দেবীকে আহ্বান জানাইয়াছেন। কবি মধুসূদন মিল্টনের আদর্শে সম্ভবত কল্পনাকে আহ্বান জানাইয়াছেন। মধুসূদন বিশ্বাস করিতেন যে সার্থক কাব্যসৃষ্টিতে কল্পনাশক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যসৃষ্টিতে শুধু বস্তু বা তথ্যই বড় কথা নহে। ইহার সহিত কল্পনার সার্থক সংমিশ্রণে যথার্থ কাব্যরস সৃষ্টি হইতে পারে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলেও ইহার যথার্থতা বুঝিতে পারা যায়। কবি বাল্মীকি হইতে মূল কাহিনী ও চরিত্রগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অসামান্য কল্পনাশক্তির বলে ইহাদিগকে নবরূপে নব সজ্জায় গঠন করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে তিনি বাল্মীকির অনেক ঘটনা বর্জন করিয়া নূতন ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মানসকল্পনায় 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইয়াছে যুগান্তকারী সৃষ্টি। আধুনিক বাংলা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয় মহাকাব্য।

মধুসূদন মেঘনাদ বধের মধ্যে মহাকাব্যিক আমেজ সৃষ্টি করিবার জন্য ইহার কাহিনীকে গাঢ়বদ্ধ রূপদান করিয়াছেন। অসাধারণ কল্পনাশক্তির সাহায্যে তিনি ইহার কাব্যবৃত্তটিকে মনোহর স্থাপত্যসুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। ইহার কাব্যবৃত্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে। এই বিশাল কাব্যবৃত্তকে যথার্থ কাব্য-রসোত্তীর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য, এবং মধুকবি এইজন্যই কল্পনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

কবি তাঁহার মানসলোককে ফুলের বন হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন। ফুলের বন যেমন বিবিধ ফুলের সমাবেশে মনোহর, কবির চিত্তলোকও তেমনি নব নব ভাবে নব নব রূপে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। মৌমাছি যেমন ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র রচনা করে, কবিও তেমনি চিত্তলোকের বিবিধ ভাবের নির্যাস হইতে কাব্যমধু সংগ্রহ করিয়া এমন একটি কাব্য রচনা করিতে অভিলাষী যাহা যুগ যুগ ধরিয়া বঙ্গবাসীকে অপূর্ব কাব্যরসামৃত পানের সুযোগ করিয়া দিবে।

প্রশ্ন ৯। মেঘনাদ বধ কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। মেঘনাদ বধ কাব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিদের ভাবাদর্শের সমন্বয়ে রচিত এক অপূর্ব মহাকাব্য। ইহার মধ্যে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস প্রভৃতির ভাবকল্পনা যেমন গৃহীত হইয়াছে, হোমার ভার্জিল প্রভৃতি কবি রচিত ভাবাদর্শও তেমনি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মধুসূদন স্বয়ং মেঘনাদ বধ কাব্যকে **'Three fourth Greek'** হিসাবে আখ্যাত করিয়াছেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের বিষয়বস্তু ও চরিত্র-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার মধ্যে গ্রীক কবি হোমারের ভাবাদর্শই সমধিক অনুসৃত হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "মেঘনাদ বধের অধিকাংশ চরিত্র হোমারের সৃষ্ট চরিত্রের অনুযায়ী।" মোহিতলাল মজুমদারও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, "বাঙালী কবি কৃত্তিবাস কাব্যের কাহিনী অংশে তাঁহার প্রধান ঋণদাতা, কিন্তু গ্রীক কবি হোমারই তাঁহার কবিচিত্তকমলের রবি। মিল্টনের উদাত্ত কঠোর মনোভাব

তাঁহাকে ততটা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, যতটা করিয়াছিল সেই মনোভাব প্রসূত উদাত্ত গভীর ছন্দধ্বনি। দান্তে বা ট্যাসোর মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান আদর্শও তাঁহার কল্পনার অনুকূল ছিল না, তাই তাঁহার কাব্যে দান্তের নরক বর্ণনার অনুকরণ নিতান্তই প্রাণহীন হইয়াছে। কিন্তু গ্রীক কবির সহজ সৌন্দর্যপ্রীতি, সরল তত্ত্ব-চিন্তাহীন মানবতার আদর্শ তাঁহার কবিচিত্ত জয় করিয়াছিল।"

মেঘনাদ-বধ কাব্যে হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসী' কাব্যের ভাবাদর্শ সমধিক পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় সর্গে মেঘনাদের বিরুদ্ধে স্বর্গলোকে দেবতাদের ষড়যন্ত্র, পার্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া শিবের নিকট গমন, শিব-পার্বতীর মিলন, অস্ত্রদান প্রভৃতি বিবরণ গ্রীক কবির নিকট হইতেই গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গ ছাড়া অন্যান্য সর্গেও হোমারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মধুকবি একটি পত্রে লিখিয়াছেন "As a reader of the Heroic epics, you will, no doubt be reminded of the fourteenth Illiad, and I am not ashamed to say, that I have, intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida."

মেঘনাদ বধের চরিত্র সৃষ্টিতেও হোমারের অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দেবদেবীরা প্রায়শ শান্ত ন্যায়পরায়ণ ও কল্যাণকামী। হোমার অঙ্কিত দেবদেবীরা উগ্র হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণ ও জীবনভোগী। মেঘনাদ বধ কাব্যের দেবদেবী চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন হোমারের এই দেবদেবীদের বৈশিষ্ট্যই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার শিব জেউসের আদর্শে রচিত। এবং উমার পশ্চাতে রহিয়াছে হেরার প্রভাব। মহামায়া হোমারের আথেনার অনুরূপ। মেঘনাদের পরিণাম হেক্টরের পরিণামের অনুরূপ। মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণের আচরণ পাত্রক্লোসের মৃত্যুতে আথিলেওসের অনুরূপ। প্রমীলা চরিত্রটি হেক্টরের স্ত্রী আন্দ্রোমাকের আদর্শে রচিত।

মেঘনাদ বধ কাব্যের ভাষা ও ছন্দ নির্মাণে পাশ্চাত্য আদর্শ বহুল পরিমাণে অনুসৃত। মেঘনাদ বধ কাব্যে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা যে মিলটনের Blank Verse ছন্দের আদর্শে রচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মেঘনাদ বধ কাব্যকে বিবিধ ঐশ্বর্যে ও ভাবে সাজাইবার জন্য মধুসূদন পাশ্চাত্যের অনেক কবির নিকট হইতেই অলংকার গ্রহণ করিয়াছেন। কখনো তিনি নিজস্ব কবি প্রতিভায় এ অলংকার এমনভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন যে কাব্যশরীরের সহিত তাহা একাকার হইয়া গিয়াছে। আবার কখনো যথার্থ কল্পনার অভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। তবে সামগ্রিকভাবে হোমারের সহিত তাঁহার মানসলোকের সাধর্ম্য থাকায় তিনি হোমারকেই বেশী করিয়া অনুসরণ করিয়াছেন। প্রখ্যাত সমালোচক তাই যথার্থই বলিয়াছেন "কাব্য নির্মাণ কৌশলে, রসাত্মক কাব্যযোজনা, বিচিত্র কল্পনাবস্তু প্রভৃতির জন্য তিনি ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো ও মিলটন হইতে বায়রণ, মুর, পর্যন্ত এবং বাল্মীকি, কালিদাস হইতে কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস পর্যন্ত সকলেরই দ্বারস্থ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজস্ব কল্পনা ও কাব্য-প্রকৃতি হোমারকে যেভাবে অনুসরণ করিয়াছিল, এমন আর কাহাকেও নহে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি হোমারকে ভুলিতে পারেন নাই—বাংলা

গদ্যে হোমারের মূল মহাকাব্যের অসমাপ্ত অনুবাদই তাহার শেষ সাহিত্যকর্ম। ঘুনানী কবির সেই আদি কাব্য প্রেরণার মধ্যেই তিনি আপন প্রাণের প্রতিধ্বনি পাইয়াছেন —তাঁহার সেই সুস্থ সবল মানবতা এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিশ্চিন্ত জীবনধর্মের অনুধ্যান দ্বারা তিনি নিজের অশান্ত প্রাণকে শান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।"

প্রশ্ন ১০। মেঘনাদ বধ কাব্যে পুরাতন পৌরাণিক কাহিনী মধুসূদনের প্রতিভাস্পর্শে কিরূপে সমকালীন যুগপ্রেরণায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ অবলম্বনে আলোচনা কর।

উত্তর। বাল্মীকি রচিত রামায়ণ বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় মহাকাব্য। এই মহাকাব্যে রামচন্দ্রের জন্ম হইতে শুরু করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকাহিনী অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়া বর্ণিত। রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে লঙ্কেশ্বর রাবণের সহিত সংগ্রাম এই মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান ঘটনা। রামচন্দ্রের কাহিনী ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও ইহা নানা দিক দিয়াই পৌরাণিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে কত যে কাব্য রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রামকাহিনীর আদর্শ শত শত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় জনজীবনধারাকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে।

মধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীতে এই পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক কালের নবচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দী বাঙালী জাতির নবজাগরণের মহালগ্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ের পর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের প্রেরণায় বাঙালীর অন্তরে নূতন যে ভাবচেতনার জন্ম হইয়াছিল, তাহারই ফলে বাংলার শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের অসামান্য কর্ম প্রেরণায় বাংলার বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রে নবনব আন্দোলনের সূচনা হইল। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তনে হিন্দুসমাজে নূতন এক ধর্মচেতনার উদ্ভব হইল। সতীদাহ প্রথার নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন বাংলার সমাজজীবনে গভীর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। বাংলা সাহিত্যের রীতি প্রকৃতির মধ্যে গভীর পরিবর্তন শুরু হইল। উনবিংশ শতাব্দীর জীবনসংঘাত ও মানবতাবাদ বাংলা সাহিত্যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। মধুসূদন এই যুগের বার্তা বহন করিয়াই বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার অমরকাব্য 'মেঘনাদ বধ' উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাতির নবজাগরণেরই ফলশ্রুতি।

মধুসূদন যুগন্ধর কবি। তিনি সমকালীন যুগ ও জীবনের রূপকার। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের মর্মবাণী তিনি আপন অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সাহিত্যের মধ্যে নূতন যুগের ভাবপ্রেরণা সঞ্চার করিতে না পারিলে ইহা বিশ্বসাহিত্যধারার সহিত মিলিতে পারিবে না। তাই তিনি নিজের কবি প্রতিভায় অসীম প্রত্যয় লইয়া স্বয়ং এই বিরাট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অসামান্য কবিপ্রতিভায়, অতুলনীয় মননপ্রকর্ষে তিনি তাঁহার মেঘনাদ বধ কাব্যকে আধুনিক যুগের বার্তাবহ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পৌরাণিক রামচন্দ্রের কাহিনীকে তিনি যুগপ্রেরণা ও স্বকীয় মানসকল্পনার আলোকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে বাল্মীকি রামায়ণের চরিত্র ও ঘটনাবলী নবরূপে নবরসে সঞ্জীবিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এ সম্পর্কে তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন—"I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it."

অন্য একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

"On the present poem I mean to give free scope to my inventing powers and to borrow as little as I can from Valmiki." কবির এই পত্রাংশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়াই নূতন কাব্যরচনায় ব্রতী হইতে চান। মেঘনাদ বধ কাব্যের চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণ করিলেও একই সত্য চোখে পড়ে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি বাল্মীকি রামায়ণ হইতে গৃহীত হইলেও মধুকবি তাহাদের আপন মানস কল্পনা দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। রাবণ ও মেঘনাদ চারিত্রধর্মে পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট। রাবণ চরিত্রটি একান্তভাবে যুগ-প্রেরণায় মধুসূদনের মৌলিক সৃষ্টি। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ অনার্য রাক্ষস জাতির দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী অধীশ্বর। সেখানে তাঁহার অসাধারণ শক্তিমত্তা, প্রভাব ও পরাক্রমের বিষয়ই বর্ণিত। কিন্তু মধুসূদন যে রাবণকে সৃষ্টি করিয়াছেন সে রাবণ মানবিক গুণসম্পন্ন স্নেহশীল ও হৃদয়বোধ সম্পন্ন। তিনি একাধারে প্রজাবৎসল সম্রাট ও সুখী রাক্ষস পরিবারের অধিপতি। রাবণ সম্পর্কে মধুসূদন একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

"The idea of Ravan elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow." রাবণ চরিত্র সম্পর্কে কবির এই মনোভাবের জন্যই তিনি তাহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বলিষ্ঠ মানবতাবাদ ও জীবনবোধের প্রতীকি চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। মেঘনাদ রামচন্দ্র লক্ষ্মণ প্রমীলা চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি চরিত্রকে মধুসূদন আপন মানসকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী রূপদান করিয়াছেন।

মেঘনাদ বধের ঘটনাবলীর মধ্যেও পৌরাণিক রূপের পরিবর্তে আধুনিক রূপ পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম সর্গে বর্ণিত বীরবাহুর মৃত্যু-ঘটনা বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত হয় নাই। মনে হয়, কবি এই ঘটনার সূত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকেই সংগ্রহ করিয়া তাহাকেই কবি প্রতিভার আলোকে বিবর্ধিত করিয়াছেন। মেঘনাদকে সেনাপতি পদে বরণের পর যে সকল ঘটনাবলী ঘটিয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে আধুনিক যুগমানসের প্রভাবে সঞ্জীবিত।

মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্যকে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের বলিষ্ঠ প্রাণ-সত্তার মাধ্যম হিসাবে রচনা করিতে চাহিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে কৃত্তিবাসের মতো দ্বিতীয় কোন 'রাম পাঁচালী' রচনায় কোন অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। রামায়ণের পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া তিনি এমন একটি মহাকাব্য রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা একাধারে সমকালীন যুগ ও ধর্মের বলিষ্ঠ প্রকাশ, অন্যদিকে চিরকালীন ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জীবনকাহিনী।

তাই তিনি ইহার চরিত্র ও ঘটনার পৌরাণিক সাজসজ্জা খুলিয়া দিয়া বলিষ্ঠ জীবনধারা ও প্রাণসত্তায় ইহাদিগকে নবরূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচকের ভাষায়—"মেঘনাদবধের কাহিনী নির্বাচনের পশ্চাতে আছে একটি বিশেষ কবি ভাবনা, একটি সুস্থ সবল প্রাণধর্ম। কবি সে যুগের সাংস্কৃতিগত সংস্কারকে অস্বীকার করিয়া এমন একটা কিছুকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা মানব প্রকৃতির আদি ধর্ম, যাহা শাস্ত্রবিধি অপেক্ষাও সত্য ও বলবান, যাহা ফুলের মতোই আপন স্বভাবধর্মে সুন্দর, জীবনাবেগে যাহা মহিমময়। মেঘনাদ বধের কাহিনী ইহারই একটি রূপক। কবি মানবজীবন ও মানবভাগ্যের সেই পার্থিবতাকেই পরম শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়াছেন।"

প্রশ্ন ১১। মেঘনাদ বধ কাব্যকে যথার্থ মহাকাব্য বলা যায় কিনা বিচার কর।

উত্তর। মহাকাব্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশাল কাব্য। প্রখ্যাত আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থে মহাকাব্যের সংজ্ঞায় যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল কথা হইল: মহাকাব্য বিভিন্ন সর্গে বিভক্ত থাকিবে। প্রতিটি সর্গের শেষে থাকিবে পরবর্তী সর্গের সূচনা। বিভিন্ন সর্গ একই ছন্দে রচিত হইবে তবে সর্গের শেষে অন্য ছন্দ থাকিতে পারে।

মহাকাব্যের প্রারম্ভে থাকিবে আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তুনির্দেশ। সত্য ঘটনা বা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া মহাকাব্যের কাহিনী গঠন করিতে হইবে।

মহাকাব্যের নায়ক হইবেন দেবতা অথবা উচ্চ বংশাভিজাত্যসম্পন্ন সম্রাট, রাজা বা ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয়। মহাকাব্যের মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, সাগর, রজনী, প্রদোষ, প্রভাত, মৃগয়া, বন, উপবন, পর্বত, জলক্রীড়া, বিবাহ, সম্ভোগ, বিরহ, মন্ত্রণা, যুদ্ধ, নগর—প্রভৃতির বর্ণনা থাকিবে।

মহাকাব্যে থাকিবে নয়টি রস। তবে বীর অথবা শান্তরস হইবে অঙ্গীরস।

গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল মহাকাব্য সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, মহাকাব্যে প্রধান কাহিনী থাকিবে একটি, তবে প্রধান কাহিনীর পাশাপাশি অপ্রধান কাহিনীও প্রবাহিত হইবে। ইহার ভাব ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে থাকিবে রাজকীয় মহিমা ও দীপ্তি।

পাশ্চাত্য আলংকারিকগণ মহাকাব্যকে Authentic Epic ও Literary Epic—এই দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেসী প্রভৃতি Authentic Epic হিসাবে বিখ্যাত। ভার্জিলের 'ঈনিড' ট্যাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভারড', মিল্টনের 'প্যারাডাইস লষ্ট', কালিদাসের 'কুমার সম্ভব'কাব্য' 'রঘুবংশ' Literary Epic এর অন্তর্ভুক্ত।

মধুসূদন দত্ত মেঘনাদ বধ কাব্য প্রথম প্রকাশ কালেই সুধী মনীষীবৃন্দ কর্তৃক 'মহাকাব্য' হিসাবে অভিনন্দিত হইয়াছিল। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত স্পষ্ট ভাষায় মেঘনাদ বধ কাব্যকে Epic বা মহাকাব্যের গৌরব দান করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহও এই কাব্যকে মহাকাব্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত

করিয়াছেন। মধুসূদন নিজেও এই কাব্যকে মহাকাব্য হিসাবেই রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথাতেই ধরা পড়ে—

গাইব মা, বীররসে, ভাসি
মহাগীত।

মহাকাব্য রচনার মানসপ্রস্তুতিও যে তাঁহার ছিল, তাহা তাঁহার লেখা বিভিন্ন পত্র হইতে বুঝা যায়। কিন্তু সে যুগের বিচারে মেঘনাদ বধ মহাকাব্য হিসাবে চিহ্নিত হইলেও এ যুগের বিচারে তাহার কিরূপ মূল্যায়ণ হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী বিচার করিলে দেখা যায় যে মেঘনাদ বধের মধ্যে মহাকাব্যের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের যথার্থ অভাব আছে। ইহার নায়ক সদ্বংশজাত বা ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত নহে। নায়কের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাব্যের উপসংহার ঘটে নাই। মহাকাব্যে যে বিশালতা, বিস্তৃতি, ঔদার্য ও সার্বজনীনতা থাকে, মেঘনাদ বধে তাহারও যথেষ্ট অভাব। মহাকাব্যে কবি থাকেন নিরপেক্ষ, তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তার কোন পরিচয়ই থাকে না। কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়া কবির ব্যক্তিমানস বারবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভারতীয় রীতি অনুযায়ী মেঘনাদ বধ কাব্যকে মহাকাব্য না বলা গেলেও পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী ইহাকে Literary Epic হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। Literary Epic বা সাহিত্যিক মহাকাব্যের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা ইহার মধ্যে বর্তমান। ইহার ভাব পরিকল্পনার মধ্যে একদিকে আছে পাশ্চাত্য মহাকাব্যোচিত বিস্তার; অন্যদিকে বহিরঙ্গ গঠন পরিকল্পনার মধ্যেও আছে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের শিল্প সুষমা। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের মধ্যে যেমন দেখা যায়, মধুসূদনের কাব্যের 'চরিত্রগুলির মধ্যেও তেমনি নাটকীয় গুণ বিকাশলাভ করিয়া মধ্যে মধ্যে চমৎকারিত্ব ও বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। ঘটনার একমুখীনতাও ইহার একটি বিশিষ্ট পাশ্চাত্য মহাকাব্যোচিত গুণ, কাহিনীর বস্তুধর্মিতাও ইহার পাশ্চাত্য মহাকাব্যের ধর্ম রক্ষা করিয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিচিত্র ধ্বনি-প্রবাহ, কাব্য দেহের সমৃদ্ধি, অলংকার কল্পনার বিশালতা এবং বৈচিত্র্য ইহাকে পাশ্চাত্য মহাকাব্যেরই অনেকটা সমধর্মী করিয়াছে।'

তবে বহিরঙ্গ আকৃতিতে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অনুরূপ হইলেও অন্তর প্রকৃতিতে ইহা গীতিকাব্য সুর সমৃদ্ধ। মহাকাব্য রচনার প্রস্তুতি ও আয়োজনের অভাব ছিল না। কিন্তু কবির নিজের রুচি ও আত্মভাবের প্রাধান্য, দুর্বল মানব প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি, বিরাট ও বৃহতের প্রতি পক্ষপাত, এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ এই কাব্যকে বাঙালী জীবনের গীতিকাব্যে পরিণত করিয়াছে।

প্রশ্ন ১২। মেঘনাদ বধ কাব্যের দেবদেবীর চরিত্র সৃজনে মধুসূদনের মনোভাবের যে পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ অবলম্বনে তাহা আলোচনা কর।

উত্তর। মধুসূদন ছিলেন উদারপন্থী। দেবদেবী চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন অহেতুক গোঁড়ামি বা রক্ষণশীলতা ছিল না। হিন্দু দেবদেবীদের

যে তাঁহাদের নিজস্ব ঐতিহ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইবে, এ ধরণের মনোভাব তাঁহার ছিল না। তাই তিনি নিজস্ব কবিভাবনার প্রয়োজন অনুযায়ী হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গে পাশ্চাত্য বেশভূষা পরাইয়া দিয়াছেন। এ সম্পর্কে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own.

মেঘনাদ বধ কাব্যে দেবদেবীর সংখ্যা কম নহে। পাশ্চাত্য মহাকাব্যে যেমন দেবদেবীরা বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মূল কাহিনীকে পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছেন, মেঘনাদ বধ কাব্যেও দেবদেবীরা প্রধান কাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল দেবদেবী পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁহার পত্নী শচীদেবী, মহাদেব, উমা, কমলা, বারুণী, মায়াদেবী, কার্তিক, কন্দর্প, রতিদেবী, চণ্ডী, বীরভদ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই রাবণের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এবং তাই রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে রত। ইহাদের নেতা দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্র যেহেতু মেঘনাদ কর্তৃক নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত তাই তিনি মেঘনাদের হত্যা বিষয়ে অত্যন্ত তৎপর। দেবতাদের ক্রিয়াকলাপ আলোচ্য কাব্যে এত রূঢ় যে মনে হয় তাহারাই বুঝি এখানে প্রধান ভূমিকা লইয়াছেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে বারুণী ও মুরলার কথোপকথনের মাধ্যমে দেবীদেবীদের ভূমিকার সূচনা করা হইয়াছে। রাবণ মহিষী চিত্রাঙ্গদা রাবণের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিয়া প্রস্থান করিলে রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ভৈরব গর্জন শুনিয়া রাক্ষস সেনাদল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইল। চারিদিকে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। সেনাবাহিনীর পদভরে লঙ্কাপুরী টলমল করিতে লাগিল। সাগর পত্নী বারুণী জলতলে মুক্তাফল দিয়া কবরী বাঁধিতেছিলেন। লঙ্কাপুরীর কোলাহলে চমকিত হইয়া সখী মুরলাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুরলা বলিলেন—

এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাক্ষস রাজা স্বর্ণ লঙ্কাধামে,
নাশিতে রাঘবের বীরগর্ব রণে।

তখন বারুণী তাহাকে সখী রাজলক্ষ্মী কমলার নিকট পাঠাইল। কারণ "শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।" মুরলা কমলার কাছে গেলে কমলা তাঁহাকে রাবণের যুদ্ধসজ্জা দেখাইতে লইয়া গেলেন। মেঘনাদ এখনও বীরবাহুর নিধন সংবাদ জানেন না। কমলা তাঁহাকে সেই সংবাদ জানাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সর্গ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেবদেবীদের ক্রিয়াকলাপ লইয়াই রচিত। ইন্দ্র এখানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া পত্নী শচীদেবী সহ কৈলাসে উমার নিকট যাইয়া মেঘনাদ বধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। উমা কন্দর্পদেবকে সঙ্গে করিয়া যোগাসন পর্বতে ধ্যানমগ্ন শিবের কাছে যাইয়া তাঁহার ধ্যান

ভঙ্গ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে মেঘনাদ বধের উপায় জানিয়া কন্দর্পদেবকে তাহা বলিয়াছেন। কন্দর্পদেব তাহা বলিয়াছেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্র মায়াদেবীর নিকট হইতে অস্ত্র লইয়া গন্ধর্বরাজ চিত্ররথকে দিয়াছেন—চিত্ররথ আবার তাহা তুলিয়া দিয়াছেন রামচন্দ্রের হাতে। দ্বিতীয় সর্গে বিভিন্ন দেবদেবী অত্যন্ত কর্মতৎপর এবং কৌশলীও বটে। মেঘনাদ বধের জন্য তাঁহারা যেন সর্বশক্তি উজাড় করিয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারা প্রতিটি পদক্ষেপে কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইন্দ্র একাকী উমার কাছে না যাইয়া শচীদেবীকে সঙ্গে লইয়াছেন। কারণ—

পরিমল সুধা সহ পবন বহিলে
দ্বিগুণ আদর তার।

উমা মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া যোগাসন পর্বতে মহাদেবকে ভুলাইতে গিয়াছেন। মহাদেব তাঁহার আকস্মিক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ছলনার আশ্রয় লইয়া বলিয়াছেন--

এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন আশে
পা দুখানি।

মহাদেবকে ভুলাইয়া তাঁহার সহিত দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাঁহার কার্যোদ্ধার করিয়াছেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যে দেবদেবীদের ক্রিয়াকলাপে গ্রীক দেবদেবীদের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া তাহা জাতীয় ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু চরিত্র নহে, মেঘনাদ বধের অনেক পৌরাণিক ঘটনার মধ্যেও গ্রীক আদর্শের ছায়া। ভারতীয় দেবদেবীদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেবদেবীদের সমন্বয় করিতে যাইয়া মেঘনাদ বধের দেবদেবীগণ নিজস্ব মহিমায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

প্রশ্ন ১৩। মেঘনাদ বধ কাব্যের রসবিচার কর।

অথবা

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রারম্ভে কবি বলিয়াছেন—

গাইব মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত।

—এই উক্তির তাৎপর্য বিচার কর।

উত্তর। মধুসূদন দত্ত রচিত অমর কাব্য মেঘনাদ বধের প্রারম্ভে কবি ঘোষণা করিয়াছেন—

গাইব মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত।

কবির এই উক্তি হইতে স্বাভাবিকভাবে এই কথা মনে হইতে পারে, তিনি মেঘনাদ বধ কাব্যকে বীর রসাত্মক কাব্য হিসাবে সৃষ্টি করিতে চান। প্রধানত বীররস অবলম্বন করিয়াই তিনি ইহার ঘটনাজাল বিস্তৃত করিবার

সেখানে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। রাবণ বলিলেন, যে এখন সন্ধ্যা হইয়াছে। ইষ্টদেবের পূজা করিয়া তিনি যেন কাল যুদ্ধে যান।

ইহার পর রাবণের নির্দেশে গঙ্গাজলে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী মেঘনাদকে সেনাপতিপদে অভিষেক করা হইল। বন্দীরা গান ধরিল। গম্ভীর স্বরে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল।

প্রথম সর্গের মধ্যে মেঘনাদকে সেনাপতিপদে অভিষেক করা হইয়াছে বলিয়া এই সর্গের নামকরণ করা হইয়াছে 'অভিষেক'। যদিও এই অভিষেক ঘটনাটি আলোচ্য সর্গের প্রধান ঘটনা নয়, তথাপি ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বীরবাহুর মৃত্যুর পর লঙ্কাপুরীর বিপর্যয় অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, রাবণও অত্যন্ত চিন্তিত। লঙ্কাপুরীর এই আসন্ন বিপর্যয়ে মেঘনাদই একমাত্র ভরসা। তিনিই শুধু রাক্ষস-কুলকে রক্ষা করিতে পারেন। তাই তাঁহার সেনাপতিপদে অভিষেক ঘটনাটিকে বড় করিয়া দেখা প্রয়োজন। তাঁহার অভিষেক রাক্ষসকুলে আশার সঞ্চার করিয়াছে। তাই এ নামকরণ সঙ্গত হইয়াছে।

প্রশ্ন ১৬। মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া ইহার 'অস্ত্রলাভ' নামকরণের তাৎপর্য বিচার কর।

উত্তর। দেবরাজ ইন্দ্র রাজসভায় বসিয়াছিলেন। সেই সময় কমলা সেখানে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, যে নিজকর্ম দোষে রাবণের মৃত্যুকাল আসন্ন। তাঁহার পুত্র মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবের পূজারত। যজ্ঞের শেষে তিনি যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, তখন রামচন্দ্রকে রক্ষা করা কঠিন হইবে। ইন্দ্র বলিলেন, যে এই বিপদে একমাত্র মহাদেবই ত্রাণ করিতে পারেন। অতএব মহাদেবের কাছে যাওয়া দরকার।

ইহার পর ইন্দ্র শচীদেবীকে লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন। উমা স্বর্ণাসনে বসিয়াছিলেন। পাশে সখী বিজয়া। উমাকে প্রণাম করিয়া ইন্দ্র আসন্ন বিপদের বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। এই বিপদে মহাদেবের সহায়তা প্রয়োজন। উমা বলিলেন, যে মহাদেব এখন যোগাসন পর্বতে ধ্যানমগ্ন। রাবণকে মহাদেব স্নেহ করেন। সুতরাং তিনি কি করিয়া তাঁহার অনিষ্ট করিবেন। ইন্দ্র বলিলেন, যে রাবণ দেবদ্রোহী। অশোক কাননে বন্দিনী সীতাকে দেখিলে পাষাণেরও বুক ফাটিয়া যায়; সুতরাং মেঘনাদকে বধ করিয়া সীতাকে রামচন্দ্রের হাতে ফিরাইয়া দেবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহার পর উমা নিজেই মহাদেবের নিকট যাইতে সংকল্প করিলেন। রতিদেবী মনোহর সাজসজ্জায় তাঁহাকে সাজাইয়া দিলেন।

উমা কন্দর্পদেবকে সঙ্গে লইয়া যোগাসন পর্বতে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। কন্দর্পদেব তাঁহার প্রতি ফুলশর নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেবের শরীরে শিহরণ জাগিল। উমা বলিলেন, যে মহাদেব যেহেতু তাঁহাকে দীর্ঘদিন ভুলিয়া আছেন, তাই তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। মহাদেব তখন উমাকে লইয়া প্রেমলীলায় মাতিয়া উঠিলেন। তারপর বলিলেন, যে রাবণ তাঁহার পরম ভক্ত। তথাপি নিজ কর্মদোষে তাঁহার ধ্বংস অনিবার্য। মায়া দেবীর আশীর্বাদে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিতে পারিবেন।

ইহার পর কন্দর্পদেব রতিদেবীকে লইয়া ইন্দ্রের কাছে গেলেন। ইন্দ্র গেলেন মায়াদেবীর কাছে। তারকাসুরকে বধ করিবার জন্ত যে অস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা তাঁহার কাছে রক্ষিত আছে। এই অস্ত্রেই মেঘনাদ নিহত হইবেন। ইন্দ্র এই অস্ত্র লইয়া মহানন্দে চলিয়া গেলেন। তারপর চিত্ররথ গন্ধর্বকে ডাকিয়া সেই অস্ত্র রামচন্দ্রের হাতে-তুলিয়া দিতে বলিলেন। চিত্ররথ সেই দেবাস্ত্র লইয়া লঙ্কাধামের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্রের আদেশে প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। সমুদ্রের জলে জাগিল প্রচণ্ড আলোড়ন। লঙ্কার আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গেল। রামচন্দ্রও নিজ শিবিরে চিন্তিত। এই সময় চিত্ররথ অস্ত্র লইয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্রকে তিনি বলিলেন, যে ইন্দ্রের আদেশে এই অস্ত্র তিনি লক্ষ্মণের জন্ত লইয়া আসিয়াছেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। ঝড় থামিয়া গেল। রাক্ষসদল আবার বীরমদে মত্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় সর্গের মধ্যে মেঘনাদকে হত্যা করিবার জন্ত দেবাস্ত্র লাভের ঘটনাটি প্রাধান্ত লাভ করায় ইহার নামকরণ করা হইয়াছে 'অস্ত্রলাভ'। দ্বিতীয় সর্গের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে রাবণ ও মেঘনাদের বিরুদ্ধে দেবতারা একযোগে চক্রান্ত করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই চক্রান্তের নেতা। তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সহিত সকলকে লইয়া মেঘনাদ বধের উপায়টি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। মেঘনাদকে বধ করিতে হইলে ভয়ংকর অস্ত্র চাই। তারকাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত যে অস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা মায়াদেবীর কাছে গচ্ছিত আছে। এই অস্ত্র প্রয়োগে মেঘনাদের মৃত্যু। ইন্দ্র মায়াদেবীর নিকট হইতে এই অস্ত্র লইয়া চিত্ররথকে দিয়াছেন। চিত্ররথ সেই অস্ত্র লইয়া রামচন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। মেঘনাদ বধের নিমিত্ত অস্ত্রলাভ আলোচ্য সর্গে প্রাধান্তলাভ করিয়াছে। তাই এই নামকরণ যথার্থ হইয়াছে।

প্রশ্ন ১৭। মেঘনাদ বধ কাব্যে মধুসূদন ব্যবহৃত কবিভাষার পরিচয় দাও।

উত্তর। মেঘনাদ বধ কাব্যে মধুসূদন যে কবিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বাংলা কাব্যে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। মেঘনাদ বধ কাব্যের কবিভাষা একান্তভাবেই তাঁহার নিজের সৃষ্টি, এই ভাষার আদর্শ তিনি পূর্ববর্তী বা সমকালীন কোন কবির কাছ হইতে লাভ করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পয়ার ছন্দকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের কবিভাষা নির্মাণ করিয়াছিলেন। অনুপ্রাস সৃষ্টির জন্তে তাঁহারা প্রায়শঃ দুর্বোধ্য ও আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিতেন। ইহার ফলে তাঁহাদের কবিভাষা প্রাচীনকালের স্বাচ্ছন্দ্য ও সারল্য হারাইয়া অনেকাংশ কৃত্রিম হইয়া পড়িল। মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্যের মধ্যে নূতন কবিভাষা সৃষ্টি করিয়া পয়ারের দুর্গতি হইতে রক্ষা করিলেন। বস্তুত মধুসূদন ব্যবহৃত মেঘনাদ বধ কাব্যের কবিভাষাই আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবিভাষা। মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদনের কবিভাষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ "ভাষা এখানে সর্বপ্রকারে কবির নিজস্ব প্রয়োজনের অধীন হইয়াছে; তাহার ফলে ভাষা শুধু ভাষামাত্রই

নাই, একটি স্বতন্ত্র কবিভাষায় পরিণত হইয়াছে। ছন্দে ও বাক্যে তিনি বাংলা কাব্যের খাতুকেই পরিবর্তন করিয়াছিলেন; বাক্যের সঙ্গীতগুণ শব্দের নূতনতর প্রয়োগ ও মিলন কৌশলে (Phrase-making) সে ভাষায় যে অপূর্বত্ব, ভিন্ন ধরনে বিহারীলাল ব্যতীত সে যুগের আর কোন কবি বাংলা কাব্যের ভাষাকে তেমন শিল্প-কৌলীন্য দান করিতে পারেন নাই।"

মধুসূদন শব্দ ব্যবহারে সর্বদা কানের উপর নির্ভর করিতেন। তৎসমই হোক বা দেশীই হোক, যে শব্দ তাঁহার কানের দাবী পূরণ করিত, তাহাই তিনি কাব্যে গ্রহণ করিতেন। এইজন্যে তাঁহার ব্যবহৃত অনেক অপ্রচলিত শব্দও শ্রুতিকটু না হইয়া শ্রুতিমধুর হইয়া পড়িয়াছে। মধুসূদন একই সঙ্গে তৎসম ও সহজবোধ্য দেশী শব্দ নির্বিচারে ব্যবহার করিয়াছেন। এসম্পর্কে তিনি প্রচলিত রীতি নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

যেমন :—

১। যথা দোলে (খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা—ব্রতালয়ে।

২। হানা দিয়া পূর্বদ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে বসিয়াছে বীর নল।

এই সকল গ্রাম্য শব্দের পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু দুরূহ ও অপ্রচলিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

১। ঊর্মিলাবিলাসী নাশি ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা।

২। যাদঃপতি—রোধ যথা চলোর্মি আঘাতে।

৩। কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংশ।

নামধাতুর ব্যাপক ব্যবহার মধুসূদনের কবি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি একদিকে যেমন বিশেষ্য পদকে ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন অন্যদিকে বিশেষণ পদকেও ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করিয়া বাংলা কাব্যে নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত নাম ধাতুর মধ্যে 'দীপিছে' 'মুকুলিল', 'নিঃশব্দিল' 'নীরবিলা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীতগুণ মধুসূদনের কবিভাষার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহার ভাষায় যে সঙ্গীত আছে, তাহা রস বিগলিত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গীত—স্বরধ্বনির অপূর্ব লীলা-বৈচিত্র্য। মোহিতলাল এই সঙ্গীতধর্মিতা সম্পর্কে বলিয়াছেন, "এ সঙ্গীত কাব্য রচনাকালে প্রাণ হইতেই কানে বাজিয়া উঠে, এবং তাহা হইতেই কবির রসনায় শব্দ সৃষ্টি হয়। যে মাদকতা হইতে ইহার সৃষ্টি, ভাষায় তাহা সঞ্চারিত না হইয়া পারে না, এবং তাহাই সঙ্গীতরূপে ছন্দোবন্ধে যমক অনুপ্রাসে বাক্যের ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনিতে পর্যন্ত প্রবাহিত ও স্পন্দিত হইয়া ওঠে।"

নূতন নূতন শব্দ প্রয়োগ মধুসূদনের কবিভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং এবিষয়ে ব্যাকরণ ও অভিধানের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ছন্দ ও ভাবের সুর বজায় রাখার জন্যে তিনি অপরিচিত ও অতি পরিচিত শব্দকে একই বন্ধনে বাঁধিয়াছেন খাঁটি বাংলা শব্দের প্রচলিত অর্থ বাদ দিয়া তাহাকে সংস্কৃত অর্থে প্রয়োগ এবং অনেক সময় পুরানো শব্দের সামান্য রূপ পরিবর্তন করিয়া তাহার নবরূপ দান করিয়াছেন।

প্রশ্ন ১৮। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ অবলম্বনে অলংকার সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্যে নানা ধরণের অলংকার প্রয়োগ করিলেও ইহার মহাকাব্যিক গঠনের জন্তে প্রধানত উপমার প্রতিই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার উপমাগুলি Epic Simile বা Homeric Simile গোত্রীয়। তবে হোমারের মতো তিনি উপমাকে বিশদভাবে বর্ণনা করেন নাই। উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য দেখাইয়া তিনি অন্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার উপমাগুলি ঐশ্বর্যমণ্ডিত মৌলিক ও রসবৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মধুসূদন ব্যবহৃত উপমাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যে তিনি প্রধানত দুইভাবে উপমা অলংকার নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার এক ধরণের উপমা 'নিত্য-পরিচিত ব্যবহারের সহিত সাদৃশ্য যোজনা'। এই সকল উপমার মধ্যে দিয়ে বর্ণনার ভাবচিত্রটি মুহূর্তের মধ্যে পাঠকমনকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।

যেমন :—

১।
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী ! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি।

২।
শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির নীরের বিন্দু শতদল দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয় শিখরে।

এই সকল উপমার মধ্যে যে সহজ ও সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মহাকাব্যের বিশিষ্ট রস প্রকৃতির অনুকূল।

ইহা ছাড়া আর এক ধরনের উপমা ব্যবহার করা হইয়াছে, যেগুলি শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতা বা নৈতিক সৌন্দর্যবোধের পরিপোষক নয়, যেগুলি বাস্তব রূপের বাইরে এক ব্যাপকতর গভীর রসব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে।

(১)
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে—
মেঘদল আসি যেন আবরিল রুষি
গগনে ; বিদ্যুৎ ঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে।

(২)
.......................গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাসশিখরে।
রবে নিশান্ত যথা ফুটি, সরোজিনী
ধ্যায়ে দিবাস্পতি দূতী উষার চরণে।

উপমা ছাড়া অন্যান্য অলংকার প্রয়োগেও মধুসূদন যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নিম্নে তাঁহার ব্যবহৃত অন্যান্য কয়েকটি উপমার নিদর্শন দেওয়া হইল—

(১) অনুপ্রাস—

সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা।

(২) সাঙ্গরূপক—

শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিঃশ্বাস প্রলয়বায়ু; অশ্রুবারি ধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।

(৩) উৎপ্রেক্ষা—

ধরে ছত্র ছত্রধর, আহা
হর কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে।

(৪) অতিশয়োক্তি—

হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূট ভরা
এ ভুজগে?

(৫) স্বভাবোক্তি—

কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক।

(৬) ব্যাজস্তুতি—

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের অলংকার প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় ছড়াইয়া আছে। কাব্যশরীরের সৌন্দর্য বিধানের জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তাই কাব্যকে সুন্দর করিবার মানসে সকল কিছুই তিনি অলংকার হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন ১৯। মেঘনাদ বধ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনের কবি প্রতিভার এক অভিনব সৃষ্টি। এই ছন্দের মাধ্যমে তিনি নিজের কবিত্বের সার্থক কাব্যরূপদানে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মধ্যযুগে জয়দেব যেমন আপন কবিপ্রাণের সার্থক মুক্তিকল্পে নিজস্ব ছন্দ ও কবিভাষা নির্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন, মধুসূদনও তেমনি মানস মুক্তির দুর্নিবার অন্তর্প্রেরণায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা ছন্দে নবযুগ প্রবর্তন করিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি যে মধুসূদনের আকস্মিক খেয়ালী মনোভাবের ফলশ্রুতি, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। অন্যান্য সৃষ্টিকর্মের মতো এ ক্ষেত্রেও যে তাঁহার সৃজন কল্পনা ও সচেতন অভিপ্রায় বহুলাংশে ক্রিয়াশীল ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মধুসূদনের জীবনগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, তিনি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এক চ্যালেঞ্জের জবাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিলেন। প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনাকালে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ছাড়া নাটকের উন্নতি সম্ভব নয়। কথা প্রসঙ্গে মহারাজার সহিত আলোচনা কালে বলিয়াছিলেন, "যতদিন বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের না প্রবর্তন হইবে ততদিন বাংলা নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতির আশা নাই।" উত্তরে মহারাজা বলিলেন, "বাংলা ভাষার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হওয়ার আশা অল্প।" মধুসূদন বলিলেন, "আমি তা মনে করি না। চেষ্টা করিলে আমাদের ভাষাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হইতে পারে।" মহারাজা বলিলেন, "বাংলা ভাষার গঠন বিবেচনায় এতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নয়। ফরাসী ভাষা আমাদের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত কিন্তু আমি যতদূর অবগত আছি, তাতে এই ভাষায়ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কোন কাব্য নাই।" মধুসূদন বলিলেন, "বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা; এরূপ জননীর সন্তানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।" এই আলোচনার শেষেই নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করিবেন।

ইংরাজী Blank Verse ছন্দ কবিকে নূতন ছন্দ নির্মাণে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই ছন্দকে বাংলা কাব্যে কিরূপ সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা করিতেন। এ সম্পর্কে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছেন—

We want the public ear to be attened to the melody of Blank Verse.

বাংলা ভাষার পয়ার ছন্দ ও শব্দের মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি রস ও রহস্য আছে, মধুসূদন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। বাংলা পয়ারের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে দেখিয়া তিনি ইহাতেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তি করিয়াছেন, কিন্তু কারুকর্ম নির্মাণ করিয়াছেন মিল্টনের Blank Verse-এর গঠন অনুযায়ী। অমিত্রাক্ষর ছন্দের শৈথিল্য মহাকাব্য রচনার অন্তরায়, তাই কবি মিল্টনের ছন্দধ্বনি ব্যবহার করিয়া লিরিক্যাল প্রবৃত্তি অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শুধু মিল্টনের ছন্দধ্বনিই গ্রহণ করেন নাই, সেই সঙ্গে তাঁহার যতি বিন্যাস পদ্ধতিও গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে নিজস্ব কল্পনার সহিত বিদেশী কল্পনার সংমিশ্রণে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের রূপ নির্মাণ করিয়াছেন। প্রখ্যাত গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় "একদিকে বাংলা পয়ারের দৈহিক গঠন এবং

অপরদিকে ইংরাজী কাব্যে যতির ও ছন্দ স্পন্দনের নিয়ম, উভয়ই তাঁহার অমিত্রাক্ষরের মধ্যে একসঙ্গে আসিয়া সংমিশ্রণ লাভ করিয়া ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নূতন যুগের সাহিত্যরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে।"

মধুসূদন ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার গতি স্বচ্ছন্দতা। প্রচলিত পয়ার ছন্দে কাব্যবস্তু স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না। নির্দিষ্ট গতি সীমানার তাহাকে বদ্ধ থাকিতে হয় বলিয়া পদে পদে বন্ধন ও আড়ষ্টতা তাহার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করে। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে গতিকে নির্দিষ্ট সীমানা হইতে মুক্তি দেওয়ার ফলে কাব্যবস্তু সেখানে স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারে। ছন্দস্পন্দন স্বাভাবিক ও অনাড়ষ্ট হইবার ফলে গতিবিন্যাস স্বাভাবিক ও গতিশীল হইতে পারিয়াছে। যেমন—

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর!

অমিত্রাক্ষর ছন্দের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ইহার Verse Paragraph বা পঙ্‌ক্তিব্যূহ। স্বল্প ও দীর্ঘ বিরামযুক্ত যত কাব্য ও বাক্যাংশের সমাহার, কিংবা একটি ভাবচিত্র বা ব্যাখ্যান যে ভাবে পূর্ণায়ত ছন্দরূপ লাভ করে, তাহাকে পঙ্‌ক্তিব্যূহ বলা হয়। প্রখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"এই পঙ্‌ক্তিব্যূহ রচনাতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রকৃত ছন্দগৌরব লাভ করিয়াছে। এই verse paragraph-এর জন্যই মধুসূদনের ছন্দ মিল্টনের ছন্দের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে এবং ইহারই গুণে, ওই এক ছন্দে একখানি বৃহৎ কাব্য বিচিত্র সঙ্গীত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, ভাবের সঙ্গে সুরের আবর্তন রক্ষা করিতে পারিয়াছে।" যেমন—

শোকের ঝড় বহিল সভাতে
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রু বারি ধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব!

মধুসূদনের এই verse paragraph-এর কৌশল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহারা সঠিক অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণে সফল হন নাই।

বাংলা যুক্তাক্ষরের অন্তর্নিহিত শক্তিকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়া মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলা বাক্য উচ্চারণকালে প্রতিটি পৃথক শব্দের বা বাক্যাংশের প্রথম অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে, মধুসূদন তাহাকে প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি করিয়া ছন্দকে তরঙ্গিত করিয়াছেন। কবি যুক্তাক্ষর প্রধান সংস্কৃত শব্দকেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে সুন্দররূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। নামধাতু ও ক্রিয়াপদের সুষম প্রয়োগ তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সুদৃঢ়ম অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে পরবর্তীকালের নব নব ছন্দনির্মিতির পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ কবিপ্রতিভায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা কাব্যকে অপূর্ব ভাবগৌরব দান করিতে সক্ষম হইয়াছে।

প্রশ্ন ২০। মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রাঙ্গদা ও রাবণের কথোপ-কথনের সারাংশ লিখ।

উত্তর। বীরবাহুর মৃত্যুর পর শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে রাবণ রাজসভায় বসিয়া ছিলেন। এমন সময় সখীদল সঙ্গে রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা সেখানে প্রবেশ করিল। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে তিনিও বেদনার্ত। তাঁহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থলে যেন শোকের ঝড় বহিয়া গেল।

চিত্রাঙ্গদা রাবণকে বলিল যে বিধাতা তাঁহাকে একটি পুত্ররত্ন দান করিয়াছিলেন। তিনি সেই রত্ন রাবণের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁহাকে আজ কোথায় রাখিয়াছেন? দরিদ্রের সম্পদ রক্ষা করা রাজার ধর্ম। রাবণ রাজকুলেশ্বর। কোথায় তিনি সেই রত্নকে রাখিয়াছেন?

রাবণ বলিলেন যে চিত্রাঙ্গদা বৃথাই তাঁহার প্রতি অনুযোগ করিতেছেন। তিনি গ্রহের ফেরে আজ দোষী হইয়াছেন। বিধাতার নির্বন্ধে তাঁহাকে এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। যে লঙ্কায় বীরের অভাব ছিল না, সেই লঙ্কা আজ বীরশূন্য। পদ্মের বনে সজারু প্রবেশ করিয়া যেমন সব ছিন্নভিন্ন করে, তেমনি রামচন্দ্র লঙ্কাপুরীর সবকিছু ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা এক পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। আর এদিকে শত পুত্রশোকে তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িতেছে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সব রাক্ষস নিহত।

চিত্রাঙ্গদা কাঁদিতে লাগিলে রাবণ বলিলেন যে তাঁহার এই ক্রন্দন সাজে না। তিনি বীরমাতা। তাঁহার পুত্র দেশের শত্রুকে হত্যা করিতে গিয়া বীরের মতো যুদ্ধ করিয়া স্বর্গে গিয়াছে। বীরমাতা হিসাবে তাঁহার গর্ব করা উচিত।

চিত্রাঙ্গদা বলিলেন যে দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া যে প্রাণ দেয়, তাহার জন্ম শুভক্ষণে। তাহার মাতা ভাগ্যবতী। কিন্তু রাবণের বেলায় সে কথা খাটে না। কোথায় অযোধ্যা আর কোথায় লঙ্কাপুরী। রাঘব এ দেশে আসিয়াছেন সম্পদের লোভে নয়। স্বর্ণলঙ্কা ইন্দ্রের বাঞ্ছিত। রামচন্দ্র কি রাবণের সিংহাসনের লোভে যুদ্ধ করিতেছেন? তবে তাঁহাকে দেশের শত্রু বলা হইবে কেন? সর্প স্বভাবত নম্রশির। কিন্তু তাহাকে যদি কেহ প্রহার করে, তবে সেও মাথা উঁচু করিয়া দংশন করে। রাবণই এ যুদ্ধের মূল কারণ। তিনিই নিজ কর্মফলে লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করিলেন এবং নিজেও ধ্বংস হইলেন।

প্রশ্ন ২১। পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ-কমল-গুণে।

তাৎপর্য ও প্রসঙ্গ নির্দেশ কর।

উত্তর। বাতাস সকলেরই প্রিয়। বাতাস মানুষের জীবন। মৃদুমন্দ বাতাস মানুষের জীবনকে এক আনন্দের আবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সেই বাতাসের সহিত যদি সুমিষ্ট পুষ্পগন্ধ মিশ্রিত থাকে, তবে তাহা মানুষের নিকট

আরো প্রিয় হইয়া যায়। সুমিষ্ট বাতাস মানুষের হৃদয়কে অপূর্ব পুলকাবেগে ভরিয়া তোলে। মৃণালের নিজস্ব কোন শোভা বা সৌন্দর্য নাই। পদ্মের সৌন্দর্যেই তাহার সৌন্দর্য। পদ্মফুল অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত থাকে বলিয়াই মৃণালের আদর। পদ্মফুল যদি তাহার শতদল না মেলিয়া রাখিত, যদি জলের উপর শুধুমাত্র একটি মৃণাল ভাসিয়া থাকিত তবে তাহাকে অত্যন্ত কুৎসিত দেখাইত।

হরপার্বতী ইন্দ্রকে স্নেহ করেন। ইন্দ্রকে দেখিলে তাঁহারা আনন্দলাভ করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রের সহিত যদি শচীদেবীকে দেখেন, তবে তাহারা দ্বিগুণ আনন্দলাভ করিবেন। শচীদেবীর জন্য তাঁহার আদর আরও বাড়িয়া যাইবে।

হরপার্বতীর নিকট গমন প্রসঙ্গে ইন্দ্র শচীকে এইসব কথা বলিয়াছেন।

প্রশ্ন ২২। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গ অবলম্বনে রাবণ চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদনের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

(কঃ বিঃ ১৯৮১)

উত্তর। 'রাবণ চরিত্র' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২৩। মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে দেবদেবীর পরিকল্পনায় মধুসূদনের উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা করে এই সর্গে মধুসূদনের কোন মৌলিকতা আছে কি না দেখাও।

(কঃ বিঃ ১৯৮১)

উত্তর। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ একান্তভাবে দেবদেবীর লীলা-নির্ভর। এই সর্গে প্রধানত দেবদেবীদের ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দেবসভায় বসিয়াছিলেন। সম্মুখে উর্বশী, রম্ভা, চিত্রলেখা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরা নৃত্যরত। এই সময় রাবণের রাজলক্ষ্মী কমলা সেখানে প্রবেশ করিয়া মেঘনাদের অভিষেকের কথা বলিলেন। মেঘনাদ এখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছেন। পূজার শেষে তিনি যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, তখন রামচন্দ্রকে রক্ষা করা কঠিন হইবে। ইন্দ্র বলিলেন যে এই বিপদে মহাদেবই একমাত্র ভরসা।

ইন্দ্র পত্নী শচীদেবীকে লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন। সেখানে স্বর্ণাসনে মহেশ্বরী উমা বসিয়া আছেন। ইন্দ্র তাঁহার নিকট রামচন্দ্রের বিপদ-বার্তা নিবেদন করিলেন

উমা বলিলেন যে মহাদেব এখন যোগাসন পর্বতে ধ্যানমগ্ন। তিনি রাবণকে স্নেহ করেন। স্বামী যাহাকে স্নেহ করেন, তিনি কিরূপে তাঁহার অনিষ্ট কামনা করিবেন।

ইন্দ্র বলিলেন যে রাবণ দেবদ্রোহী। তিনি রামচন্দ্রের পত্নীকে হরণ করিয়াছেন। উমা বলিলেন যে রাবণ মহাদেবের আশ্রিত। মহাদেব ছাড়া অন্য কেহ তাঁহার ক্ষতি করিতে পারিবে না।

ইন্দ্র তখন উমাকে যোগাসন পর্বতে উমাকে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ঠিক এই সময় রামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে দুর্গা পূজায় বসিয়াছিলেন। উমার হৃদয় তাহাতে করুণাদ্র হইল। তিনি যোগাসন পর্বতে যাইতে সম্মত হইলেন।

কন্দর্পপত্নী রতিদেবীর সহায়তায় তিনি যোগিনী বেশ ধারণ করিলেন। সাজসজ্জা শেষ হইলে তিনি কন্দর্পদেবকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কন্দর্পদেব ভয় পাইলে উমা তাঁহাকে অভয় দিলেন। তারপর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন যোগাসন পর্বতে।

মহাদেব যোগাসন পর্বতে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কন্দর্পদেব ফুলশর নিক্ষেপ করিলে তাঁহার শরীরে শিহরণ জাগিল। মহাদেব চোখ মেলিয়া উমাকে দেখিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন।

উমা বলিলেন যে বহুদিন তিনি তাহাকে দেখেন নাই। তাই তাহাকে তিনি দেখিতে আসিয়াছেন।

মহাদেব আদর করিয়া তাঁহাকে মৃগচর্মে বসিতে দিলেন। তারপর তাহাকে লইয়া প্রেমলীলায় মাতিয়া উঠিলেন। প্রেমলীলা সাঙ্গ হইলে তিনি বলিলেন যে রাবণ নিজের পাপের জন্য ধ্বংস হইবেন। কন্দর্পদেব যেন মায়াদেবীর কাছে যান। তাঁহার আশীর্বাদে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিতে পারিবেন।

কন্দর্পদেব ইন্দ্রের নিকট যাইয়া সকল কথা বলিলেন। ইন্দ্র নিজে গেলেন মায়াদেবীর কাছে। কার্তিকেয় তারকাসুরকে যে অস্ত্রের সাহায্যে বধ করিয়াছিলেন সেই অস্ত্র তাঁহার নিকট রক্ষিত ছিল। মায়াদেবী সেই অস্ত্র দান করিলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্র তাহা দিলেন গন্ধর্ব চিত্ররথকে। চিত্ররথ সেই অস্ত্র লইয়া লঙ্কাপুরীতে যাইয়া রামচন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিলেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের দেবদেবী পরিকল্পনায় মধুসূদন অনেকাংশে উদারপন্থীর ভূমিকা লইয়াছেন। ধর্মীয় সংস্কারে তাঁহার উদারতাপূর্ণ মনোভাবই দেবদেবীর চরিত্রচিত্রণে প্রতিফলিত হইয়াছে। মেঘনাদ বধ কাব্যের দেবদেবীদের চরিত্র ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী নয়, ইহারা অনেকাংশে গ্রীক দেবদেবীদের চরিত্রধর্ম অনুসারে চিত্রিত। ইহাতে এই কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে মধুসূদন হিন্দু দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তিনি যে যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তাহা জানা যায় তাঁহার লেখা একটি পত্রে—"Though a Jolly Christian youth I don't care a pins head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors." অন্যত্র লিখিয়াছেন—"It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own"

মধুসূদনের এই পত্রাংশ হইতে বোঝা যায় যে ভারতের পৌরাণিক কাহিনী-গুলি ও ইহার অন্তর্ভুক্ত দেবদেবীর চরিত্রগুলি তাঁহার প্রিয় ছিল। তবে ইহাদের নিষ্ক্রিয়তা তাঁহার খুব পছন্দ ছিল না। পাশ্চাত্য দেবদেবীর ক্রিয়াকলাপ এবং পাশ্চাত্য কাব্যের সৌন্দর্য তাঁহাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই কারণে তিনি পাশ্চাত্য দেবদেবীকে হিন্দু দেবদেবীর নামে নূতন করিয়া কাব্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। হিন্দু দেবদেবী ও পাশ্চাত্য দেবদেবীদের মধ্যে এই সমীকরণ প্রয়াসের মধ্যে কবির সমন্বয়মূলক মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য রক্ষিত হয় নাই। প্রসঙ্গত প্রখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য স্মরণীয়—"হিন্দু পুরাণ ও লোক সাহিত্যের দেব-

লীলায় দৃষ্টান্ত তিনি গ্রীক পুরাণের দেবদেবীগণের চরিত্রাদর্শে তাঁহার কাহিনীতে প্রতিফলিত করিতে সাহস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কল্পনা গ্রীক ও হিন্দু পুরাণের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই, অর্থাৎ গ্রীককে হিন্দু করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে মধুসূদনের কল্পনার পদস্খলনের আর একটি কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে তিনি ভাবিয়াছিলেন সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণ অর্থাৎ আমাদের ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শের দেবদেবী কথাকে বাংলার গ্রাম্য সাহিত্যের দেবদেবী উপাখ্যানের সহিত মিলাইয়া লইলেই, গ্রীক পুরাণ সমস্ত দেবদেবী চরিত্রকে সহজে বাংলার কাব্যভূমিতে রোপন করা যাইবে। কিন্তু ইহাতেই রসাভাস ঘটিয়াছে। গ্রীক ও সংস্কৃত দুই আদর্শ যেমন স্বতন্ত্র প্রাচীন; ভারতীয় ও খাঁটি বাংলা আদর্শও তেমনি স্বতন্ত্র। কালিদাসের কুমার সম্ভবের হরপার্বতী ও অন্যান্য দেবতা, খাঁটি হিন্দু সংস্কৃতি প্রসূত উৎকৃষ্ট কাব্যকল্পনার সৃষ্টি—তাহাদের মধ্যে যে মানবীয় গুণ আছে, তাহাতে হিন্দু ভাবুকতার বৈশিষ্ট্য জাজ্বল্যমান। গ্রীক দেবদেবীর উপাখ্যানের যে বিশিষ্ট কাব্য সৌন্দর্য আছে, মধুসূদন সেই রসে তাঁহার নব্য কল্পনাকে উজ্জল করিবার জন্য ঐ তিন আদর্শকে মিলাইতে গিয়া কল্পনায় সাম্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।"

মেঘনাদ বধ কাব্যের দেবদেবী চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদন বহুলাংশে হোমারকেই অনুসরণ করিয়াছেন। ভারতীয় দেবদেবীদের শান্ত ন্যায়পরায়ণ কল্যাণমুখী কাব্যাত্মক চরিত্রধর্মের পরিবর্তে গ্রীক দেবদেবীর উগ্র হিংস্র প্রতিশোধ-পরায়ণ ভোগী চরিত্রধর্ম হোমারের প্রভাবেই যে সৃষ্ট, তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গত ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণীয় "শিব উমা যেন জেউস হেরা। মহামায়া হোমারের আথেনার অনুরূপ। ইলিয়াদের আরেস মেঘনাদ বধের স্কন্দ। মেঘনাদের পরিণাম হেক্টরের পরিণামের মত। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের ব্যবহার কতকটা পাত্রোক্লোসের মৃত্যুতে আখিলেউসের এবং কতকটা হেক্টরের মৃত্যুর পর প্রিয়ামোসের অনুরূপ।"

সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোনার তরী : কাব্য পরিচয় : 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথের যৌবন-কালের কাব্যগ্রন্থ। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস হইতে ১৩০০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে এই কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে এই কাব্যটি প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যগ্রন্থ রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী দেখাশুনার কাজে শিলাইদহে বাস করিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি পদ্মাতীরে বোটে বাস করিতেন। এই সময়ই উন্মুক্ত গ্রামজীবন ও প্রকৃতির সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় ঘটে। বাংলার খরস্রোতা নদী, বনজঙ্গল, খালবিল, সাধারণ মানুষের সহিত নিবিড় সংযোগ তাঁহার চেতনায় গভীর পরিবর্তন আনিয়াছিল। তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন "বাঙলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয় অপরিচয়ের মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাঙলা দেশকে তো বলতে পারিনে অজানা দেশ ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে।"

কাব্যবৈশিষ্ট্য : 'সোনার তরী' রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশিষ্ট ফলশ্রুতি। শিলাইদহ বাসকালে কবি জগৎ ও জীবনের রূপ রস গন্ধ বর্ণ উপভোগে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য তাঁহার মানসলোকে যে বিচিত্র ভাবচেতনার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে 'সোনার তরী'র কবিতাগুলির মধ্যে। কবি প্রকৃতির রূপ রস আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য তাঁহার হৃদয়ের নিভৃতলোকে যে অনুভূতির উন্মেষ ঘটাইয়াছে, স্বকীয় উপলব্ধির আলোকে তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

'সোনার তরী'র কবিতাগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মানবপ্রেম এবং মর্ত্যপ্রেম বিষয়ক কবিতা। (২) বিশ্বজীবনের সহিত ঐক্যানুভূতিমূলক কবিতা। (৩) সৌন্দর্যচেতনাপূর্ণ কবিতা। (৪) উদ্দেশ্যপূর্ণ রূপকধর্মী কবিতা (৫) বিচিত্র বিষয়ক কবিতা।

মানবপ্রেম এবং মর্ত্যপ্রেম বিষয়ক কবিতাবলীর মধ্যে মানবের প্রতি গভীর প্রেম ও প্রত্যয়, প্রকৃতির প্রতি গভীর মমতার বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা, যেতে নাহি দিব, অক্ষমা, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ, মুক্তি, মায়াবাদ প্রভৃতি কবিতাগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বিশ্বজীবনের সহিত ঐক্যানুভূতিমূলক কবিতাগুলি মূলতঃ কবির বিশ্বানুভূতির প্রকাশ। দেশকালের সংকীর্ণ গণ্ডীসীমানার বাহিরে বৃহত্তর মুক্ত জীবনের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষার এই কবিতাগুলি আকর। যেতে নাহি দিব, সমুদ্রের প্রতি, বসুন্ধরা, ঝুলন প্রভৃতি কবিতায় কবির এই নানা ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

সৌন্দর্যচেতনাপূর্ণ কবিতাগুলির মধ্যে জগত ও জীবন সম্পর্কে কবি হৃদয়ের বিগূঢ় উপলব্ধি ও সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়াছে। সোনার তরী, মানস সুন্দরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা প্রভৃতি কবিতাগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দেশ্যমূলক রূপকধর্মী কবিতা হিসাবে হিং টিং ছট, বিম্ববতী, দেউল, আকাশের চাঁদ, পরশ পাথর প্রভৃতি কবিতাগুলিকে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। এই কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ এক একটি উপাখ্যান বর্ণিত হইলেও ইহাদের অন্তরালে তত্ত্বভাবনাটিও সুস্পষ্ট। বিশেষ কোন বক্তব্যের উদ্দেশ্যেই এই কবিতাগুলি রচিত ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

বিচিত্র বিষয়ক কবিতাবলীর মধ্যে পুরস্কার, বর্ষা যাপন, নদী পথে প্রভৃতি কবিতার নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল কবিতায় মধ্যে কবি বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এই পর্যায়ে কবিমনের মধ্যে লঘুভাব পরিলক্ষিত হয়। কবি যেন জগৎ ও জীবনের দুরূহ তত্ত্ব ও জটিলতার ভার হইতে মুক্তি লইয়া হালকা লঘু জীবনের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে চাহিয়াছেন।

ভূমিকা: ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনমাসে শিলাইদহ বাসকালে কবি 'সোনার তরী' কবিতাটি রচনা করেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দে 'সাধনা' পত্রিকায় কবিতাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি রচনা সম্পর্কে কবি একটি পত্রে লিখিয়াছেন "ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জল ভরতি কালো মেঘ আকাশের ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচা ধানে বোঝাই চাষাদের ডিঙি নৌকা হু হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে।"

ভাববস্তুসংক্ষেপ: মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অবিরত গর্জন ধ্বনি। প্রচণ্ড বারিবর্ষণ হইতেছে। কবি নদীকূলে একাকী উপবিষ্ট। দুকূল প্লাবিত নদী। কবি মনের মধ্যে কোন ভরসা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। রাশি রাশি ধান কাটা হইয়াছে। ধান কাটিতে কাটিতেই বর্ষা আসিয়া গিয়াছে। দ্বীপাকৃতি ক্ষেত্রে কবি নিঃসঙ্গ। তাঁহাকে ঘিরিয়া জলরাশি বক্ররেখায় খেলা করিতেছে।

নদীর অপর পারে দেখা যাইতেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম। প্রভাতের সূর্যালোক মেঘে ঢাকা। এই সময় তাহার চোখ পড়িল একটি নৌকার দিকে। নৌকার উপর মাঝি বসিয়া আছে। মুখে তাহার গান। সে নৌকা বাহিয়া তীরের

দিকেই অগ্রসর হইতেছে। মাঝিকে কেমন যেন চেনা মনে হয়। ঢেউগুলি দুই ধারে ভাঙিয়া পড়িতেছে। কবি মাঝিকে তীরে নৌকা ভিড়াইতে বলেন। সোনার ধান সে যেন নৌকায় তুলিয়া লয়। মাঝি কবির ডাকে সাড় দিয়া সোনার ধানের রাশি নৌকায় তুলিয়া লয়। ধানে ধানে নৌকা বোঝাই হইয়া গেল। সেখানে কবির আর স্থান হইল না। কবিকে সেই দ্বীপে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলিয়া নৌকা চলিয়া গেল।

শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনী

১ম স্তবক : গগনে—আকাশে। **গরজে**—গর্জন করে। **ঘন**—নিবিড়। **কূলে একা বসে আছি**—কবি নদীর নির্জন তীরে বসিয়া আছেন। **নাহি ভরসা**—বৃষ্টি থামিবার কোন লক্ষণ নাই। **ক্ষুরধারা**—ক্ষুরের মতো ধার যাহার। **ভরা নদী ক্ষুরধারা**—বর্ষার ভরা নদীতে তীব্র স্রোত। ক্ষুরের ধারে যেমন সবকিছু কাটিয়া যায়। তেমনি তীব্র নদীর স্রোতে সব কিছু ভাসিয়া যায়। **খর পরশা**—খরস্রোতা।

২য় স্তবক : একখানি ছোট খেত—একটি ছোট ক্ষেত্রে কবি যেন বন্দী হইয়া আছেন। বর্ষাকালে গ্রামবাংলায় দেখা যায়, ভরা নদীর পারে কৃষক ধানের আঁটি লইয়া নৌকার আশায় বসিয়া আছে। কবিও যেন তাঁহার কর্মকীর্তি লইয়া কাণ্ডারীর আশায় বসিয়া আছেন। **তরুছায়া মসীমাখা**—গাছের ছায়ায় যে অন্ধকার জমা হইয়াছে, তাহা যেন কালির মতো গ্রামখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

৩য় স্তবক : গান গেয়ে......উহারে—নদীর উপর দিয়া নৌকা বাহিয়া কে যেন আসিতেছে। কণ্ঠে তাহার গান। নিবিড় মেঘের আঁধারে অস্পষ্ট আলোকে তাহাকে চেনা চেনা মনে হইতেছে। এই মাঝি কবির জীবন দেবতা অথবা মহাকাল। তাই তাহাকে চেনা চেনা মনে হইতেছে।

৪র্থ স্তবক : ওগো......এসে—কবি কাণ্ডারীকে বলিয়াছেন যে সে কোথায় কোন বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। একবার যেন কূলে আসিয়া নৌকা ভিড়ায়। যেয়ো যেথা......কূলেতে এসে—কবি তাহার সারা জীবনের সোনার ফসল লইয়া আছেন। এই ফসল তিনি তুলিয়া দিতে চান কাণ্ডারীর হাতে। তাই তিনি তাহাকে ইহা লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন।

৫ম স্তবক : আর আছে ....ভরে—কবি তাহার সারা জীবনের কর্মকীর্তির ফসল কাণ্ডারীর নৌকায় তুলিয়া দিয়াছেন। আর দেবার মতো তাহার কিছুই নাই। থরে বিথরে—স্তরে স্তরে। এখন ....করে—কবির প্রার্থনা : কাণ্ডারী যেন তাহাকে তাঁহার নৌকায় স্থান দেয়। কবি তাঁহার কর্মকীর্তি মহাকালকে দান করিয়াছেন। এখন তাঁহার মনোগত বাসনা—মহাকাল যেন তাহাকেও স্থান দেয়।

ষষ্ঠ স্তবক : ঠাঁই নাই—স্থান নাই। আমারি......তরি—কবি নৌকার কাণ্ডারীকে যে সোনার ধানের রাশি দান করিয়াছেন, তাহাতেই নৌকা ভরিয়া গিয়াছে। সেখানে আর তাহার নিজের স্থান হয় নাই। ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে মহাকাল মানুষের কর্মকীর্তিকে গ্রহণ করে, কিন্তু মানুষকে গ্রহণ করে না। মানুষকে মৃত্যুর মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইতে হয়।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা

(১) গান গেয়ে তরী বেয়ে ......চিনি উহারে।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'সোনার তরী' কবিতা হইতে সংকলিত হইয়াছে। তরীর উপর উপবিষ্ট মাঝিকে দেখিয়া কবির মনে যে ভাব জাগিয়াছে, এই অংশে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

বর্ষার আকাশ মেঘের গর্জনে ধ্বনিত। অবিরত বারি বর্ষণ হইতেছে। কবি একাকী নির্জন নদীতীরে ক্ষেত্রের মধ্যে ধানের রাশি লইয়া আছেন। নদীর অপর পারে অন্ধকারে ঢাকা গ্রামখানি দেখা যাইতেছে। কবির চারদিকে বাঁকা জলরাশি খেলা করিতেছে। এই সময় তাঁহার চোখ পড়িল একজন মাঝির দিকে। মাঝি খরস্রোতা নদীর বুকে নৌকা চালাইয়া গান গাহিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অস্পষ্ট আলোকরেখায় তাহাকে চেনা চেনা মনে হইতেছিল।

কবি যে মাঝিকে দেখিয়াছেন, সেই মাঝি প্রকৃতপক্ষে কবির জীবনদেবতা। এই জীবনদেবতা কবির আত্মশক্তি; কবির সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণা। জীবনদেবতার অস্তিত্ব কবির অনুভূতিতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। অথচ তাঁহাকে তিনি তখনও পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন নাই। এইজন্যই 'যেন' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

(২) ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই......গেল সোনার তরী।

আলোচ্য অংশটি 'সোনার তরী' কাব্যের 'সোনার তরী' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে কবি-কর্তিত ধানের রাশি লইয়া মাঝির অন্তর্ধানের কথা বলা হইয়াছে।

বর্ষণমুখর প্রভাতে কবি বসিয়া আছেন নির্জন নদীতীরে। আকাশে মেঘের গর্জন। নদীর বুকে বক্র জলরাশির খেলা। নদীর অপর পারের গ্রাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কবির চোখ পড়িল নদীর বুকে একটি নৌকার উপর উপবিষ্ট মাঝির দিকে। মাঝি গান গাহিয়া নৌকা বাহিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কবি তাহাকে কাটা ধানের রাশি লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মাঝি তাহার নৌকায় ধানের রাশি লইয়া গেল। কিন্তু নৌকাখানি ছোট বলিয়া সেখানে তাঁহার স্থান হইল না। কবিকে নির্জন দ্বীপে একাকী রাখিয়া মাঝি নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।

কবি এখানে যে কাটা ধানের রাশির কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার কর্মকীর্তি। তিনি তাঁহার কর্মকীর্তিকে মহাকালের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আশা ছিল, তিনি স্বয়ং মহাকালের বুকে রক্ষিত হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূরণ হয় নাই। মহাকাল তাঁহার কর্মকীর্তিকে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই। মহাকাল শুধু মানুষের কীর্তিকে চিরদিনের জন্য অমর করিয়া রাখিয়া দেয়, মানুষকে সে কখনো অমরতা দান করে না। ব্যক্তি মানুষ তাঁহার নিকট তুচ্ছ। নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত কৃষকের মতো সে কীর্তিমান মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'সোনার তরী' কবিতাটির বিষয়বস্তু বিবৃত কর। অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিচার কর।

উত্তর। আকাশে মেঘ গর্জন করিতেছে। চারিদিকে অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ। কবি নদীকূলে একাকী বসিয়া আছেন। প্রচুর পরিমাণে ধান কাটা হইয়া গিয়াছে। বর্ষা আসিয়া গিয়াছে। বর্ষার অক্লান্ত বর্ষণে নদী ভরিয়া গিয়াছে। তীব্র স্রোতোধারায় দ্বীপাকৃতি ক্ষেতটির চারিদিকে উচ্ছ্বসিত জলকল্লোল সৃষ্টি করিয়াছে।

নদীর অপর পারে দেখা যাইতেছে তরুছায়া ঘেরা অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম। সেখানে প্রভাতের গায়ে মেঘের ছায়া। ক্ষেতের মধ্যে বসিয়া থাকা অবস্থায় কবির চোখ পড়িয়াছে যেন চেনা এক মাঝির দিকে। মাঝি গান গাহিয়া তরী বাহিয়া কূলের দিকে আসিতেছে। কোনদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। ভরাপালে নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে। ঢেউগুলি নদীর দুইধারে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

কবি মাঝিকে অনুরোধ করেন কূলে তরী ভিড়াইবার জন্য। রাশিকৃত সোনার ধান সে যদি নৌকায় তুলিয়া লয়, তবে তিনি আনন্দলাভ করিবেন। মাঝি কবির অনুরোধে সাড়া দিয়া ধানের রাশি তুলিয়া লয়। কবি যখন মাঝির নৌকায় নিজের স্থান করিয়া লইতে চান, তখন মাঝি তাহাকে না লইয়া নৌকা লইয়া চলিয়া যায়। কবির দেওয়া ধানে নৌকা বোঝাই হইয়া গিয়াছে, সেই নৌকায় তাহার স্থান হয় নাই। নির্জন নদীতীরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি পড়িয়া থাকেন। শ্রাবণের কৃষ্ণমেঘ তাহার একমাত্র সঙ্গী।

প্রশ্ন ২। 'সোনার তরী' কবিতাটির রূপক বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। রূপক কথাটির অর্থ রূপের আরোপ। অনেক ক্ষেত্রে কোন গূঢ় তত্ত্ব সহজভাবে না বলিয়া বিশেষ কোন সংকেত বা ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া বলা হয়। কোন বিষয়ের মধ্যে বিশেষ রূপের আরোপ রূপক হিসাবে আখ্যাত।

সোনার তরী কবিতাটিও সেই অর্থে রূপক। ইহার মধ্যে কবি নিগূঢ় একটি তত্ত্ব বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন। মহাকাল ও মানুষের কৃতকর্মের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য তিনি সোনার তরীর অবতারণা করিয়াছেন। সোনার তরীর মাঝি হইতেছে

মহাকাল, কৃষক হইল মানুষ, আর সোনার ধান বলিতে মানুষের কৃতকর্ম বুঝানো হইয়াছে। পৃথিবীর মানুষকে আমৃত্যু কাজ করিয়া যাইতে হয়। মহাকাল মানুষের কৃতকর্মগুলি গ্রহণ করিয়া রক্ষা করে, মানুষ যখন অমরত্ব প্রার্থনা করে। মহাকাল সে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় "হোমার, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, সেক্সপীয়ার, নেপোলিয়ান, আলেকজাণ্ডার, প্রতাপসিংহ প্রভৃতির কীর্তিকথা মহাকাল বহন করিয়া চলিতেছে; কিন্তু সেই সব কীর্তিমানদের রক্ষা করে নাই। যিনি প্রথম অগ্নি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যন্ত্র যানের দাঁত ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম ইতিহাস রক্ষা করে নাই। কিন্তু তাহাদের কীর্তি মানবসভ্যতার ইতিহাসে অমর হইয়া আছে।

কতিপয় কাব্য সমালোচক সোনার তরীর মাঝিকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। ঈশ্বর মানুষের সমগ্র জীবনের কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রার্থিত মুক্তি দেন না। এই অবস্থায় মানুষের মৃত্যু প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

ইহা ছাড়া সোনার তরীকে চিরন্তন অখণ্ড সৌন্দর্যও বলা হইয়াছে। মাঝি হইতেছে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মানুষ যদিও খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে অখণ্ড সৌন্দর্যকে অনুভব করে, তথাপি সীমার মধ্যে সেই অখণ্ড সৌন্দর্যকে পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। তাই শিল্পীর মনে জমিয়া ওঠে বিষণ্ণতা ও বেদনা। শুধু শিল্পীর নয়, সাধারণ মানুষের মনেও এই বেদনা সঞ্চারিত। মহৎ বৃহৎ সৌন্দর্য চেতনা মানুষের মনে মাঝে মাঝে আভাসিত হয়, মানুষ তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা সেই সৌন্দর্যকে অধিগত করিতে যাইয়া প্রায়শ ব্যর্থ হয় তখন এক বেদনাবিধুর ব্যাকুলতা মানবমনকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া তোলে। কবির ভাষায় "মানুষের এই একটি ব্যাকুলতা এই বেদনা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও এই ব্যথা আছে; আমাদের সেবা আমাদের প্রেম আমরা দিতে পারি, সেই সঙ্গে নিজেকে দিতে গেলেই সেটা বোঝা হইয়া পড়ে। আমরা প্রীতিদান করিব, কর্মদান করিব, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকেও চালাইতে যাইব না। ইহাই জীবনের শিক্ষা কারণ আমাকে চালাইতে গেলেই সেটা নিতান্ত অনাবশ্যক হয়, তাহাতে স্থান কুলায় না। সুতরাং যাহা ছিলাম, তাহার মূল্য কমিয়া যায়।"

বিশিষ্ট সমালোচক থমসন সাহেব 'সোনার তরী' কবিতার মাঝিকে জীবন দেবতা আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে "It is Jivan Devata entering his work, the genius of his life and effort Crossing the world stream in his Golden boat. The poem is haunted by a sense of transitoriness of life."

প্রশ্ন ৩। 'সোনার তরী' কবিতাটির নামকরণের তাৎপর্য বিচার কর।

উত্তর। 'সোনার তরী' কবিতার মধ্যে বর্ষণমুখর দিনের একটি রেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আকাশ মেঘের গর্জনে স্পন্দিত, প্রচণ্ড ধারাবর্ষণ হইতেছে।

কবি একাকী কূলে বসিয়া আছেন। প্রচুর পরিমাণে ধান কাটা হইয়াছে। বর্ষায় নদীর দুই কূল ভাসিয়া গিয়াছে। নদী খরস্রোতা। ক্ষুদ্রাকৃতি ক্ষেত্রের চারিধারে জল বক্ররেখায় খেলা করিতেছে।

নদীর অপরপারের গ্রাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। নির্জন নদীকূলে কবি একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসিয়া আছেন। এই সময় কে যেন তরী বাহিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মুখে তাহার গান। কবি তাহাকে ভালো করিয়া চেনেন না। ভরা পালে কোন দিকে না তাকাইয়া প্রচণ্ডবেগে সেই তরীখানি ছুটিয়া আসিতেছে। কবির আহ্বানে তরীখানি তীরে আসিয়া লাগে। তরীর মাঝি কবির সোনার ধানের রাশি তরীতে তুলিয়া লয়। কবি যখন সেই তরীতে স্থান লইতে চাহিলেন, তখন মাঝি জানাইয়া দিল "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী।"

মাঝি সোনার ধান লইয়া তরী বাহিয়া চলিয়া গেল। কবি একাকী নদী-তীরে পড়িয়া রহিলেন। তাহার সঙ্গী থাকিল শ্রাবণের মেঘ। তাহার যে সম্বল ছিল, তাহা লইয়া গেল সোনার তরী। "যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।" আলোচ্য কবিতায় কোন এক বর্ষণমুখর দিনে ধানের রাশি লইয়া কবির বসিয়া থাকা এবং আগন্তুক তরীর প্রত্যাশা করার চিত্রটি খুব স্পষ্ট এবং বাস্তবানুগ। ধানের মরশুমে ধান কাটিবার পর ধানের আঁটি লইয়া নদীর পারে নৌকার প্রত্যাশায় কৃষকের বসিয়া থাকিবার দৃশ্য গ্রামাঞ্চলে অতি সাধারণ পরিচিত দৃশ্য। দূর হইতে যখন কোন তরী ধীরে ধীরে তীরের নিকটবর্তী হয়, তখন কৃষকের মন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। কেন না সে ঐ তরীতে ধান পাঠাইতে পারিবে এবং সেই সঙ্গে নিজেও যাইতে পারে।

কিন্তু আলোচ্য কবিতায় কোন সাধারণ তরীর কথা বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে 'সোনার তরী'র কথা। এই 'সোনার তরী' একান্তভাবেই রূপকাশ্রিত। সোনার তরী বলিতে কবি মানুষের কর্মকীর্তিকে বুঝাইয়াছেন। ধানের রাশি লইয়া নদীর পারে বসিয়া থাকা কৃষক হইতেছে সংসারে কর্মরত সাধারণ মানুষ। সোনার তরীর মাঝি হইতেছে মহাকাল, সোনার ধান সৎকর্ম, ক্ষেত্র হইতেছে মানব জীবন ও সংসার। এই রূপকাশ্রিত কবিতার মধ্য দিয়া কবি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে মানুষ সংসারে বাস করিয়া নানা ধরণের কাজের মধ্যে দিন কাটায়। এই সংসারের যে শেষ কোথায়, তাহা সে জানে না। কৃষক যেমন মাঠের মধ্যে ধান কাটিয়া যায়, মানুষও তেমনি সংসারে কাজ করিয়া যায়। কৃষক যেমন তরীর প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে, মানুষও তেমনি সংসারকে তাহার কর্মরাশি এবং সেই সঙ্গে নিজেকে দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। সংসার তাহার কর্ম-রাশি গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাকে গ্রহণ করে না। অন্ধকার মৃত্যুর মধ্যে মানুষের জীবনে সমাপ্তি নামিয়া আসে। কবি নিজেও এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকে চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে, তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে

জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাত দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনমতেই জমাবার জিনিস নয়।" সুতরাং আলোচ্য কবিতায় মানুষের কর্মকীর্তি সুন্দর ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সোনার তরী নামকরণ সার্থক ও যথার্থ হইয়াছে।

প্রশ্ন ৪। 'সোনার তরী' কবিতার মর্মার্থ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। 'সোনার তরী' কবিতার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন কালপ্রবাহে মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন। মানুষ তাহার কর্মের মধ্য দিয়া সংসারকে মূল্যবান সম্পদ দান করিতেছে। এই দানের সঙ্গে সে নিজেকেও দান করিতে চায়। কর্মের সঙ্গে সঙ্গে সেও সংসারে নিজের অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চায়। ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষার করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে সংসারের নির্মম প্রত্যাখ্যানে। সংসার তাহার কর্মটুকুই শুধু গ্রহণ করে, তাহাকে গ্রহণ করে না। সংসারে মানুষের কর্মটুকুই শুধু বাঁচিয়া থাকে, মানুষ বাঁচিয়া থাকে না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না, কিন্তু মানুষ সেইসঙ্গে অহংকে যখন চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনমতে জমাবার জিনিস নয়।"

নিরুদ্দেশ যাত্রা

ভূমিকা—'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের—সর্বশেষ কবিতা। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ এই কবিতাটি রচিত হয়।

'সোনার তরী' কবিতা রচনার সহিত ইহার কালগত ব্যবধান দুই বছরের। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় কবিতায় সোনার তরীর উল্লেখ আছে। প্রকৃতির পটভূমিকায় কবিদ্বয়ের নিগূঢ় উপলব্ধিতে উভয় কবিতাই সমৃদ্ধ। তবে ভাবসাদৃশ্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে পার্থক্য এই যে সোনার তরী কবিতায় সোনার তরীতে কবির স্থান হয় নাই, কিন্তু নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতায় সোনার তরীতে কবির স্থান হইয়াছে। এই বিচারে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটিকে 'সোনার তরী' কবিতার পরিপূরক কবিতা বলা যায়।

ভাব-বস্তুসংক্ষেপ—সোনার তরীতে বসিয়া আছে সুন্দরী কাণ্ডারী। কবি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে সে আর কতদূর কবিকে লইয়া যাইবে। কোন্ পারে সে তাহার সোনার তরীখানি ভিড়াইবে। কবি যখনই তাহাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তখন সে শুধু মৃদু মৃদু হাসে, কোন উত্তর দেয় না। আঙুল তুলিয়া সে উত্তাল সিন্ধু তরঙ্গ দেখাইয়া দেয়, কখনো বা দূরে পশ্চিমে অস্তযান সূর্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কবি তাহার মনের কথা বুঝিতে পারেন না। সুন্দরী কাণ্ডারী কোন্ দিকে কি কারণে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, বা তিনি কিসের—অন্বেষণে কোথায় চলিয়াছেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন না।

দিনের শেষ আলো সন্ধ্যার কূলে যেন চিতা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, জলরাশি তরল আগুনের মতো ঝলমল করিতেছে, আকাশের তলদেশ যেন গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। দিকবধূদের আঁখি যেন অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া ছলছল করিতেছে। কবির জিজ্ঞাসা: ওখানে কি সেই সুন্দরী কাণ্ডারীর নিবাস? কিংবা সে কি ঊর্মিমুখর সাগর পারে অথবা মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে বাস করে? সুন্দরী কাণ্ডারী কবির জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর না দিয়া নীরবে হাসে।

বাতাস সর্বদা হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। জলোচ্ছ্বাস অন্ধ আবেগে গর্জন করিতেছে। সাগরের জল গাঢ় নীলিমায় আচ্ছন্ন। কোন দিকে তাকাইয়া তীর দেখা যায় না। পৃথিবী ব্যাপিয়া যেন ক্রন্দনের প্লাবন। তাহার উপর দিয়া সোনার তরী ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার উপর পড়িয়াছে সন্ধ্যার শেষ আলোক-রেখা। সুন্দরী কাণ্ডারী তাহার মাঝে বসিয়া নীরবে হাসিতেছে কেন, তাহা কবি বুঝিতে অক্ষম। তাহার এইরূপ লীলা বিলাসের কারণও কবি বুঝিতে পারেন না।

প্রথম কৈশোরের এই সুন্দরী কাণ্ডারী কবিকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে তিনি তাহার সঙ্গে যাইবেন কি না। কবি কোন কথা না বলিয়া নীরবে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। কাণ্ডারী সমুখপানে কর প্রসারিত করিয়া

দেখাইল, পশ্চিমদিকে অসীম সাগর জলরাশির মধ্যে চঞ্চল আলো আশার মতো কাঁপিতেছে।

কবি সোনার তরীতে উঠিয়া কাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন : এখানে কি নবীন জীবন আছে? এখানে কি সোনার ফলে আশার ফসল ফলে?

ইহার পর কখনো মেঘ উঠিয়াছে, কখনো বা সূর্যের আলোকে চারিদিক ঝলমল করিয়াছে। কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো বা শান্ত ছবি। বেলা বহিয়া যায়, পালে বাতাস লাগিয়া সোনার তরী ভাসিয়া চলিয়া যায়। পশ্চিমে সূর্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়ে। এখন আবার কাণ্ডারীর নিকট কবির প্রশ্ন : ওখানে কি স্নিগ্ধ মৃত্যু আছে? ওখানে কি শান্তি আছে? কিংবা গভীর সুপ্তি? কাণ্ডারী কথা না বলিয়া শুধু হাসিল।

এখনি রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিবে। সন্ধ্যার আকাশ স্বর্ণ আলোকে ঢাকা পড়িবে। বাতাসে সুন্দরী কাণ্ডারীর দেহসৌরভ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। জলকলরব কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। তাহার কেশরাশি বাতাসে ভাসিয়া কবির গায়ে পড়িতেছে। তাঁহার হৃদয় বিকল, শরীর বিবশ। অধীর হইয়া যদি তিনি তাহাকে নিকটে আসিতে বলেন, সে হয়তো নিকটে আসিবে না। তাহার হাসিও তিনি দেখিতে পাইবেন না।

শব্দার্থ টীকাটিপ্পনী

হে সুন্দরী—'সুন্দরী' বলিতে এখানে কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর কথা বলা হইয়াছে। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী অখণ্ড সৌন্দর্যের প্রতীক—ইনি বিশ্বের কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের ধ্যানের ধন। ইঁহাকে পূর্ণরূপে উপভোগ আকাঙ্ক্ষায় সকলেই ব্যাকুল। **ওগো বিদেশিনী**—এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী যেহেতু পার্থিব ভোগের অতীত, তাই তাহাকে 'বিদেশিনী' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। **তুমি হাস ······মনে**—কবি যখন তাঁহার গন্তব্যস্থল বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুন্দরীর কাছে জানিতে চান, তখন সুন্দরী নীরবে হাসেন। **অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি**—সমুদ্রের কোন কূল কিনারা নাই। তাঁহার সমস্ত ঢেউগুলির মধ্য দিয়া যেন এক অব্যক্ত আকুলতা প্রকাশিত হয়। এই ঢেউগুলির মধ্যে কবি আপন হৃদয়ের প্রতিফলন দেখিয়াছেন। **ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা**—দিনের বেলায় সূর্যকিরণে চারিদিক থাকে উজ্জ্বল। সন্ধ্যার আবির্ভাবে দিনের যেন মৃত্যু হয়। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা যেন দিনের চিতার আগুন। **গলিয়া পড়িছে অম্বরতল**—আকাশ যেন গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। আকাশকে এখানে জীবন্ত সত্তারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। **ঊর্মিমুখর সাগরের পার**—সাগরের পারে অসংখ্য ঢেউ ভাঙিয়া পড়িতেছে। ঢেউয়ের গর্জনে সাগরের তীর মুখরিত। **মেঘচুম্বিত অস্তগিরির**—দিনের শেষে সূর্য অস্তগিরির শিখরে অস্ত যায়, তাই সেই অস্তগিরি এত উচ্চ যে তাহা আকাশকে স্পর্শ করে, কবি এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। **অন্ধ আবেগে করে গর্জন জলোচ্ছ্বাস**—সমুদ্রের নীল জলরাশি অবিরত গর্জন করিতেছে। কবি কল্পনা করিয়াছেন, কি এক অন্ধ আবেগে জলরাশির এই অশান্ত গর্জন। **সংশয়ময় ঘন নীল নীর**—সমুদ্রের

জলরাশি নীল। কবির হৃদয়ের গভীর সংশয় যেন জলরাশিকে নীল করিয়া তুলিয়াছে। **তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ**—সমুদ্রের নীল জলরাশির উপর সোনার তরী ভাসিয়া চলিয়াছে। কবি কল্পনার এই দৃশ্যটি অনায়াস কাব্যব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে। **আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার বিলাস হেন**—কবি বারবার সুন্দরী নারীর কাছে তাঁহার গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু সুন্দরী কোন উত্তর দেন নাই। তাঁহার এই বিচিত্র আচরণ কবির নিকট বিলাস বা প্রমোদ মনে হইয়াছে। **যখন প্রথম……নবীনে প্রাতে**—কবির কৈশোরকালে এই সুন্দরী নারী তাঁহার জীবনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ কবিজীবনের প্রারম্ভেই ইনি কবির ধ্যানকল্পনায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। **চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে**—সমুদ্রের জলে অস্তগামী সূর্যের আলো পড়িয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ইহা যেন কবিহৃদয়ের চঞ্চল আশার প্রতিফলন। কবির মনে আশা জাগিতেছে, সুন্দরী বোধহয় তাঁহাকে সবকিছু বলিবেন। **আছে কি হেথায় নবীন জীবন** কবি প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সুন্দরী যেখানে তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন, সেখানে কি তিনি নূতন জীবনের স্বাদ পাইবেন। নূতন ভাবনায় কাব্যজীবন শুরু হইবে। **আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে**—কবি প্রশ্ন করিয়াছেন তিনি মনের মধ্যে পূর্ণ সৌন্দর্যোপভোগের যে আশা লইয়া যাইতেছেন, তাহা কি সফল হইবে? তিনি কি অখণ্ড সৌন্দর্যকে ভোগ করিতে পারিবেন। **কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো শান্ত ছবি**—সমুদ্রের জলরাশি যেন কবিহৃদয়ের প্রতিফলন। কখনো তাহা শান্ত আবার কখনো কি এক অশান্ত আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল। **বেলা বয়ে যায় পালে লাগে বায়**—কবি কৈশোর হইতে যৌবনে আসিয়াছেন। অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। এখন কি ঘটিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। **পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে**—পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তাচলের পথে চলিয়া পড়িয়াছে। কবির জীবনও যেন সমাপ্তি সীমানায় চলিয়া আসিয়াছে। **সোনার তরণী কোথা চলে যায়**—সুন্দরী নারী কবিকে লইয়া সোনার তরীতে ভাসিয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সোনার তরী কোন এক নিরুদ্দেশের পথ ধরিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে কিছুই জানা নাই। **আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমিরতলে**—কবি তাঁহার গন্তব্যস্থান সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সুন্দরী তাঁহাকে লইয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিয়াছেন। কবির তাই জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, যেখানে যাত্রা শেষ হইবে সেখানে কি শান্তি আছে, অথবা আছে গভীর অন্ধকারের মধ্যে চিরসুপ্তির নীরবতা। **আঁধার রজনী …পাখা**—সমুদ্রের বুকে রাত্রি নামিবে যেন অন্ধকারের পাখায় ভর দিয়া, অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে। **সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ আলোক পড়িবে ঢাকা**—সন্ধ্যার আকাশে সূর্যের সোনালী আলোকধারা ঢাকা পড়িয়া যাইবে। অনিশ্চিত ব্যর্থতার মধ্যে কবির স্বর্ণোজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। **শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ**—কবি অন্ধকারে সুন্দরীকে দেখিতে পাইতেছেন না। শুধু তাঁহার দেহের সুরভি তাঁহার চেতনায় ধরা পড়িয়াছে। **গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি**—সুন্দরীর অপূর্ব কৃষ্ণকেশরাশি

বাতাসের দোলায় উড়িতেছিল। বিকল হৃদয় বিবশ শরীর……করুহ পরুশ নিকটে আসি—কবি সুন্দরীর সহিত পূর্ণ মিলনের ব্যর্থতার অস্থির। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরও তিনি সুন্দরীকে অখণ্ড চেতনায় ধরিতে পারিলেন না, ধ্যানের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহমন যেন বিবশ বিকল। তিনি সুন্দরীর নিকট আকুল আবেদন জানাইয়া বলিয়াছেন, তিনি যেন তাঁহার নিবিড় সান্নিধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরকে তৃপ্ত করেন।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা

(১) যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী……তোমার মনে।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। সোনার তরীর সুন্দরী কাণ্ডারীর অব্যক্ত মনোভাব সম্বন্ধে এখানে বলা হইয়াছে।

কৈশোরকালে কবি এক অপরিচিতা সুন্দরী কাণ্ডারীর সহিত সোনার তরীতে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দিবার জন্য। সোনার তরীকে সুন্দরী কোন্ দিকে পরিচালিত করিবে, কোন পারে সোনার তরী ভিড়িবে, তাহা কবি বুঝিতে পারেন না। এ সম্পর্কে যখনই তিনি সেই অপরিচিতা বিদেশিনীকে প্রশ্ন করেন, তখন কোন উত্তর না দিয়া সে নীরবে হাসিতে থাকে। কবি এই বিদেশিনী নারীর মনোভাব কিছুই জানিতে পারেন না।

সোনার তরীর এই রহস্যময়ী বিদেশিনী প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সে কবির অন্তরবাসিনী শক্তিরূপিণী। ইহার প্রভাবে কবির হৃদয়ে নবনব সৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত হয়। কবি এই সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অখণ্ড চেতনায় মধ্যে উপলব্ধি করিতে চান, কিন্তু এই উপলব্ধি সহজে আসে না বলিয়াই কবি বিভ্রান্ত হইয়া যান। অথবা সৌন্দর্য লক্ষ্মীকে তিনি পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন না বলিয়াই হৃদয়ে তাঁহার বিষণ্ণতার মেঘরাশি জমা হয়।

(২) কোথায় কি আছে আলয় তোমার……কথা না বলে।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সৌন্দর্য লক্ষ্মীর অবস্থান সম্বন্ধে কবির মনে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, এই অংশে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

কৈশোরে কবি সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত সোনার তরীতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়েন। এই দেবী যে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। নূতন কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তিনি ব্যাকুল। সুন্দরী কর্ণধারের নিকট তিনি গন্তব্যস্থান সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন। কর্ণধার তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে। কবির মনে অপরিচিতা সুন্দরী নারীর আবাসস্থল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। দিনের শেষ আলোর রেখা সমুদ্রের জলে প্রতিফলিত হইতেছে। মনে হইতেছে উহা যেন দিনের চিতা। অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোকধারা সমুদ্রের উপর প্রতিফলিত

হওয়ায় মনে হইতেছে তরঙ্গ অগ্নিরাশি আকাশকে স্পর্শ করিয়াছে। দিকবধূরা অশ্রুধারায় ছলছল আঁখি। সুন্দরী কাণ্ডারীর বাসস্থান কোথায় তাহা কবি জানিতে চান। সে কি তরঙ্গমুখর সাগরের পারে অথবা মেঘচুম্বিত পাহাড়ের পাদদেশে বাস করে? কাণ্ডারী কবির জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না দিয়া মধুর হাসি হাসিতে থাকে।

কবি বর্ণিত এই সুন্দরী কাণ্ডারী অখণ্ড সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতীক। কবি এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী সম্বন্ধে সব কিছু জানিতে চান। তাহাকে পূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে উপভোগ করিতে চান। কিন্তু তাহাকে অখণ্ডরূপভাবে উপভোগ করিতে না পারিয়া তাঁহার মন অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অবস্থান সম্বন্ধে কোন ধারণাই তিনি পান না।

(৩) তরীতে উঠিয়া শুধাবু ·····কথা না বলে।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। সোনার তরীর সুন্দরী কাণ্ডারীর নিকট কবির জিজ্ঞাসা এই অংশে ব্যক্ত হইয়াছে।

জীবনের কৈশোরলগ্নে কবি সোনার তরীর সুন্দরী কাণ্ডারীর সহিত নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন। এই সুন্দরী কাণ্ডারী সম্পর্কে কবির মনে নানা জিজ্ঞাসা। সুন্দরী কাণ্ডারীর আচার-আচরণ রহস্যময়। সে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহাও তিনি জানেন না। তাহার গন্তব্যস্থান সম্পর্কেও তাহার মনে কোন ধারণা নাই। কাণ্ডারীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন উত্তর না দিয়া সম্মুখে কর প্রসারিত করিয়া দেখাইয়া দেয় পশ্চিমদিকে অসীম সাগরের পানে। সেখানে জলের উপর চঞ্চল আলো আশার মতো কম্পমান। কবি তরীতে উঠিয়া জানিতে চাহিলেন: সেখানে কি নবীন জীবন আছে, কিংবা সেখানে কি সোনার ফলে আশার স্বপন ফলে? সুন্দরী কাণ্ডারী কোন উত্তর না দিয়া মৃদু হাসে।

কবি বর্ণিত এই সুন্দরী কাণ্ডারী অখণ্ড সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতীক। অখণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে তাহার অধিষ্ঠান। কবি তাঁহার কৈশোর জীবন লগ্নে এই অখণ্ড সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যানে তন্ময় হইয়াছিলেন। তাহাকে অখণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যেই অনুভব করিতে চাহিয়াছিলেন। অখণ্ড সৌন্দর্যোপলব্ধির মধ্যেই জীবনের সার্থকতা আছে কিনা, তাহা তিনি জানিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ইহার সদুত্তর তিনি পান নাই। সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অখণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে অনুভব করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

(৪) এখন বারেক শুধাই······কথা না বলে।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুন্দরী কাণ্ডারীর নিকট কবির জিজ্ঞাসা এই অংশে ব্যক্ত হইয়াছে।

জীবনের কৈশোর লগ্নে কবি অপরিচিতা সুন্দরী কাণ্ডারীর সহিত সোনার তরীতে চড়িয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুন্দরী কাণ্ডারীর যথার্থ

পরিচয় তাঁহার জানা নাই। সে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহা কবি জানেন না। সুন্দরী কাণ্ডারীর অবস্থানও রহস্যময়। এ সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে শুধু মধুর হাসি হাসিয়াছে, কোন উত্তর দেয় নাই। কবি শুধু অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার বাসস্থান কোথায়। সে কি উর্মিমুখর সাগরের পারে কিংবা মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে বাস করে? সুন্দরী কাণ্ডারী সম্মুখে কর প্রসারিত করিয়া পশ্চিমপানে অসীম সাগর দেখাইয়া দিলে কবির মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল: ওখানে কি নবীন জীবনের অস্তিত্ব আছে? কিংবা ওখানে কি সোনার ফলে আশার স্বপ্ন ফলবতী হয়? কবির মনের প্রশ্ন মনেই রহিয়া যায়। সোনার তরী শুধু অকূলে ভাসিয়া যায়। তখন কবির মনে মৃত্যু ভাবনা জাগিয়াছে। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষে কি স্নিগ্ধ মৃত্যুর ইসারা অথবা অনাবিল শান্তির অস্তিত্ব? সম্মুখে যে গভীর অন্ধকার রাত্রি, তাহার মধ্যে কি সুপ্তির সংকেত? কাণ্ডারী কোন উত্তর না দিয়া নীরবে হাসিতে থাকে।

কবি বর্ণিত এই সুন্দরী কাণ্ডারী প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতীক—কবির কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা। কবি তাহার ইঙ্গিতে কাব্যসৃষ্টি করেন। কাব্য জীবনের আবির্ভাবলগ্নে কবির মনে অখণ্ড সৌন্দর্যোপভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে এই সম্পর্কে সংশয় জাগিয়াছে। পূর্ণরূপে সৌন্দর্যসম্ভোগ সম্ভব হইবে না, এই সংশয়ে তাঁহার মন বেদনাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। মনে জাগিয়াছে মৃত্যুভাবনা।

(৫) বিকল হৃদয় বিবশ...... নীরব হাসি।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অংশে সুন্দরী কাণ্ডারী সম্পর্কে কবির মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

কবি তাঁহার জীবনের কৈশোরলগ্নে সোনার তরীর সুন্দরী কাণ্ডারীর সহিত নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার গন্তব্যস্থান যে কোথায়, তাহা তিনি জানেন না।

সুন্দরী কাণ্ডারীর বাসস্থান সম্পর্কেও তাঁহার কোন ধারণা নাই। কাণ্ডারীকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু হাসির রেখা। কবির মনে সংশয়ের মেঘ জমিতে থাকে। সোনার তরী অন্ধ আবেগে ভাসিয়া চলে। কবি ভাবেন, এই নিরুদ্দেশ যাত্রা পরিণামে কি আনিয়া দিবে। সাফল্য অথবা ব্যর্থতা? তিনি কি তাঁহার অভীষ্টলাভ করিবেন অথবা ব্যর্থতার হাহাকারে বিদীর্ণ হইবেন? সংশয়ের মধ্যে মৃত্যুভাবনাও মনে জাগিয়াছে। সুন্দরী কাণ্ডারীর কাছে তাঁহার মন নৈরাশ্যপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। উর্মিমুখর সমুদ্রের উপর দিয়া সোনার তরী ভাসিয়া চলিয়াছে। সুন্দরী কাণ্ডারীর দেহসৌরভ কবিকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার হৃদয় বিকল, শরীর বিবশ। তাঁহার স্পর্শলাভের জন্য কবির হৃদয় অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

কবি বর্ণিত এই সুন্দরী কাণ্ডারী প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতীক। কবি এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যানে তন্ময়। ইহাকেই তিনি তাঁহার কাব্যজীবনের

অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া মনে করেন। কৈশোরলগ্নে তিনি ইহারই নির্দেশে তাঁহার কাব্যজীবন সুরু করিয়াছিলেন, এখন বর্তমান কাব্যজীবনও তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত করিতে চান।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উত্তর। 'ভাববস্তুসংক্ষেপ' লিখ।

প্রশ্ন ২। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। (কঃ বিঃ ১৯৭৪)

উত্তর। 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির মধ্যে কবি এক সুন্দরী অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীর সহিত তাঁহার অজ্ঞাত সমুদ্রপথে নিরুদ্দেশ যাত্রার ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই অপরিচিতার সহিত তিনি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করিয়াছেন, তাঁহার গন্তব্যস্থান কোথায়, কিম্বা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য কি, বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার কোন উত্তর পান নাই। সেই রহস্যময়ী সুন্দরী নারী নীরবে শুধু হাস্য করিয়াছেন। কবি তাঁহার সঙ্গে শুধু পথ পরিক্রমা করিয়াছেন। তাঁহার মনে বারবার ধ্বনিত হইয়াছে একই প্রশ্ন "কী আছে কোথায় / চলেছি কিসের / অন্বেষণে।"

সুন্দরী অপরিচিতার রহস্যময় আচরণে তাহার মনে হইয়াছে, যে ইহার বাস বোধহয় "উর্মিমুখর সাগরের পার" কিংবা মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে।" কবির বারংবার জিজ্ঞাসার উত্তরে সুন্দরী কোন কথাই বলেন নাই। শুধু নীরবে হাসিয়াছেন। কবির মনে জমা হইয়াছে সংশয়ের মেঘচ্ছায়া। কৈশোর হইতে যৌবন একইভাবে অতিবাহিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে চারিদিকে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। সেই অন্ধকার রহস্যময়ী নারীকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। কবির চেতনায় শুধু তাঁহার দেহের সুরভি, কেশরাশির মদির স্পর্শ।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার এই সুন্দরী নারী প্রকৃতপক্ষে অনন্ত সৌন্দর্যময়ী বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি সৌন্দর্যলক্ষ্মী। বিশ্বের শিল্পী কবি সাহিত্যিক সমাজ এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যানে বিভোর, তাঁহাকে লাভ করিবার, কাব্যের মধ্যে তাঁহাকে সার্থকরূপে প্রকাশ করিবার বাসনায় তাঁহারা উদ্বেল। রবীন্দ্রনাথও এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সাধনায় মগ্ন। অখণ্ড সৌন্দর্যকে আপন চেতনায় পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি দুর্মর। ইহা তাঁহার নিকট এক পবিত্র আকাঙ্ক্ষা। একটি পত্রে কবি এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন "সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন, গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী।" কবি তাঁহার সমগ্র কাব্য জীবন সাধনায় এই অখণ্ড সৌন্দর্যকে হৃদয়ের মধ্যে ধরিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু হায়, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ও অন্বেষণেও তিনি আপন উপলব্ধির মধ্যে পূর্ণরূপে তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। অধরা সৌন্দর্যদেবী অধরাই রহিয়া গেলেন। বস্তুত আপন চেতনার মধ্যে অখণ্ড সৌন্দর্যকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা কিংবা আ ন

ধ্যানের মধ্যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পরিপূর্ণ আবাহন কোনরূপেই সম্ভব নয়, এবং এই অপূর্ণতাই স্রষ্টার মানসলোককে বেদনাবীর্ণ করিয়া তোলে। তাঁহার মনের মধ্যে জাগাইয়া তোলে মৃত্যুর ইঙ্গিত যাহা সম্ভবত কবিজীবনের সমাপ্তিরেখারই ইশারা "স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়। আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমিরতলে।"

আলোচ্য কবিতার মধ্যেও কবি-হৃদয়ের সৌন্দর্য উপভোগের আকুলতা এবং পূর্ণরূপে তাহা অপ্রাপ্তির বেদনা প্রতিছত্রে করুণভাবে ঝরিয়া পড়িয়াছে। অখণ্ড সৌন্দর্যকে কবি আপন উপলব্ধির মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া পান নাই। হৃদয়ের ভাবকে অনন্ত সৌন্দর্যময়তার মধ্যে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই, এই বেদনাই তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে বারবার প্রকাশিত হইয়াছে।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার এই সুন্দরী অপরিচিতা রহস্যময়ী নারী 'সোনার তরী' কবিতার কাণ্ডারী। কবি এই সুন্দরী নারীর প্রতি নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিতে তিনি পরিচালিত হইয়াছেন, তাঁহার নিজস্ব সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য বলিয়া যেন কিছুই নাই। সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার মানসেই তাঁহার এই নিঃশেষ আত্মনিবেদন। এই আত্ম-নিবেদনের মধ্যেই তিনি তাঁহার জীবনের সার্থকতা খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিশ্বের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবিদের মতো শাশ্বত সৌন্দর্যের সার্থক প্রকাশ তাঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। খণ্ড খণ্ড রূপের মধ্যে সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যে তিনি কোন তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, অখণ্ড সৌন্দর্যোপলব্ধির মধ্যেই তাঁহার কবি জীবনের চরম তৃপ্তি ও সার্থকতা। তাই তিনি তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্যই বারবার সৌন্দর্য দেবীর সহিত মানসভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে মোহময় আশার রাগিনী ধ্বনিত হইয়াছে, এইবার তিনি বোধহয় তাঁহার অভিপ্সীত সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিবেন, এইবার বুঝি তাঁহার সহিত তাঁহার পূর্ণ মিলন হইবে।

কিন্তু সৌন্দর্যলক্ষ্মী পূর্ণরূপে কখনো তাঁহার নিকট ধরা দেন নাই। শুধু মদির স্পর্শ, ব্যাকুল সুরভি ও মধুর হাসির দাক্ষিণ্য দিয়াই তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে চাহিয়াছেন। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর এই আচরণ কবিকে বেদনাবিধুর করিয়া তুলিয়াছে। সৌন্দর্যোপভোগের অতৃপ্তি ও বেদনা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে, কবি-জীবনের এক অশান্ত অসম্পূর্ণতা তাঁহাকে উদ্বেল করিয়াছে। কবিহৃদয়ের অতৃপ্ত হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস আলোচ্য কবিতার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া ইহার বিষয়বস্তুকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রশ্ন ৩। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় বিদেশিনী সুন্দরী অপরিচিতা নারীর রূপকে কবিকল্পনার কোন্ নিগূঢ় অভিপ্রায় ব্যঞ্জিত হয়েছে? এই মধুরহাসিনী রহস্যময়ীর নীরব হাসির তাৎপর্যই বা কী?

(কঃ বিঃ ১৯৮১)

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কাব্য 'সোনার তরী'র অন্তর্গত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার মধ্যে কবি কল্পনার নিগূঢ় অভিপ্রায় বিশেষভাবে ব্যক্ত করা

হইয়াছে। আলোচ্য কবিতার কবি এক অপরিচিতা সুন্দরী রহস্যময়ী নারীর রহস্যময় আচরণের মাধ্যমে তাঁহার কবিজীবনের সার্থকতা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করিয়াছেন। কবি প্রথম কৈশোরের উষালগ্নে এই অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীর সহিত সমুদ্রপথে সোনার তরীতে নিরুদ্দেশের পথে ভাসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গন্তব্যস্থান কোথায়, কিংবা এই অপরিচিতা রহস্যময়ী তাঁহাকে কতদূরে লইয়া যাইবে, তাহা তিনি কিছুই জানেন না। যতবার তাঁহাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন, ততবারই রহস্যময়ী তাঁহাকে কোন উত্তর না দিয়া মধুর নীরব হাস্য করিয়াছেন।

মাঝে মাঝে কবির মনে জাগিয়াছে ঘোর সংশয়, সাগরের অশান্ত জলরাশির মধ্যে তিনি যেন আপন অশান্ত হৃদয়ের বিক্ষুব্ধ আলোড়নই দেখিতে পাইয়াছেন। মাঝে মাঝে জলের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের আশার ছবিও তিনি দেখিতে পাইয়াছেন।

ধীরে ধীরে জীবন বেলা অতিক্রান্ত হয়। কবি কৈশোর হইতে যৌবন সীমানায় পদার্পণ করেন। সাগর জল কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত। সোনার তরী পাল তুলিয়া ছুটিয়া চলে নিরুদ্দেশের পথে। কবির মনে প্রশ্ন জাগে :

আছে কি শান্তি, আছে কি তৃপ্তি
তিমির তলে ?

কিন্তু সুন্দরী নারী ইহার কোন উত্তর দেন না—

হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না বলে

ধীরে ধীরে অন্ধকার রাত্রি নামিয়া আসে। সন্ধ্যার আলোকাভাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই অন্ধকারে সেই রহস্যময়ী নারীর বদন যেন অদৃশ্য হইয়া যায়। বাতাসের দোলায় তাঁহার কৃষ্ণকেশরাশি উড়িয়া আসে। কবির চিত্ত হয় বিকল, দেহ হয় বিবশ। তিনি কামনা করেন সেই নারীর নিবিড় স্পর্শ—

কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না,
নীরব হাসি।

কবি বর্ণিত এই রহস্যময়ী সুন্দরী নারী প্রকৃতপক্ষে কবির সৌন্দর্যলক্ষ্মী। ইনিই বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কবি বিশ্বসৌন্দর্যকে একটি নারীমূর্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রকৃতি ও মানবের দেহমনের সমস্ত সৌন্দর্য যেন এক-স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া একটি নারী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই কেন্দ্রীভূত সৌন্দর্য-সাধনাই তাঁহার মানসসুন্দরী। 'বিশ্বসৌন্দর্যের প্রবল ও আবেগময় অনুভূতি কবির আশৈশব কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস, সেই সৌন্দর্যময়ী রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার মন কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিরূপে—তাঁহার কবিতারূপে প্রকাশ পাইয়াছে।'

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র মধ্যে কবি যে সৌন্দর্যময়ী অপরিচিতা নারীর কথা বলিয়াছেন, সেই নারী কবির বিশ্বসৌন্দর্যবোধের প্রতীক। ইহা তাঁহার প্রবল সৌন্দর্যানুভূতির উদগ্র প্রকাশ। 'এই অত্যুগ্র সৌন্দর্য অনুভূতি কবি জীবনকে এমনভাবে গ্রাস করিয়াছে যে কবি তাঁহার নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা বুঝিতে পারিতেছেন না। ' এই অনুভূতি যেন একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লইয়া তাঁহার ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া তাঁহাকে খেলার পুতুলের মতো চালিত করিতেছে। তাঁহার জীবন, তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাবচিন্তা কর্ম কিছুই যেন তাঁহার নয়, সমস্তই তাঁহার সমগ্র জীবনের অধীশ্বরী এই অনুভূতির আত্মপ্রকাশ। এই সৌন্দর্যানুভূতিই রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি বা কবি প্রেরণার মূল উৎস।'

কবি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীর মাধ্যমে তাঁহার অভিপ্সীত সৌন্দর্য উপভোগ ও প্রকাশ আকাঙ্ক্ষাকেই মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই রহস্যময়ী নারী এক প্রবল আকর্ষণে কবিকে অজানা ভবিষ্যতের দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবিকে নবনব রূপ উপভোগ করাইতে করাইতে নবনব রস পান করাইতে করাইতে, জীবনের অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করিয়াছে—এ যাত্রার পরিসমাপ্তি কোথায়—এ অভিযানের সাফল্য কোথায় কবি তাহা জানেন না—তবুও সম্মোহিত অবস্থায় মৌনহাসিনী অপরিচিতার আহ্বানে তাঁহার নিকট ধরা দিয়াছেন।'

আলোচ্য কবিতায় কবিকল্পনায় এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী এক অপূর্ব রস ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হইয়াছেন। 'উপাসনায় জীবনে কোন বস্তুগত লাভের বাসনা বা কোন আশা আকাঙ্ক্ষার সাফল্য কামনা নিরর্থক—কবির এ প্রশ্নের উত্তর কেবল সৌন্দর্যদেবীর নীরব হাসি; সৌন্দর্যের আহ্বান নিরন্তর জীবনে আসিতেছে—সে আহ্বান জীবনে বরণ করিয়া লইতে হইলে, তাঁহার নিকট সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—জীবনে মেঘ ও রৌদ্র, মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া লাভালাভ ত্যাগ করিয়া সেই বস্তু নিরপেক্ষ সৌন্দর্যসেবাকেই একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে—'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় ইহাই যেন কবির একটা ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। এই সে স্বর্ণময়ী কবির 'সোনার তরী'র কবিতায় রহস্যময়ী মাঝি বা কাণ্ডারী, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় রহস্যময়ী অপরিচিতা সুন্দরী নারী —পরবর্তীকালে ইনিই কবির 'জীবন-দেবতা' বা 'লীলা সঙ্গিনী'তে রূপান্তরিত হইয়াছেন যাহার সম্পর্কে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন "জীবনদেবতা সেটা ফিজিক্যাল দেবতা।" "যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে সমস্ত ঘটনার ঐক্যদান, তাৎপর্য দান করিতেছে, আমার রূপান্তর—জন্ম জন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে—যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছিলাম।"

প্রশ্ন ৪। 'সোনার তরী' কবিতার সহিত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটিকে 'সোনার তরী'র পরিপূরক কবিতা বলা যায় কিনা আলোচনা কর।

উত্তর। 'সোনার তরী' কবিতার সহিত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার ভাবগত

সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'সোনার তরী' কবিতার মধ্যে কবি তাঁহার অখণ্ড সৌন্দর্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি অখণ্ড সৌন্দর্য পিয়াসী। জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে যে সৌন্দর্য খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়াইয়া আছে, কবিচিত্ত তাহাতে তৃপ্তি পায় না। কবি সৌন্দর্যকে অখণ্ডতার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে চান। তাই তিনি সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'মাঝি' বা 'কাণ্ডারী'র কল্পনা করিয়াছেন। 'সোনার তরী'র কাণ্ডারী হইতেছে তাঁহার আরাধ্য অখণ্ড সৌন্দর্যের দেবী। তাঁহাকেই তিনি অন্তরের মধ্যে আহ্বান জানাইয়াছেন—

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে—
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার মধ্যেও কবিহৃদয়ের সেই একই অখণ্ড সৌন্দর্য উপভোগ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। কবি 'সোনার তরী' কবিতায় যাহাকে অপরিচিত কাণ্ডারী বলিয়াছেন, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় তাহাকে 'সুন্দরী' 'বিদেশিনী' বলিয়াছেন। অখণ্ড সৌন্দর্য বুঝাইবার জন্যই 'সুন্দরী' বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। কবি তাঁহার কবি জীবনের উন্মেষলগ্নে এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর কথা ভাবিয়াছিলেন। অখণ্ড সৌন্দর্যকে আপন ধ্যানের মধ্যে লাভ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাই ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বলো কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী ?

কবি অখণ্ড সৌন্দর্য উপভোগে তাঁহার কাব্য জীবনের সার্থকতা খুঁজিতে চাহিয়াছেন। কবি জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার আশা ছিল, অখণ্ড সৌন্দর্য উপভোগের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার কাব্যসৃষ্টিকে অমরতা দিতে পারিবেন—

তরীতে উঠিয়া শুধাতু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে ?

কবির এই আশা ফলবতী হয় নাই। মানব মনে অখণ্ড সৌন্দর্য উপভোগ আকাঙ্ক্ষা যতই প্রবল হোক না কেন, তাহা কখনো সার্থকতা মণ্ডিত হয় না। অখণ্ড সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া অখণ্ডের স্পর্শ লাভ কোনদিনই তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে না।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটিকে 'সোনার তরী' কবিতার পরিপূরক বলা যায়। 'সোনার তরী'র কাণ্ডারী ছিল অস্পষ্ট রহস্যময়। কবি তাঁহাকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই বা তাঁহার চেহারা তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় মধ্যে কবি সোনার তরীর কাণ্ডারীকে 'সুন্দরী' ও 'বিদেশিনী' বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন।

ইহা ছাড়া 'সোনার তরী' কবিতায় কবি 'সোনার তরী'তে স্থান পান নাই। কাণ্ডারী তাহার সোনার ধান লইয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহাকে তরীতে গ্রহণ করেন নাই। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় দেখা যায়, 'সোনার তরী'তে কবির স্থান হইয়াছে। তিনি সোনার তরীতে উঠিয়া সুন্দরী কাণ্ডারীর সহিত নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন। সুতরাং 'সোনার তরী'তে কবিভাবনা যেটুকু অসম্পূর্ণ ছিল, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় তাহাই পূর্ণতা পাইয়াছে।

যেতে নাহি দিব

ভূমিকা।— যেতে নাহি দিব' কবিতাটির সহিত কবির ব্যক্তি জীবনের বিষণ্ণ স্মৃতি বিজড়িত। রবীন্দ্রমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ব্যক্তি জীবনের অসংখ্য ঘটনাকে অপূর্ব সাহিত্যরূপ দান করিয়াছেন 'যেতে নাহি দিব' অনুরূপ একটি কবিতা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কবি জমিদারী দেখাশুনার কাজে সপরিবারে শিলাইদহে বাস করিতেন। পূজাবকাশে তিনি কলিকাতায় আসিয়া মাস দুয়েক কাটাইয়া যান। ইতিমধ্যে স্থির হয়, কবি পত্নী মৃণালিনী দেবী পুত্রকন্যাদের লইয়া যাইবেন সোনাপুরে তাঁহার মা আনন্দময়ী দেবীর নিকট রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসিয়া তাঁহাদের যাত্রার ব্যবস্থা করেন পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে কবির জ্যেষ্ঠ কন্যা চারি বৎসর বয়স্ক মাধুরীলতার মনে যে বেদনা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই কবিকে এই কবিতা রচনার প্রেরণা দান করিয়াছে।

ব্যক্তি জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কবি বিশ্বজনীন স্নেহমায়া মমতা ঘেরা জগতের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। সমগ্র পৃথিবী যেন তাহার বুকের উপর সব কিছুকে নিবিড় মমতার সহিত ধরিয়া রাখিতে চায়। পৃথিবী মাতার মেহে সব কিছুকে চিরদিন তাহার বুকের কাছে রাখিয়া দিতে চায়। কোন কিছুকে সে ছাড়িতে চায় না। কিন্তু মহাকাল সব কিছুকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর বুক হইতে মহাকাল সবকিছু ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। পৃথিবী বিষণ্ণ চোখে সবকিছু দেখিতেছে। তাহার কিছুই করণীয় নাই। স্নেহ মায়া মমতা ঘেরা এই জগৎ এবং মৃত্যুর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচ্য কবিতায় নতুন এক ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে।

উৎস ও রচনাকাল।—'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি রচিত হইয়াছে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্তিক। ইংরাজি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর। ইহা

প্রথমে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'যেতে নাহি দিব' কবিতার মধ্যে কবির প্রতি তাঁহার চারি বছর বয়সের শিশু-কন্যার স্নেহমমতা ভরা মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কবি পূজার ছুটির শেষে কর্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহার স্ত্রী তাহার যাত্রার আয়োজন করিতেছেন। বিদায় গ্রহণের সময় হইলে কবি তাঁহার স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার শিশুকন্যার কাছে বিদায় চাহিলেন। তাঁহার শিশুকন্যা দ্বার-প্রান্তে বসিয়া ছিল। সে বলিল 'যেতে নাহি দিব'। সে কবিকে যাইতে দিতে না চাহিলেও সময় হইলে কবিকে চলিয়া যাইতে হইল। পথে চলিতে চলিতে তিনি কন্যার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন বিশ্বচরাচরে সেই অনাদিকাল হইতে 'যেতে নাহি দিব' ধ্বনি শোনা যাইতেছে। কেহই কাহাকে যাইতে দিতে চাহে না। পৃথিবী নিবিড় মমতায় তাহার বুকের উপর সব কিছুই ধরিয়া রাখিতে চায়। ক্ষুদ্র একটি তৃণকেও সে চিরতরে নিজের বুকের উপর রাখিয়া দিতে চায়। কিন্তু কোন কিছুই সে ধরিয়া রাখিতে পারে না। পরাজিত হইয়া ম্লান মুখে বিষণ্ণ অন্তরে সে বসিয়া থাকে। মানুষ প্রেমের বন্ধনে তাহার প্রিয়জনকে ধরিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু সে চাওয়া শুধু ব্যর্থ চাওয়া। মৃত্যু আসিয়া প্রিয়জনকে ছিনাইয়া লইয়া যায়। সমগ্র কবিতার মধ্যে স্নেহ মায়া প্রেম প্রীতি ঘেরা জগতের করুণ আকুতি ব্যক্ত হইয়াছে। নামকরণের মধ্যে মূল বিষয়টি ব্যঞ্জিত হওয়ায় নামকরণ সঙ্গত হইয়াছে।

সারসংক্ষেপ।—বেলা তখন দ্বিপ্রহর। দুয়ারে গাড়ি প্রস্তুত। হেমন্ত ঋতুর রৌদ্রের তেজ ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে। পল্লীপথ জনশূন্য। মধ্যাহ্ন বাতাসে ধূলা উড়িয়া যাইতেছে। ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পড়িয়া স্নিগ্ধ অশথের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। শুধু কবির ঘরে বিশ্রামের কোন নিদ্রা নাই।

আশ্বিন মাস চলিয়া গিয়াছে। পূজার ছুটির শেষে তাঁহাকে বহুদূর দেশে সেই কর্মস্থানে চলিয়া যাইতে হইবে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হইয়া দড়াদড়ি লইয়া জিনিসপত্র বাঁধিবার কাজে ব্যস্ত। এ ঘরে ও ঘরে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি চলিতেছে। কবির গৃহিণীর চক্ষু ছলছল। তাঁহার বক্ষে বেদনাভার। কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনায় কাঁদিবার সময় তাঁহার নাই। বিদায়ের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া ফিরিতেছেন। অবিরত তিনি বোঝা বাড়াইয়া চলিতেছেন। কবি বলেন যে এত ঘট, পট, হাঁড়ি সরা বিছানা লইয়া তিনি কি করিবেন। ইহার কিছু কিছু তিনি রাখিয়া যাইবেন। তাঁহার এই কথায় কেহ কর্ণপাত করে না। কবির গৃহিণী বলেন যে কবি বিদেশে যাইতেছেন। কখন কোন সময় কি দরকার হয়। তখন কোথায় পাওয়া যাইবে। তিনি কবির জন্য সোনামুগ, সরু চাল, সুপারি, পান, গুড়ের পাটালি, ঝুনা নারিকেল, আমসত্ত্ব, আমচুর, ওষুধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়াছেন। বারবার তিনি কবিকে এগুলি খাইতে বলিয়াছেন।

যাবার সময় হইলে কবি পত্নীর কাছে বিদায় চাহিলেন। কবি-পত্নী মুখখানি ফিরাইয়া চোখের উপর বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া অলক্ষ্যে অশ্রুজল গোপন করিলেন।

দ্বারের কাছে কবির চারি বছরের কন্যা বসিয়া ছিল। অন্যদিন এতক্ষণ তাহার স্নান সারা হইয়া যাইত। খাদ্য মুখে তুলিতে না তুলিতে তাহার চোখে ঘুম নামিয়া আসিত।

আজ আর তাহার মাতা তাহাকে দেখে নাই। এত বেলা হইয়া গিয়াছে। তাহার স্নানাহার হয় নাই। এতক্ষণ সে কবির কাছে থাকিয়া বিদায়ের আয়োজন দেখিতেছিল। এখন শ্রান্তদেহে দ্বারের বাহিরে বসিয়া ছিল। কবি যখন কন্যার কাছে বিদায় চাহিলেন, তখন সে বলিল যে সে তাহাকে যাইতে দিবে না। সে কবির হাতও ধরিল না, দ্বারও বন্ধ করিল না। শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার প্রচার করিল। কবিকে সে যাইতে দিবে না। কিন্তু তবু হায়, এক সময় বিদায় দিতেই হয়।

কবি গন্তব্যস্থানে যাইতে যাইতে কন্যার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যে কন্যা কোথা হইতে কি শক্তি পাইয়া এমন কথা বলিতে পারিল। সে কাহাকে তাহার ছোটো ছোটো দুই হাতে ধরিয়া রাখিতে পারিবে? বুক ভরা স্নেহ সম্বল করিয়া দ্বার প্রান্তে বসিয়া সে কাহার সঙ্গে সংগ্রাম করিবে? এখানে ব্যথিত হৃদয় হইতে বহু লজ্জা ভয়ে মর্মের প্রার্থনাই শুধু ব্যক্ত করা চলে। কিন্তু এ প্রার্থনায় কেহ কান দেয় না। শিশু পিতাকে যাইতে দিতে চাহে নাই, অথচ সংসার তাহাকে লইয়া গেল। সে পরাজিত হইয়া দুই চোখে জল লইয়া দ্বারের কাছে বসিয়া রহিল।

কবি পথ চলিতে চলিতে দুইধারে দেখিতে পাইলেন শরতের শস্যক্ষেত্র শস্যভারে নত হইয়া রৌদ্র পোহাইতেছে। রাজপথ পাশে বৃক্ষরাজি উদাসীনভাবে দাঁড়াইয়া আপন ছায়ার পানে তাকাইয়া আছে। শরতের ভরা গঙ্গা খরবেগে বহিতেছে। সদ্যজাত গোবৎস যেমন মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া সুখে নিদ্রা যায়, নীল আকাশের বুকে শুভ্র খণ্ডমেঘ তেমনি শুইয়া আছে। কবি রৌদ্রপ্লাবিত দিগন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর পানে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী যেন গভীর দুঃখে মগ্ন। কবি যতদূর যাইতেছেন, সর্বত্র যেন শোনা যাইতেছে সেই 'যেতে নাহি দিব' কথাটি। পৃথিবী ও নীল আকাশের বুক হইতে চিরকাল ধরিয়া ওই একই ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে 'যেতে নাহি দিব'।

তৃণ অতিশয় ক্ষুদ্র। কিন্তু পৃথিবী যেন তাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া বলে: 'যেতে নাহি দিব'। নির্বাপিত প্রায় দীপশিখাকে কে যেন অন্ধকারের গ্রাস হইতে টানিয়া রাখিয়া বলে 'যেতে নাহি দিব'। স্বর্গমর্ত্য ব্যাপিয়া সেই পুরাতন কথা: 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু হায় সকলকেই যাইতে দিতে হয়। কেহই কাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

আজ কবির কর্ণে অবিশ্রান্তভাবে বিশ্বের সেই মর্মভেদী ক্রন্দন কন্যার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইতেছে। শিশুর মতোই যেন বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরিয়া যে যাহা পাইতেছে, তাহাই হারাইতেছে। তথাপি তাহার মুষ্টি এখনও শিথিল হইল না। বিশ্ব এখনও কবির সেই চারি বছরের কন্যার মতো সমানে বলিয়া চলিয়াছে 'যেতে নাহি দিব'। প্রেমিকা তাহার প্রিয়জনকে ছাড়িতে চায় না: কিন্তু

বারবার তাহার পরাজয় ঘটে। তথাপি সে বিদ্রোহী কণ্ঠে বলে, 'যেতে নাহি দিব'। যতবার তাহার পরাজয় হয়, ততবার বলে যে সে যাহাকে এত গভীর ভাবে ভালোবাসে, সে কি তাহার কাছ হইতে দূরে চলিয়া যাইতে পারে। তাহার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে প্রবল আর কিছুই নাই। তাই সে গর্বভরে বলে 'যেতে নাহি দিব'।

কিন্তু হায়, ঠিক সেই সময়ই তাহার আদরের ধন চলিয়া যায়। অশ্রুধারায় তাহার দুই চোখ ভাসিয়া যায়। ছিন্নমূল তরুর মতো সে পৃথিবীর বুকে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাতেও তাহার অহংকার যায় না। সে বলে যে সে বিধাতার স্বাক্ষরিত চির অধিকার লিপি পাইয়াছে। তাই সে তাহার কোমলতা লইয়া মৃত্যুর মুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলে : 'মৃত্যু তুমি নাই'।

মৃত্যুপীড়িত সেই প্রেমের অমৃতধারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বিশ্বময় ছড়াইয়া রহিয়াছে আশাহীন শ্রান্ত আশা। কবির আজ শুধু মনে হয়, দুইখানি অবোধ বাহু পৃথিবীকে যেন নিষ্ফল বন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

কবি আজ তরুর মর্মর ধ্বনিতে গভীর ব্যাকুলতায় ক্রন্দন শুনিয়াছেন। মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিথ্যাই শুষ্ক পত্র লইয়া খেলা করে। ধীরে ধীরে বেলা চলিয়া যায়। বিশ্বের প্রান্তর মাঝে অনন্তের বাঁশী মেঠো সুরে বাজিতে থাকে। বসুন্ধরা যেন এলোচুলে গঙ্গার কূলে বসিয়া আছেন। তাঁহার নয়নযুগল স্থির, মুখে তাঁহার কোন ভাষা নাই। কবি দেখিলেন যে, তাঁহার চারি বছরের কন্যার ম্লান মুখের মুখের মতো বসুন্ধরার মুখখানিও ম্লান স্তব্ধ মর্মাহত।

শব্দার্থ ও টীকা-টিপ্পনী

হেমন্তের ···প্রখর—হেমন্ত ঋতুর স্নিগ্ধ রৌদ্র ক্রমশ তীব্র হইয়া উঠিতেছে। **স্নিগ্ধ অশ্বত্থের····· পড়েছে**—দ্বিপ্রহরের একটি সুন্দর রেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় ভিখারিণী ক্লান্ত দেহে তাহার মলিন জীর্ণ কাপড় পাতিয়া শুইয়া আছে। **যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি······ঘুম**—বেলা দ্বিপ্রহর কবির নিকট 'রৌদ্রময়ী রাত্রি' রূপে প্রতিভাত। রাত্রিকালে সকলে যেমন নিদ্রা যায়, বেলা দ্বিপ্রহরে সকলে তেমনি নিদ্রা যাইতেছে। রাত্রিকালের নিস্তব্ধতা দিবাভাগে বিরাজমান। শুধু কবির ঘরেই কাহারও চোখে ঘুম নাই।

গিয়েছে আশ্বিন ··· কর্মস্থানে—কবির কর্মস্থান কোন দূরদেশে। তিনি পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিয়া স্ত্রী-কন্যার সহিত কয়েকদিন আনন্দে কাটাইয়া গেলেন। এখন আবার সেই দূর দেশে যাইতেছেন কাজে যোগ দিতে।

ব্যথিছে বক্ষের···· তরে—কবির গৃহিণীর মন স্বামীর সহিত আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনের মধ্যে যেন পাষাণের ভার। কিন্তু যেহেতু তিনি স্বামীর জিনিসপত্র সব গোছগাছ করিয়া দিতেছেন, তাই তাঁহার কাঁদিবার সময়টুকু পর্যন্ত নাই।

যথেষ্ট না ·····বোঝা—কবির গৃহিণী জিনিসপত্রের বোঝা শুধু বাড়াইয়া তুলিতেছেন। কিন্তু কোন কিছুই তাঁহার নিকট যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না। তাঁহার মনে হইতেছে আরো দেওয়া দরকার।

সোনামুগ .... গুড়ুবিন্দু—কবি তাঁহার কর্মস্থানে যাত্রা করিতেছেন। তাঁহার সহিত দেওয়া হইতেছে সোনামুগ, সরুচাল, সুপারি, পান, গুড়ের পাটালি ঝুনা নারিকেল, আমসত্ত্ব, আমচুর, মিঠাই, ওষুধ প্রভৃতি নানা ধরনের জিনিস এ সব জিনিস যদিও সর্বত্রই পাওয়া যায়, তথাপি কবি-গৃহিণী স্বামীর জন্যে সবকিছু দিয়া দিতেছেন।

বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্য ব্যয়—কবি গৃহিণী প্রচুর জিনিসপত্র সঙ্গে দিতেছেন। কবি বুঝিলেন যে তাঁহাকে এখন যুক্তি দিয়া বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। তিনি যদি যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে এগুলি লইতে অসুবিধা হইবে, তাহার গৃহিণী সেকথা বুঝিবেন না।

অমনি ফিরায়ে..... গোপন—কবি তাঁহার পত্নীর কাছে বিদায় চাহিলেন। তাঁহার পত্নীর চোখে জল আসিল। কিন্তু পাছে সেই চোখের জল স্বামীর অমঙ্গল ডাকিয়া আনে, তাই চোখের উপর আঁচল টানিয়া তিনি চোখ ঢাকিলেন।

বাহিরে দ্বারের ...ঘুমে—বাহিরে দ্বারের কাছে কবির চারি বছরের কন্যা বসিয়া ছিল। অন্যদিন এতক্ষণ তাহার স্নান সারা হইয়া যাইত। তাহার মা তাহাকে দুটি খাওয়াইতে না খাওয়াইতে তাহার চোখে ঘুম নামিয়া আসিত।

এতক্ষণ ছায়া প্রায় ... বিদায়ের আয়োজন—এতক্ষণ সে কবির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরিতেছিল। কবির কাছে বসিয়া সে তাঁহার বিদায়ের আয়োজন দেখিতেছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাঁহার পিতা একটু পরেই বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবে।

কহিনু যখন 'মাগো .... তোমায়'—যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে কবি যখন তাঁহার কন্যাকে বলিলেন 'মা, এবার তবে আসি', তখন তাঁহার কন্যা ম্লানমুখে বিষন্ন চোখ তুলিয়া বলিল, 'তোমায় আমি যেতে দিব না'।

যেখানে আছিল বসে .... তোমায়—কবির কন্যা যেখানে বসিয়া ছিল, সেখানেই বসিয়া রহিল। সে একবারও উঠিয়া আসিয়া পিতার হাত ধরিল না, বা দরজা বন্ধ করিয়া দিল না। সে শুধু পিতার কাছে নিজের ভালোবাসার অধিকার জানাইয়া চুপ করিয়া রহিল। ইহার বেশী সে কিছু করিল না। **তবুও সময়.... ..দিতে হেল**—কবির কন্যা কবিকে যাইতে দিতে চাহে নাই। কিন্তু বাস্তব বড় নিষ্ঠুর। যাবার সময় হইলে কবিকে কন্যার ম্লানমুখ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে হইল।

চরাচরে .... বুকভরা স্নেহ—কবির কন্যা অবোধ। তাহার আছে শুধু বুক ভরা ভালোবাসা। এই ভালোবাসা লইয়া সে পিতাকে ধরিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু তাহার কতটুকু শক্তি যে সে প্রিয়জনকে ধরিয়া রাখিবে। নিষ্ঠুর বাস্তব নিজের প্রয়োজনে তাহার প্রিয়জনকে টানিয়া লইয়া যাইবে। **মর্মের প্রার্থনা ·· ···দিব**—এই জগতে শুধু হৃদয়ের প্রার্থনা স্বাক্ষই করা যায়, শুধু মুখ দিয়া বলা যায় যে যাইতে দেবার ইচ্ছা নাই। আর অন্য কিছুই করা যায় না।

শুনি তোর শিশুমুখে... ..মুছিয়া নয়ন—কবির কন্যা গর্ব করিয়া বলিয়াছিল পিতাকে যে সে তাঁহাকে যাইতে দিবে না'। কিন্তু এই কথা বলিয়া পিতাকে সে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। সংসার তাহার পিতাকে নিজ কাজে টানিয়া

লইয়া গেল। কন্যা পরাজিত হইয়া দ্বারপ্রান্তে বসিয়া রহিল। কবি চোখের জল মুছিয়া চলিয়া আসিলেন।

চলিতে চলিতে ·· পোহাইতেছে—কবি পথ চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন, চারিদিকে শস্যক্ষেত্রে শস্য পাকিয়া আছে। শস্যক্ষেত্র যেন অলসভাবে রোদ পোহাইতেছে।

শুভ্র খণ্ডমেঘ......শুয়ে—সদ্যোজাত সুন্দর গোবৎস যেমন মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া মাতার কোলের কাছে সুখে নিদ্রা যায়, শরতের শুভ্র মেঘের খণ্ড যেন নীল আকাশের কোলে সুখে ঘুমাইয়া আছে।

দীপ্ত রৌদ্রে......নিশ্বাস—দিগন্ত বিস্তৃত পৃথিবী যেন যুগ যুগান্তের ক্লান্তি লইয়া পড়িয়া আছে। সেই দিকে চাহিয়া কবি দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

চলিতেছি যতদূর......নাহি দিব—কবি যতদূর গেলেন, তাহার কানে বাজিতে লাগিল সেই 'যেতে নাহি দিব' ধ্বনি। পৃথিবীর বুক হইতে সেই ধ্বনি যেন আকাশের প্রান্ত সীমায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চিরকাল সেই ধ্বনি শোনা যাইতেছে 'যেতে নাহি দিব'।

তৃণ ক্ষুদ্র ··দিব—মাতা বসুমতী তাহার প্রতিটি সন্তানকে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। তৃণ অতি ক্ষুদ্র এবং নগণ্য। কিন্তু বসুমতী সেই তৃণকেও যেন বক্ষে বাঁধিয়া রাখিতে চায়।

আয়ুক্ষীণ দীপমুখে···নিব-নিব—দীপ শিখার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাই তাহা নিভিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

চারিদিক হতে......কন্যা কণ্ঠস্বরে—চারিদিক হইতে কবি করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছেন। সেই ক্রন্দন যেন বিশ্বের মর্মভেদ করিয়া উঠিতেছে। কবির কন্যা বলিয়াছিল, 'যেতে নাহি দিব', সেই যাইতে না দিবার আকুতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শিশুর···মূর্তি—পৃথিবীও যেন শিশুর মতো অবোধ। চিরকাল ধরিয়া যাহা কিছু সে পাইতেছে। তাহাই সে হারাইতেছে। এত হারাইবার পরও তাহার বুকের ধনকে টানিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

তবু অবিরত ·····দিব—পৃথিবীতে প্রেমের বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া রাখে। প্রেমের শক্তি তীব্র। প্রেমিকা প্রেমিককে প্রেমের বন্ধনে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিতে চায়। তাই সেও কবির চারি বছরের কন্যার মতো প্রেমের গর্বে বলে 'যেতে নাহি দিব'।

ম্লানমুখ......পরাভব—প্রেমিকা প্রেমিককে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। সংসার তাহার প্রেমিককে টানিয়া লইয়া যায়। প্রেমিকা ম্লানমুখে চোখে জল লইয়া পড়িয়া থাকে। পদে পদে তাহার গর্ব টুটিয়া যায়। তথাপি তাহার প্রেমের গর্ব পরাজিত হয় না।

তবু বিদ্রোহের......পারে—প্রেমিকা তাহার প্রেমিককে ধরিয়া রাখিতে পারে না। বাস্তব সংসারের আবর্তে তাহার প্রেমিক কোথায় হারাইয়া যায়। কিন্তু তথাপি সে পরাজয় স্বীকার করে না। কণ্ঠে বিদ্রোহের ভাব লইয়া আসিয়া

সে বলে যে সে যাহাকে প্রাণ দিয়া গভীরভাবে ভালোবাসে, সে কি কখনো তাহাকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারে।

আমার আকাঙ্ক্ষা……কিছু আছে আর—প্রেমই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। প্রেমের চেয়ে বড় শক্তি কিছুই নাই, ইহাই প্রেমিকার ধারণা। তাই সে ভাবে, তাহার আকাঙ্ক্ষার মতো এমন আকুল, এমন প্রবল শক্তি বিশ্বে আর কিছু নাই।

তখনি দেখিতে……ধন—প্রেমিক যখন তাহার প্রেমের গর্বে তাহার প্রেমিক কিংবা প্রিয়জনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, তখনই সংসার তাহার প্রেমিককে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। প্রেমিক হতাশ নয়নে দেখিতে পায়, তাহার আদরের ধন শুষ্ক তুচ্ছ ধূলির মতো কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

অশ্রুজলে……নতশির—প্রিয়জন চলিয়া গেলে প্রেমিকার দুই চোখ জলে ভরিয়া যায়। মূল কাটিয়া ফেলিলে গাছ যেমন মাটিতে পড়িয়া যায়, সেও তেমনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে থাকে।

তবু প্রেম বলে লিপি—বাস্তব সংসারের হাতে পরাজিত হইয়াও প্রেমের গর্ব দূর হয় না। সে বলে যে সে বিধাতার নিকট হইতে আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে। বিধাতা তাহাকে প্রেমের শক্তি দিয়াছেন। প্রেমিকের সহিত তাহার মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সে যাহাতে প্রেমিকের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে, বিধাতা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তাই স্ফীতবুকে……নাই—বারবার নিষ্ঠুর সংসারের হাতে মার খাইয়াও প্রেমিকার গর্ব যায় না। তাই সে বক্ষ স্ফীত করিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলে যে মৃত্যুর অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। প্রেমের অমৃতে সে মৃত্যুকে জয় করিবে।

মৃত্যু হাসে বসি—প্রেমিকার গর্বের কথা শুনিয়া মৃত্যু যেন হাসে। কেন না মৃত্যু তো জানে, সে প্রয়োজন মতো সবকিছু ছিনাইয়া আনিবে।

মরণ পীড়িত সেই……সংসার—মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে প্রেমকে তাড়না করিয়া ফিরিতেছে, তথাপি প্রেম চিরকাল মানুষের হৃদয়ে বাঁচিয়া আছে। মৃত্যুভয় সম্মুখে রাখিয়াও মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, মানুষের জন্য তাহার হৃদয়ে স্নেহমমতার অন্ত নাই।

বিষণ্ণ নয়ন……চিরকম্পমান—মৃত্যুর ভয় সমস্ত সংসারকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে তাহার প্রিয়জনকে হারাইবার ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপে।

আশাহীন……বিষময়—মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, স্নেহ করে, প্রতিটি মুহূর্তে স্নেহ দিয়া প্রিয়জনকে কাছে রাখিতে চায়। কিন্তু এই আশা কখনও পূরণ হয় না। পৃথিবী ব্যাপিয়া যেন এক নৈরাশ্যের বিষণ্ণ কুয়াশা কেহ ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

আজি যেন……তব সকাতর—কবির মনে হইতেছে দুইখানি অবুঝ বাহু যেন বিশ্বকে নিবিড় মমতায় জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। কিন্তু হায়, বারবার তাহার বাহুর বন্ধন খুলিয়া যাইতেছে।

চঞ্চল স্রোতের ......মায়া—চঞ্চল স্রোতে একটি ছায়া স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে। মনে হয়, অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন মেঘের সে মায়া।

তাই আজ ......ব্যাকুলতা—কবি তরুর মর্মরধ্বনির মধ্যে বিচ্ছেদের করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছেন।

অলস ঔদাস্যভরে ......লয়ে—দুপুরবেলায় তপ্ত বায়ু যেন শুষ্ক পত্র লইয়া নিবিড় মমতায় খেলা করে। শুষ্ক পত্রকে বায়ু যেন ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারে না। শুষ্ক পত্র কোথায় উড়িয়া যায়।

মেঠো সুরে ......বাজে—বিশ্বের প্রান্তরের মাঝখানে অনন্তের উদাসী বাঁশী বাজিয়া চলিয়াছে মেঠো সুরে।

শুনিয়া উদাসী ......টানি দিয়া—অনন্তের বাঁশী শুনিয়া মাতা বসুন্ধরার মন যেন উদাস হইয়া গিয়াছে। তিনি চুল খুলিয়া বসিয়া আছেন বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের মাঝে গঙ্গার ধারে। দেহের উপর দিয়া রৌদ্রে তিনি যেন টানিয়া দিয়াছেন রৌদ্র পীত স্বর্ণ অঞ্চল। **দূর নীলাম্বরে**—দূর নীল আকাশে। **দেখিলাম ...মতো**—মাতা বসুমতী সবদা বিষণ্ণ মুখে বসিয়া থাকেন। মহাকাল তাঁহার বুক হইতে সব কিছু ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি অসহায়ভাবে ম্লান মুখে তাকাইয়া আছেন। প্রিয়জনকে ধরিয়া রাখিবার কোন উপায় তাঁহার নাই। কবির চোখে বসুমতীর ম্লানমুখ তাঁহার চারি বছর বয়সের কন্যার মুখের সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা

(১)

কহিলাম ধীরে,
'তবে আসি'। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কবি পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণের পর তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, এখানে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

পূজার ছুটিতে কবি গৃহে আসিয়া পত্নী ও কন্যার সহিত কিছুদিন কাটাইয়া গেলেন। পূজার ছুটি ফুরাইয়া গেলে তিনি আবার দূর বিদেশে তাঁহার কর্মস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরে সকলে যখন নিদ্রায় মগ্ন, কবির গৃহে তখন ভৃত্যগণ জিনিসপত্র বাঁধায় ব্যস্ত। কাহারো চোখে ঘুম নাই। পাছে বিদেশে কোন জিনিস না পাওয়া যায়, তাই কবি পত্নী বোঁচকা ও বাক্সে নানা জিনিস বোঝাই করিয়া দিতেছেন। সোনামুগ, সরুচাল, পান সুপারি, গুড়ের পাটালি, ঝুনা নারিকেল প্রভৃতি অজস্র জিনিসপত্র কবির সঙ্গে দিয়া বারবার সেগুলি ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন, ইতিমধ্যে যাইবার সময় হইয়া আসিল। কবি-পত্নীর নিকট বিদায় লইলেন। স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ বেদনায় কবি-পত্নীর অন্তর পূর্ণ হইয়া

উঠিল। তাহার চোখে জল আসিল। স্বামীর বিদায় বেলায় তাঁহার চোখের জল পাছে তাঁহার স্বামীর অমঙ্গল ডাকিয়া আনে, তাই তিনি মুখ ফিরাইয়া চোখের জল গোপন করিলেন। চোখের উপর তিনি আঁচল টানিয়া দিলেন।

(২) কহিনু যখন,
'মাগো আসি' সে রহিল বিষণ্ণ নয়ন
ম্লানমুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কন্যার কাছে বিদায় লইলে কন্যা যাহা বলিয়াছে, এখানে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

পূজার ছুটিতে কবি গৃহে আসিয়া কন্যা ও পত্নীর সঙ্গে কয়েকদিন আনন্দে কাটাইয়া আবার দূর বিদেশে কর্মস্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার জন্য নানা ধরনের জিনিসপত্র গোছগাছ করিয়া দিতেছিলেন। পত্নীর কাছে বিদায় লইয়া তিনি কন্যার কাছে বিদায় লইতে আসিলেন। তাঁহার চারি বছরের কন্যা দ্বারের কাছে চুপচাপ বসিয়াছিল। অন্যদিন এতক্ষণ তাহার স্নান আহার হইয়া যায়। তাহার মা তাহার মুখে কিছু তুলিয়া দিতে না দিতে তাহার চোখে নামিয়া আসে ঘুম কিন্তু আজ এত বেলায় তাহার স্নান আহার হয় নাই। এতক্ষণ সে পিতার কাছাকাছি থাকিয়া যাত্রার আয়োজন দেখিতেছিল। এখন চুপচাপ বসিয়া ছিল দ্বারের নিকট। কবি যখন তাঁহার নিকট যাইয়া বিদায় চাহিলেন, তখন সে বলিল যে পিতাকে যাইতে দিবে না। পিতা তাহার প্রিয়জন। প্রিয়জনকে সে দূরে চলিয়া যাইতে দিবে না।

(৩) তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভরে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন—
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। দ্বারের কাছে বসিয়া থাকা চারি বছর বয়স কন্যার ম্লান মুখ মনে পড়িয়া কবির অন্তরে যে বেদনার ভাব জাগিয়াছে, এখানে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

পূজার ছুটি ফুরাইয়া গেলে কবি দূর বিদেশে তাঁহার কর্মস্থানে যাইবার জন্য কন্যার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। কন্যা তাঁহাকে যাইতে দিতে চাহিল না। কিন্তু কবিকে যেহেতু কাজে যোগ দিতে হইবে, তাই কন্যার মিনতি তুচ্ছ করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহার কন্যা বিষণ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিল। সে কবিকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহিল না। শুধু মিনতির মধ্য দিয়া তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ অধিকার প্রকাশ করিল। কন্যার কথা ভাবিয়া কবির হৃদয় বারবার বিষণ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে ওই ছোটো মেয়ে কোথা হইতে এত শক্তি পাইয়াছে যে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছে। প্রিয়জনকে কাছে ধরিয়া রাখিবার শক্তি তাহার নাই। সে পিতাকে কাছে ধরিয়া রাখিতে চাহিল, কিন্তু বাস্তব জগতের তাহার নিজের প্রয়োজনে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

সে পরাজিত হইয়া দ্বারপ্রান্তে বসিয়া রহিল চোখে জল লইয়া। কবি তাহাকে দেখিয়া নিজেও চোখে জল লইয়া চলিয়া আসিলেন।

(৪) চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
যেতে আমি দিব না তোমায়।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কন্যার মুখে 'যেতে নাহি দিব' শুনিয়া কবির মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।

কবি যখন কন্যার কাছে বিদায় লইয়া তাঁহার কর্মস্থানের দিকে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার কানে শুধু কন্যার 'যেতে নাহি দিব' কথা ধ্বনিত হইতেছিল। তিনি যেন বিশ্বচরাচরে সকল কিছুর মধ্যে বিচ্ছেদের করুণ সুর শুনিতে পাইতেছিলেন। বিশ্বচরাচরের সকলে সকলকে নিবিড়ভাবে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে, অথচ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। বার্থতার বেদনায় সমস্ত আকাশ পৃথিবী যেন গভীর দুঃখে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবী তাহার বুকভরা মমতা লইয়া সব কিছুকে তাহার কাছে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে। কিন্তু তাহার মমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সব কিছুই কোথায় চলিয়া যাইতেছে। পৃথিবী অসহায়ভাবে তাকাইয়া থাকে। মহাকাল তাহার বুক হইতে সব কিছু ছিনাইয়া লইতেছে। তাহার বাধা দিবার শক্তি নাই। তাহার এই করুণ অসহায়তা বিশ্বচরাচরে ক্রন্দনের সুরে ধ্বনিত হইতেছে। পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আকাশ সীমায় সেই একই সুর বাজিয়া চলিয়াছে।

(৫) আয়ুক্ষীণ দীপ মুখে শিখা নিব নিব
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে—
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব না রে।'

(৪নং ব্যাখ্যার শেষে নীচের অংশটি যোগ কর)

তৃণ অতি ক্ষুদ্র। বড় বড় বৃক্ষের তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। কিন্তু সেই নগণ্য তৃণকেও বসুমতী নিবিড় মমতায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। যে দীপশিখার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহাকেও কে যেন আঁধারের গ্রাস হইতে টানিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। কে যেন প্রদীপকেও নিভিয়া যাইতে দিতে চায় না। বারবার তাহাকে বলে—'যেতে নাহি দিব'।

(৬) চারিদিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যা কণ্ঠস্বরে।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কবির কন্যা কবিকে যাইতে দিতে চাহে নাই, কবি তথাপি সেই

আহ্বান তুচ্ছ করিয়া কর্মস্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রাপথে সমস্ত কিছুর মধ্যেই তিনি কিরূপে বিশ্বের মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইয়াছেন, তাহাই এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।

পূজা অবকাশে গৃহে ছুটি কাটাইয়া কবি কর্মস্থানে ফিরিয়া যাইতেছেন। তাঁহার শিশুকন্যা তাঁহাকে বলিয়াছিল 'যেতে নাহি দিব।' কিন্তু যেহেতু কাজে যোগ দিতে হইবে, তাই কবি কন্যার মিনতি উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। পথ চলিতে চলিতে তিনি বিশ্বচরাচরে 'যেতে নাহি দিব' করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন। বিশ্বচরাচরে সকলেই সকলকে ধরিয়া রাখিতে চায়। পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র তৃণকেও নিবিড় মমতায় তাহার বক্ষে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। নিভন্ত দীপ-শিখাকেও কে যেন আঁধারের গ্রাস হইতে টানিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু ধরিয়া রাখিবার সব ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। কবির মনে হইতেছিল, বিশ্বচরাচরের আকুল ক্রন্দন যেন তাঁহার কন্যার কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়াই ধ্বনিত হইতেছে।

(৭) ম্লানমুখ, অশ্রু আঁখি
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিচ্ছেদের পটভূমিকায় প্রেমের শক্তি সম্পর্কে এখানে বলা হইয়াছে।

পৃথিবীর বক্ষ হইতে মহাকাল সব কিছুই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। পৃথিবী সর্বদা নিবিড় মমতায় তাহার বক্ষোপরি সব কিছু আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু তাহার সে চাওয়া ব্যর্থ হয়। মহাকাল তাহার নিজের প্রয়োজনে সবকিছু ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই ধ্বংসের মুখে বসিয়াও প্রেম আপন গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া থাকিতে চায়। প্রেমিকা তাহার প্রিয়জনকে অন্তরের নিবিড় প্রেমের গর্বে তাহার কাছে ধরিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু সংসার তাহার বাস্তব প্রয়োজনে প্রেমিককে একমুহূর্তে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। প্রেমিকা তাহার প্রেমের অহংকারে প্রেমিককে বলে 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু তাহার সকরুণ বাণী উপেক্ষা করিয়া প্রেমিককে চলিয়া যাইতে হয়। প্রেমিকা বসিয়া থাকে ম্লানমুখে। প্রতি পলে তাহার অহংকার টুটিয়া যায়, তাহার প্রেমিক তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রেমিকা পরাজয় স্বীকার করে না। প্রেমের শক্তিকে সে দুর্জয় মনে করে। প্রেমের শক্তিতেই সে সবকিছু জয় করিতে চায়।

(৮) তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলি সম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বাস্তব সংসারের প্রয়োজনে প্রিয়জনকে কিরূপে চলিয়া যাইতে হয়, এখানে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

পৃথিবী নিবিড় মমতায় তাহার বক্ষোপরি সবকিছুকে ধরিয়া রাখিতে চায়। মহাকাল তাহার সে চাওয়াকে তুচ্ছ করিয়া সবকিছু ধ্বংস করিয়া দেয়। প্রেমের

ক্ষেত্রেও প্রেমের শক্তিকে প্রতি মুহূর্তে পরাজিত করা হইতেছে। প্রেমিকা তাহার প্রিয়জনকে নিবিড় প্রেমের শক্তিতে নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু সংসার তাহার প্রিয়জনকে নিজের প্রয়োজনে ছিনাইয়া লইয়া যায়। প্রেমিকা পরাজয় সত্বেও ভাঙিয়া পড়ে না। সে তাহার প্রেমের অহংকারে ঘোষণা করে যে তাহার প্রেম এত প্রবল যে তাহার প্রিয়জন তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু সেই ঘোষণার পরই দেখা যায়, শুষ্ক ধূলির মতো তাহার প্রিয়জন তাহার নিকট হইতে কোথায় কোন্ সুদূরে চলিয়া যায়।

(৯) চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া
অশ্রু বৃষ্টি ভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহাকালের করাল গ্রাসের সমুখে পৃথিবীর করুণ ভূমিকা সম্পর্কে এখানে বলা হইয়াছে।

বিশ্বচরাচর ব্যাপিয়া শোনা যাইতেছে 'যেতে নাহি দিব' করুণ ক্রন্দন ধ্বনি। পৃথিবী তাহার বক্ষোপরি সবকিছু নিবিড় মমতায় ধরিয়া রাখিয়া বলে 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু মহাকাল তাহার সে করুণ মিনতিবাণী উপেক্ষা করিয়া সবকিছু সবলে টানিয়া লইয়া যায়। এইভাবে নিত্যকাল ধরিয়া চলিতেছে মহাকালের ধ্বংস-লীলা। পৃথিবীর বুক হইতে কত অসংখ্য সৃষ্টি যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিভন্ত দীপশিখাকে কে যেন টানিয়া রাখিতে চায়, দীপশিখা তবু নিভিয়া যায়। পৃথিবীর উপর যেন বিচ্ছেদের বিষণ্ণ কুয়াশা পড়িয়া আছে। কবির কন্যার মত সকলেই যেন দুইখানি অবোধ বাহু দিয়া বিশ্বকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। চঞ্চল স্রোতের উপর একখানি অচঞ্চল বিষণ্ণ ছায়া স্থির হইয়া আছে। যে কোন সময়ে তাহা মুছিয়া যাইতে পারে। সে যেন ক্রন্দনভরা একখানি মায়া। স্রোতের বুকে মেঘের ছায়ার মতো তাহা এক নিমেষে লুপ্ত হইয়া যায়।

(১০) দেখিলাম তার সেই ম্লান মুখখানি—
সেই দ্বার প্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কবির চোখে পৃথিবীর বিষণ্ণরূপ যে ভাবে ধরা পড়িয়াছে এখানে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

কবি পূজার ছুটির শেষে কর্মস্থানে যাইবার সময় চারি বছরের কন্যার কাছে বিদায় চাহিতে সে বলিয়াছিল 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু কন্যার সকরুণ মিনতি উপেক্ষা করিয়া কবিকে কর্মস্থানের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। পথে চলিতে চলিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, বিশ্বচরাচরের সর্বত্র সেই 'যেতে নাহি দিব' করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে। পৃথিবী তাহার বক্ষোপরি সবকিছু নিবিড় মমতায় ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে। অপরপক্ষে মহাকাল নিমেষে সবকিছু গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কেহই কাহাকে যাইতে দিতে চায় না; অথচ প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মে চলিয়া যাইতে হয়। কবির মনে হইল, মাতা বসুমতী যেন উদাসীনভাবে

গঙ্গার কূলে বসিয়া আছেন। তাঁহার ম্লান মুখের সহিত তাঁহার চারি বছর বয়সের সেই শিশুকন্যার কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই সমান অসহায়। উভয়ে অসহায়তার মধ্য দিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর। 'সারসংক্ষেপ' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। 'নামকরণ' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ চেতনা ও মর্ত্য প্রীতির যে পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা কর।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ সচেতন কবি। নিসর্গকে তিনি নিছক তাঁহার মানসস্ফূর্তির অন্যতম উপাদান হিসাবে দেখেন নাই, নিসর্গ তাঁহার ভাবমানসে জীবন্ত সত্তারূপে সমুপস্থিত। এই নিসর্গ চেতনা তাঁহার সুগভীর মর্ত্যপ্রীতির ফলশ্রুতি। আলোচ্য কবিতার মধ্যে তাঁহার নিসর্গ চেতনা ও মর্ত্যপ্রীতির নিবিড় পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি শুরু হইয়াছে একটি পারিবারিক গার্হস্থ্যচিত্র দ্বারা। কবি পূজার ছুটিতে গৃহে আসিয়া শিশুকন্যা ও পত্নীর সহিত কয়েকটা দিন আনন্দে কাটাইলেন। ছুটি ফুরাইলে তাঁহার দূরে বিদেশ কর্মস্থানে যাইবার সময় উপস্থিত হইল। বেলা দ্বিপ্রহরে দ্বারে গাড়ী প্রস্তুত। কবির পত্নী তাঁহার জন্য সংসারের নানাধরনের জিনিসপত্র গোছাইয়া দিলেন। কবির যাহাতে সামান্য অসুবিধা না হয়, সেদিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি।

কবি পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট তাঁহার চারি বছরের শিশু কন্যার নিকট যাইয়া বলিলেন—'মাগো, আসি', তাঁহার কন্যা বিষণ্ণ নয়নে ম্লান মুখে বলিল—

'যেতে আমি দিব না তোমায়।'

শিশুকন্যা উঠিয়া কবির হাত ধরিল না, বা দরজা বন্ধ করিয়া তাহার পথ আটকাইল না। কেন না সে বুঝিয়া গিয়াছে, যে পিতাকে আজ চলিয়া যাইতে হইবেই। তথাপি সে 'যেতে আমি দিব না তোমায়' বলিয়া নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকারটুকু শুধু প্রকাশ করিল।

কবির কর্মস্থানে যাওয়া খুবই প্রয়োজন। কাজে যোগ দিতে হইবে। তাই কন্যার সকরুণ দিনভিখারী উপেক্ষা করিয়া কবিকে কর্মস্থান অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল।

পথে চলিতে চলিতে তাঁহার নিকট জগৎ ও জীবনের এক নিগূঢ় সত্য ধরা পড়িল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মহাপ্রকৃতির বুকে নিত্যকাল ধরিয়া ধ্বনিত হইতেছে 'যেতে নাহি দিব' ক্রন্দন ধ্বনি। বসুন্ধরা তাহার প্রকৃতিজগৎ ও

জীবজগৎকে নিবিড় মমতায় বুকের উপর ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু মহাকাল প্রতিটি মুহূর্তে সব কিছু নিজের প্রয়োজনে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। মহাপ্রকৃতির প্রতিটি জিনিসের মধ্যে মৃত্যুর হাতছানি। তাই সব কিছুর মধ্যে দেখা যায় করুণ উদাসীনতা ও বিষণ্ণতা—

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী 'চলিতেছি যত দূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়।'

সমস্ত পৃথিবীর বক্ষ জুড়িয়া শোনা যায় এই হাহাকার ধ্বনি। 'যাইতে না দিবার' করুণ মিনতিবাণী পৃথিবী হইতে আকাশ সীমায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাতা বসুমতী তাঁহার বক্ষ হইতে একটি তৃণকেও যেন যাইতে দিতে চনে না—

তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী—
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।

বিশ্বচরাচরের নিসর্গ কবি কল্পনায় জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিসর্গের সব কিছুই জীবন্ত, সব কিছু প্রাণবন্ত, সব কিছুকেই মহাকাল যেন অদৃশ্যলোক হইতে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, আর অন্য কেহ মহাকালের গ্রাস হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে—

আয়ু ক্ষীণ দীপ মুখে শিখা নিব-নিব
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে—
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব না রে।'

সমুদ্রের পশ্চাতের ঊর্মিরাশি সম্মুখের ঊর্মিরাশিকে যাইতে দিতে চাহে না। সেই 'যেতে নাহি দিব' পুরাতন কথাটি নিত্যকাল ধরিয়া স্বর্গমর্ত্য আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কেহই তাহার প্রিয়জনকে যাইতে দিতে চায় না। তথাপি যাইতে দিতে হয়—

হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।

মহাকালের নিষ্ঠুর আঘাতে সব কিছুকে চলিয়া যাইতে হয় বলিয়া তরুর মর্মরে জাগিয়া ওঠে গভীর ব্যাকুলতা—

অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে;

কবির নিসর্গ চিন্তায় ম্লানমুখী বিষণ্ণ নয়ন বসুন্ধরা ও তাঁহার চারি বছর বয়স্ক শিশুকন্যা মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। শিশুকন্যা কহিছে 'যেতে আমি

দিব না তোমায়' বলিয়াও আটকাইতে পারে নাই। সংসারের প্রয়োজনে তাহার পিতা চলিয়া গিয়াছেন। বসুন্ধরা তাহার সন্তানগণকে নানাভাবে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াও পারে নাই। মহাকাল প্রতিমুহূর্তে তাহার বক্ষ হইতে সব কিছু হরণ করিয়া লইতেছে। সব হারানোর ব্যথা বুকে লইয়া বসুন্ধরা যেন উদাসভাবে জাহ্নবীর কূলে বসিয়া আছে, তাহার অবুঝ মিনতিতে মহাকাল কর্ণপাত করে নাই। কবি বসুন্ধরার মুখে তাঁহার কন্যার মুখটি দেখিয়াছেন—

দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি—
সেই দ্বার প্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।

'যেতে নাহি দিব' কবিতায় নিসর্গ চেতনার মাধ্যমে কবির মর্ত্যপ্রীতির পরিচয় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি মর্ত্যলোকের স্নেহ প্রেম প্রীতির মধ্যে জগতের চিরন্তন সত্য দেখিতে পাইয়াছেন। মহাকালের নির্মম আঘাতে সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। "এই ধ্বংসশীল পৃথিবীর বুকে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষুদ্র স্নেহপ্রেমের মধ্যে এক পরমাশ্চর্য বস্তু নিহিত আছে—কবি তাই অপূর্ব বিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছেন। কবি চিরদিনই মানবের স্নেহপ্রেমকে সৃষ্টির মূলে যে নিত্য আনন্দ বিরাজমান, তাহারই ক্ষণিক ও খণ্ড প্রকাশ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন।"

বিশ্বচরাচর ব্যাপিয়া মহাকালের যে নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা চলিতেছে, তাহার মধ্যে থাকিয়া স্নেহপ্রেম আপন অহংকারে প্রিয়জনকে অনন্তকাল ধরিয়া রাখিতে চায়। মাতা চায় সন্তানকে নিবিড় মমতায় বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখিতে, প্রেমিকা চায় প্রেমিককে তাহার কাছে রাখিতে। কিন্তু তাহার সেই চাওয়া পলে পলে ব্যর্থ হয়। তথাপি প্রেম পরাজয় স্বীকার করে না—

যতবার পরাজয়
ততবার কহে, আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।

প্রেমের শক্তিকে সে সকলের চেয়ে বড় শক্তি মনে করে। এই শক্তি দিয়া সে মৃত্যুকে প্রতিহত করিতে চায়—

আমার আকাঙ্ক্ষা সম এমন আকুল,
এমন সকল বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর।

মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেম তাহাকে বলে, 'মৃত্যু তুমি নাই'। মৃত্যু হাসিয়া নিমেষে তাহার আদরের ধন হরণ করিয়া লয়। 'মরণ পীড়িত সেই চিরজীবি প্রেম' তথাপি সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। মহাকাল তাহার যুগ যুগান্তের ধ্বংসলীলা দ্বারা প্রেমের শক্তি, প্রেমের অহংকার খর্ব করিতে পারে নাই। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় মর্ত্যলোকের প্রেমের গৌরব অপূর্ব উজ্জ্বলতার মাধ্যমে চিত্রিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে মহাকালের অপরিমেয় শক্তির সহিত যুঝিয়া প্রেম আপন অস্তিত্বের ডঙ্কায় ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে।

প্রশ্ন ৪। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মর্মসত্য লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মধ্যে মানুষের স্নেহ মায়া মমতাময় হৃদয়বত্তার জয়গান গাওয়া হইয়াছে। মানুষের জীবন স্নেহ মায়া মমতা প্রীতি ভালোবাসা দিয়া ঘেরা এক আশ্চর্য জগৎ। এখানে পিতামাতা পুত্রকন্যা আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে স্নেহপ্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধন। স্নেহপ্রীতির বন্ধনে সকলে সকলকে যেন নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। কেহই কাহাকে ছাড়িতে চাহে না। কেহই কাহাকেও বিদায় দিতে চাহে না। কিন্তু মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে এই স্নেহপ্রীতি ভরা জীবনকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বপ্রকৃতি ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে. মানুষে মানুষে সমস্ত সম্বন্ধ প্রতিনিয়ত মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন হইতেছে, কিন্তু মানুষের স্নেহ প্রেম ধ্বংস মৃত্যুর দ্বারা পরাভূত হইতে চাহে না।

সৃষ্টি চলিয়াছে ক্রমাগত মৃত্যু অভিমুখে—কিন্তু এই নিখিল বিশ্ব প্রত্যেক বস্তুকেই প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র।

মানুষের প্রেম ও প্রেমাস্পদকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সযত্নে চিরস্থায়ী ক'রতে চায়। বারবার বিফল মনোরথ হইলেও বিশ্বাস তাহার অটল। ...বারবার তাহার জীবনে ব্যর্থতা নামিয়া আসে, তথাপি কিছুতেই সে পরাজয় মানিতে চায় না। বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে সে বলে 'যেতে নাহি দিব'।

'একদিকে মানুষের স্নেহ প্রেম, অন্যদিকে নিষ্ঠুর মৃত্যু সৃষ্টির অপরিবর্তনীয় বিধান। এই দুয়ের দ্বন্দ্বে আমাদের জীবনের একটা চিরন্তন ট্র্যাজেডি লুক্কায়িত আছে। এই চিরন্তন মানব বেদনার ইঙ্গিত করিয়াছেন' কবি 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়। আলোচ্য কবিতায় কবিতার 'কবি পৃথিবীর ধ্বংস মৃত্যুর উপর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের আসন নির্দেশ করিয়াছেন।'

প্রশ্ন ৫। যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়;
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার;
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার
প্রচারিল, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'

প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। কবি পূজার ছুটিতে গৃহে আসিয়া শিশুকন্যা ও পত্নীর সহিত কয়েকটা দিন আনন্দে কাটাইয়া দূর বিদেশে নিজের কর্মস্থানে ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছেন। বেলা দ্বিপ্রহরে দ্বারে গাড়ি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য। তাঁহার পত্নী নানা ধরনের জিনিসপত্র গোছগাছ করিয়া দিলেন। যাবার সময় উপস্থিত হইলে কবি পত্নীর কাছে বিদায় লইয়া চারি বছর বয়স্কা কন্যার নিকট যখন বিদায় চাহিলেন, তখন সে বলিল 'যেতে আমি দিব না তোমায়'।

কবির শিশুকন্যা যে দ্বারপ্রান্তে উদাসীন ভাবে বসিয়া ছিল, সেখানেই বসিয়া রহিল। সে উঠিয়া আসিয়া পিতার বাহু ধরিল না, বা উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিল না। সে শুধু 'যেতে আমি দিব না তোমায়' কথার মাধ্যমে আপন হৃদয়ের স্নেহ

অধিকার প্রচার করিল। কেননা সে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া লইয়াছে, তাহার পিতাকে চলিয়া যাইতে হইবেই। তাহার পিতা যেখানে চাকরী করেন, সেখানকার আহ্বান তাহার আহ্বানের চেয়েও তীব্র। এই কারণেই অন্ত ভাবে তাহার অধিকার প্রয়োগ না করিয়া শুধু মিনতিবাণীর মধ্য দিয়া স্নেহ অধিকার প্রচার করিল।

তাহার ক্ষুদ্র উপলব্ধিটুকুই সত্য হইল। কবি তাহার মিনতিবাণীতে কান না দিয়া কর্মস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি জগৎ ও জীবনের সব কিছুর মধ্যে কন্যার সেই আর্ত মিনতি 'যেতে নাহি দিব' কথাটি শুনিতে পাইলেন। পৃথিবী নিবিড় মমতাভরে তাহার বক্ষোপরি সবকিছুকে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে। ক্ষুদ্র তৃণকেও সে যেন নিবিড় স্নেহে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু মহাকাল তাহার প্রাণের ধনকে এক নিমেষে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পৃথিবী অসহায় ভাবে ম্লানমুখে তাহার কন্যার মতো চুপচাপ বসিয়া থাকে।

প্রশ্ন ৩। তাই স্ফীতবুকে

সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে

দাঁড়াইয়া, সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা,

বলে, 'মৃত্যু তুমি নাই।' হেন গর্বকথা।

প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। জগৎ ও জীবনের বুকে নিত্যকাল ধরিয়া চলিতেছে অবিরাম ধ্বংসলীলা। মহাকাল তাহার নিজস্ব প্রয়োজনে সব কিছুই ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। পৃথিবী তাহার বক্ষোপরি সব কিছুকে নিবিড় মমতায় চিরকাল ধরিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে। মহাকাল তাহার সকল কাকুতি ও মিনতি উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রাণের ধনকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

এই ধ্বংসলীলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেম আপন শক্তিতে মহীয়ান। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া প্রেম নিজের শক্তি ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। মাতা স্নেহ দিয়া সন্তানকে ধরিয়া রাখিতে চায়, প্রেমিক প্রেম দ্বারা প্রেমিকাকে ধরিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু তাহাদের সেই চাওয়া সর্বদা ব্যর্থ হয়। বারবার মহাকালের হাতে তাহাদের পরাজয় ঘটে—

ম্লানমুখ, অশ্রু আঁখি

দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,

তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব।

বারবার পরাজয় সত্ত্বেও প্রেমের গর্ব দূর হয় না। বিদ্রোহের ভাবে সে তাহার আদরের ধনকে ধরিয়া রাখিবার কথা ঘোষণা করে। তাহার বিশ্বাস, তাহার প্রেমের আকাঙ্ক্ষার মতো এমন আকুল, এমন প্রবল আর বিশ্বে কিছুই নাই। এই প্রবলতার মধ্য দিয়া সে নিজের প্রেমাস্পদকে ধরিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু হায়, ঠিক সেই সময়ই তাহার আদরের ধন মহাকালের আবর্তে পড়িয়া

নিঃশেষে তলাইয়া যায়। অশ্রুধারায় তাহার দুই চোখ ভাসিয়া যায়। তথাপি সে নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়ে না—মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে বলে, 'মৃত্যু তুমি নাই'। ধ্বংসের বুকে দাঁড়াইয়া প্রেম আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ধ্বংসের মধ্যেও প্রেম চিরজীবী। মৃত্যুকে প্রেম ভয় করে না।

বসুন্ধরা

ভূমিকা—'বসুন্ধরা' কবিতায় কবির মর্ত্যপ্রীতির পরিচয় সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে একটি পত্রে (শিলাইদহ, ২০ আগস্ট, ১৮৯২) লিখিয়াছেন "এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস হয়ে উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য কিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম—তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনী শক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠচে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপচে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে—কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না, কী একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে।"

'বসুন্ধরা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেরূপ দক্ষতার সহিত বসুন্ধরার রূপমূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বসুন্ধরার বুকের উপর যে বিশাল রূপজগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া নিজেকে ছড়াইয়া রাখিয়াছে, কবির বর্ণনায় তাহা নিবিড় আন্তরিকতায় মূর্ত হইয়াছে। কবি আপন হৃদয়ের সবটুকু আকুলতা দিয়া, সবটুকু গভীরতা দিয়া বসুন্ধরার যথাযথ রূপবৈচিত্র্য এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিময়তার বিষয় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

উৎস ও নামকরণ—'বসুন্ধরা' কবিতাটি ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬শে কার্তিক রচিত। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত।

আলোচ্য কবিতায় কবির অনাসক্ত মর্ত্যপ্রীতির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিমানস সীমা ও অসীমের লীলাবৈচিত্র্যে পরিব্যাপ্ত। কখনো তিনি অসীমের অনন্ত উদারতায় কল্পনার পক্ষ মেলিয়া দিয়াছেন, কখনো আবার মর্ত্য-

লোকের সাধারণ মানুষের নিবিড় সান্নিধ্যে নিজেকে মিশাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। 'বসুন্ধরা' কবিতাটি তাঁহার অনাবিল মর্তপ্রেমের ফসল। কবি এই বিশাল বসুন্ধরার প্রতিটি স্থানে মানস ভ্রমণ করিয়াছেন। কখনো তিনি দুর্গম মরুপ্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। কখনো শৈলমালার মাঝখানে স্ফটিক নির্মল স্বচ্ছ জলধারা দেখিয়াছেন, কখনো তিনি দূর সিন্ধুপারে মহাদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। দেশ-দেশান্তরে সকল মানুষের সহিত স্বজাতি হইয়া থাকিবার বাসনায় তাঁহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের সকল পাত্র হইতে 'আনন্দ-মদিরাধারা' পানের সাধ তাঁহার তীব্র।

সমগ্র বসুন্ধরার বুকের উপর বিশাল বৈচিত্র্যের আয়োজন দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। স্তব্ধ বিস্ময়ে তিনি সেই বৈচিত্র্যের দিকে দিকে তাকাইয়া থাকেন। আপন প্রাণের নিভৃতলোকে তিনি বসুন্ধরার অপূর্ব রূপবৈচিত্র্য অনুভব করেন,—

> যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
> উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
> ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
> পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

সমগ্র কবিতায় বসুন্ধরার অপূর্ব রূপমূর্তি ও রসবৈচিত্র্য অসাধারণ ভাবগভীরতার মধ্যে চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া কবিতার এই নামকরণ করা হইয়াছে।

সারসংক্ষেপ—কবি বসুন্ধরাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন: বসুন্ধরা যেন তাঁহাকে ফিরাইয়া লয় তাহার কোলের ভিতরে। তিনি বসুন্ধরা'র মৃত্তিকার মাঝে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিতে চান। বসন্তের আনন্দের মতো দিক-দিগন্তে নিজেকে বিস্তার করিয়া রাখিতে চান। নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, পাষাণঘেরা সংকীর্ণ প্রাচীর ভাঙিয়া, নিরানন্দ অন্ধ কারাগার চূর্ণ করিয়া তিনি আলোকে পুলকে সমস্ত ভূলোকে প্রবাহিত হইতে চান—শৈবালে তৃণে শাখায় পত্রের মধ্যে নিগূঢ় জীবনরসে ডুবিয়া থাকিতে চান অঙ্গুলি দ্বারা তিনি স্বর্ণশীর্ষে —আনমিত শস্যক্ষেত্রতল স্পর্শ করিতে চান। সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে নবপুষ্পদল সুবর্ণলেখায় তিনি পূর্ণ করিয়া দিতে চান। মহাসিন্ধুনীর নীলিমায় পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া স্তব্ধ ধরণীর অনন্ত কল্লোল গীতে নৃত্য করিবার বাসনা তাঁহার। তরঙ্গে তরঙ্গে তাহাকে তিনি প্রসারিত করিয়া দিতে চান উচ্ছলিত রঙ্গে। শৈলশৃঙ্গের নির্জনে তিনি নিজেকে বিছাইয়া দিতে চান।

মনের মধ্যে যে ইচ্ছাগুলি বহুকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াছে, সেগুলি কেমন করিয়া বাস্তবে সম্ভব হইবে, তাহা কবি জানেন না। তিনি গৃহে বসিয়া সর্বদা অধ্যয়ন করিতেছেন, দেশ দেশান্তরে যাহারা ভ্রমণ করিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া তিনি মনে মনে কল্পনার জাল বুনিতেছেন।

তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিতেছে দুর্গম মরুদেশের চিত্র—সেখানে পথ নাই, তরু নাই। আছে শুধু অন্তহীন প্রান্তর। রৌদ্রালোকে জ্বলন্ত বালুকারাশি চোখে যেন সূচ বিঁধাইয়া দেয়। বসুন্ধরা যেন দিগন্তবিস্তৃত ধূলিশয্যায় জ্বরতপ্ত দেহে লুটাইয়া পড়িয়া থাকে।

কবি কতদিন গৃহপ্রান্তে বসিয়া মনে মনে শৈলমালার ছবি দেখিয়াছেন। চারিদিকে শৈলমালা, মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নির্জন, স্ফটিকস্বচ্ছ জল। খণ্ড মেঘদল শিখরের উপর বিরাজমান। নীল পাহাড়ের উপর হিমরেখা দেখা যায়।

কবি মনে মনে দূর সিন্ধুপারে মহামেরুদেশে মানসভ্রমণ করিয়াছেন। সেখানে পৃথিবী যেন অনন্তকুমারী ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবী যেন সেখানে হিমবস্ত্র পরিহিত, নিঃসঙ্গ নিঃস্পৃহ। সেখানে দীর্ঘরাত্রি শেষে নিঃশব্দ দিন শুরু হয়। সেখানে রাত্রি আসে, কিন্তু রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার কেহ নাই। সেখানে শুধু অনন্ত আকাশে চিরকাল জাগরণের পালা।

কবি যত নূতন দেশের নাম শোনেন, যত নূতন দেশের বর্ণনা পাঠ করেন, ততই তাঁহার চিত্ত সেখানে যাইবার জন্য অধীর হইয়া ওঠে। সমুদ্রের তীরে ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসঙ্কটে ছোটো একটি গ্রাম। তীরে জাল শুকাইতেছে, জলে তরী ভাসিতেছে, জেলে মাছ ধরিতেছে। কবির ইচ্ছা করে, পাহাড়ের কোলের সেই গ্রামখানিকে হৃদয়ে বেষ্টন করিয়া ধরেন।

যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহার সব কিছুই আপনার করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। নদীর দুই তীরে যত লোকালয় আছে, সর্বত্র পিপাসার জল দান করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। উদয়সমুদ্র হইতে অস্তসমুদ্রে নিজেকে ছড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করে। পাহাড়ের কোলে নব নব জাতিকে মানুষ করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে। দেশে দেশান্তরে সকল মানুষের স্বজাতি হইয়া বাস করিতে তাঁহার সাধ হয়। মরুভূমিতে আরব সন্তান হইয়া উষ্ট্রদুগ্ধ পান করেন। তিব্বতের বৌদ্ধমঠ, দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক, নির্ভীক তাতার, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান, প্রবীণ প্রাচীন চীন প্রভৃতি জাতি কবিকে আকর্ষণ করে।

উচ্ছৃঙ্খল জীবনস্রোতে কবি ভাসিয়া যাইতে চান। যাহারা অরুণ বলিষ্ঠ হিংস্র বর্বর, যাহাদের কোন ধর্মাধর্মবোধ নাই, প্রথা নাই, বাধা বন্ধ নাই, দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই, যাহারা বৃথা ক্ষোভে অতীতের পানে চায় না, বর্তমানের চূড়ায় চূড়ায় নৃত্য করিয়া উল্লাসভরে চলিয়া যায়, কবি তাহাদের জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন।

অরণ্যের হিংস্র ব্যাঘ্র অবহেলায় আপন বিশাল শরীর বহন করে। তাহার অগ্নিবর্ণ দেহ লইয়া অনায়াসে শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, ব্যাঘ্রের সে মহিমা সেই গরিমার সাধ লইবার জন্য কবির মনে বাসনা জাগে।

সুন্দরী বসুন্ধরার পানে চাহিয়া উল্লাসভরে কতবার কবির প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছে—সমুদ্রে মেখলা পরা বসুন্ধরার কটিদেশ আঁকড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছে—অরণ্যে ভূধরে, পল্লবের হিল্লোলে নৃত্যের বাসনা জাগিয়াছে। বসুন্ধরার প্রতিটি কুসুমকলি, শ্যাম তৃণশস্যকে প্রাণের আবেগে উপভোগ করিতে কবির মনে সাধ যায়। তাঁহার ইচ্ছা করে, রাত্রিকালে চুপি চুপি নিদ্রারূপে সমস্ত পশুপক্ষীর নয়নে অঙ্গুলি বুলাইয়া দেন।

বসুন্ধরার সহিত কবির সম্পর্ক দীর্ঘকালের। বসুন্ধরা যেন কবিকে লইয়া অনন্ত গগনে অশ্রান্ত চরণে সবিতৃমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছে। যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার মাঝে তৃণরাজি উঠিয়াছে, তাহার মনের মধ্যে তরুরাজি পত্র ফুল ফল গন্ধরেণু বর্ষণ করিয়াছে। তাই তিনি পদ্মাতীরে বসিয়া আনমনে

বসুন্ধরার সৌন্দর্য দর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, বসুন্ধরার মাটির মাঝে তৃণাঙ্কুর কেমন শিহরিয়া উঠিতেছে। সুন্দর বৃক্ষের বুকে কুসুমমুকুল আনন্দভরে ফুটিয়া থাকে। তরুলতা তৃণগুল্ম আশ্চর্য পুলকে প্রমোদরসে হরষিয়া ওঠে। আর যখন শস্যশীর্ষ শস্যক্ষেত্রের উপর শরতের কিরণ ছড়াইয়া পড়ে, তখন তাহার মনে জাগে মহাব্যাকুলতা। সমস্ত পৃথিবী তখন যেন তাহাকে আকুল ভাবে আহ্বান করে। সেই পৃথিবী হইতে চিরদিনের খেলার সঙ্গীদের আনন্দ কলরব তিনি শুনিতে পাইতেছেন।

কবি মন হইতে সেই বিরহ দূর করিতে চাহিয়াছেন যে বিরহ হইতে মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে বিশাল প্রান্তর, গাভীগুলির ঘরে ফেরার দৃশ্য। এখন কবির নিজেকে মনে হয় নির্বাসিত। তাহার মনে হয়, আকাশ, পৃথিবী, শান্ত জ্যোৎস্নারাশিকে তিনি অন্তরে তুলিয়া লন। কিন্তু কিছুই তিনি পারেন না, শুধু শূন্যে তাকাইয়া থাকেন। সেখান হইতে অহরহ প্রাণ অঙ্কুরিত হইতেছে। শতলক্ষ সুরে গুঞ্জরিত হইতেছে, অসংখ্য ভঙ্গীতে নৃত্য উচ্ছ্বসিত হইতেছে, কবি সেই সকল স্থানে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছেন।

বসুন্ধরা হইতে কতরূপে আনন্দরস বর্ষিত হইতেছে, কবি একমুহূর্তে সেই আনন্দরস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন। কবির মনের সেই আনন্দ লইয়াই তো অরণ্য শ্যামল হয়। কবির মুগ্ধতায় ভাবে আকাশ নয়নাঞ্চল হৃদয়ের রঙে অঙ্কিত হইবে। এই সব দেখিয়া কবির মনে জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের দুনয়নে জাগিবে প্রেমের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে আসিবে গান। বসুন্ধরার সর্বাঙ্গ সহস্রের সুখে রঞ্জিত হইয়া আছে।

বসুন্ধরার মাটির সঙ্গে মিশিয়া আছে জীবজগতের অন্তরের প্রেম, জীবজগতের ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন দিকে দিকে বিছাইয়া রাখিয়াছে। কবি ইহার সহিত তাঁহার হৃদয়ের প্রেম সযত্নে মিশাইয়া বসুন্ধরার অঞ্চলখানি রাঙাইয়া দিবেন। কবি তাঁহার হৃদয়ের সবটুকু মাধুর্য দিয়া বসুন্ধরাকে সাজাইয়া দিবেন।

নদীর উপর কবির সেই গান নদীকূলে কাহাকেও কি মুগ্ধ করিবে না? শতবর্ষ পরে সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে তাঁহার প্রাণ কি কাঁপিয়া উঠিবে না? ঘরে ঘরে কত নরনারী সংসার করিবে, কবি কি তাহাদের প্রীতির মধ্যে বাস করিবেন না? তিনি কি তাহাদের মধ্যে হাসি, যৌবন, সুখ, প্রেমের রূপে বিকশিত হইবেন না।

বসুন্ধরা কি কবিকে ত্যাগ করিবে? তাঁহার সহিত যুগযুগান্তের মৃত্তিকা বন্ধন কি ছিন্ন হইয়া যাইবে? বসুন্ধরার লক্ষ বর্ষের স্নিগ্ধ ক্রোড় ত্যাগ করিয়া তিনি কি চলিয়া যাইবেন? এই সব তরুলতা, গিরি নদী বন, সুনীল গগন, উদার বাতাস, আলো সমস্ত ছাড়িয়া তাঁহাকে কি চলিয়া যাইতে হইবে?

কবি বসুন্ধরাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না। তিনি পশুপাখি কীট পতঙ্গ তরুলতা রূপে বসুন্ধরার বুকে বাস করিতে চান। যুগে যুগে তিনি বসুন্ধরার অমৃতরসপূর্ণ স্তন পান করিয়া জীবনের শতলক্ষ ক্ষুধা মিটাইতে চান। তারপর যুবক সন্তানরূপে সুদুর্গম পথে বাহির হইতে চান।

বসুন্ধরার রূপ এখনো কবির চোখে সুন্দর স্বপ্ন সৃষ্টি করে। বসুন্ধরার সবকিছু

এখনও রহস্যপূর্ণ মনে হয়। কবি এখনও তাঁহার বুকে শিশুর মতো বাস করেন। তিনি এখন জননী বসুন্ধরার মুখের পানে তাকাইয়া থাকেন। জননী যেন তাঁহার বাহুযুগল ধরিয়া তুলিয়া লন, তাঁহার বুকের মাঝে তাঁহার স্থান করিয়া দেন, বসুন্ধরার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের উৎসস্থানে তিনি যাইতে চান।

শব্দার্থ টীকাটিপ্পনী

১ম স্তবক

অয়ি বসুন্ধরে—হে পৃথিবী। **আমারে ফিরায়ে..... অঞ্চল তলে**—কবি বসুন্ধরার সন্তান। তাই বসুন্ধরা যেন তাহাকে কোলের ভিতর অঞ্চলের তলে টানিয়া লন।

ওগো মা মৃন্ময়ী...মতো—বসুন্ধরার মাটির মধ্যে কবি নিজেকে চারিদিকে বসন্তকালের আনন্দের মতো ছড়াইয়া দিতে চান।

বিদারিয়া—বিদীর্ণ করিয়া। **বক্ষ পঞ্জর**—বুকের পাঁজর।

বিদারিয়া ......অন্ধকারাগার—কবি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করিয়া সুখ পান না। তিনি সংকীর্ণ গণ্ডীর বন্ধন কাটাইয়া অনন্ত আনন্দের মধ্যে নিজেকে মুক্তি দিতে চান।

হিল্লোলিয়া—হিল্লোল তুলিয়া। **মর্মরিয়া**—মর্মরধ্বনি তুলিয়া। **কম্পিয়া**—কাঁপিয়া। **বিকিরিয়া**—বিকিরণ হইয়া। **সচকিয়া**—সচকিত হইয়া। **সরসিয়া**—সরস হইয়া।

যাই পরশিয়া .... আন্দোলনে—শস্যক্ষেত্রে শস্যগুলি পাকিয়া সোনার রং ধরিয়াছে। শস্যভারে শস্যগাছগুলি নত হইয়া পড়িয়াছে। কবি অঙ্গুলির অগ্রভাগে সেইগুলি স্পর্শ করিতে চান।

নবপুষ্পদল .... মধুবিন্দুভারে—নব পুষ্পদলকে মধুর গন্ধে ও মধুতে পূর্ণ করিয়া দিতে কবির সাধ হয়।

নীলিমায়..... অনন্ত কল্লোলগীতে—কবির ইচ্ছা করে, মহাসমুদ্রের জলরাশিকে নীলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার তীরে তীরে কল্লোলধ্বনির তালে তালে নৃত্য করেন।

শুভ্র উত্তরীয়......নিভৃতে—শুভ্র উপবীতের মতো পর্বতচূড়ায় কলঙ্কহীন নীহারের নির্জনতায় কবি আপনাকে বিছাইয়া রাখিতে চান।

২য় স্তবক

যে ইচ্ছা গোপনে......অন্তর ভেদিয়া—কবির মনে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ইচ্ছা সঞ্চিত হইয়াছে, সেগুলি এখন প্রবলবেগে বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছে। কবি সেই বাসনাগুলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া কিভাবে দিক দিগন্তে পাঠাইবেন, তাহা ভাবিয়া পান না।

আমি তাহাদের......জানে—কবি ভ্রমণকারীদের লেখা নানা ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের সহিত তিনিও মানস ভ্রমণ করেন। কল্পনার চোখে বসুন্ধরার নানা বৈচিত্র্য দেখেন।

সোনা—৪

৩য় স্তবক

সুদুর্গম·····চোখে—কবি দূর মহামরুভূমির স্বপ্ন দেখেন—সেখানে পথ নাই, তরু নাই, শুধু ধূ-ধূ বালুকাময় প্রান্তর। যেখানে শুধু অনন্ত পিপাসার আকুলতা—রৌদ্রালোকে বালুকারাশি ঝলসাইয়া ওঠে।

দিগন্ত বিস্তৃত যেন·····নিদ্রা—মরুভূমি যেন বসুন্ধরার জ্বরতপ্তরূপ। জ্বরতপ্ত মানুষের মতো সে শুষ্ককণ্ঠে, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ অবস্থায় শুইয়া আছে।

খণ্ড মেঘগণ·····আঁকড়ি—পর্বতের চূড়ায় লাগিয়া আছে খণ্ড খণ্ড সাদা সাদা মেঘ। মাতার স্তন মুখে দিয়া শিশু যেরূপ নিশ্চিন্তমনে মাতার বুকে মাথা গুঁজিয়া শুইয়া থাকে, সাদা মেঘখণ্ডও অনুরূপভাবে শিখর আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে।

যেন নিস্তব্ধ নিষেধ·····তপোবন দ্বারে—নীল হিমালয়ের উপর দিয়া শুভ্র তুষারশ্রেণীর আভাস পাওয়া যাইতেছে। মনে হয়, উহার—পিছনে আছে মহাদেবের তপোবন। সেখানে মহাদেব যোগমগ্ন। মহাদেবের তপোবন আড়াল করিয়া রহিয়াছে নীল পর্বতশ্রেণী।

যেথানে রয়েছে ··**আভরণহীন**—কবি মনে মনে মহামেরুদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। সেখানে বসুন্ধরা আদিম অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। মনে হয়, বসুন্ধরা সেখানে অনন্ত কুমারীব্রত গ্রহণ করিয়াছে তাহার সর্বাঙ্গে হিমবস্ত্র।—সে যেন সকল ব্যাপারে নিঃস্পৃহ।

যেথা দীর্ঘ রাত্রি শেষে ·····**জননীর মতো**—মেরুদেশে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রাত্রি থাকে। রাত্রির পর আসে দিন। নির্জন মেরুদেশে কোন শব্দ নাই, কোন সঙ্গীত নাই। মেরুদেশে রাত্রি আসে। কিন্তু সেখানে ঘুমাইবার কেহ নাই। পুত্রহারা জননী যেমন নিদ্রাহারা রাত্রি যাপন করে, মেরুদেশেও তেমনি অনিমেষ নয়নে জাগিয়ে থাকিবার পালা।

ইচ্ছা করে·····**বাহুপাশে**—কবি মনে মনে ছবি দেখেন সমুদ্রের ধারে নীল পর্বতমালার মধ্যবর্তী কোন গ্রামের। সেখানে জেলেরা জাল লইয়া মাছ ধরিতেছে—পাহাড়ের মাঝখান দিয়া ছোটো একটি নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। কবির ইচ্ছা করে, সেই ছোটো গ্রামখানির জীবনধারার সহিত এক হইয়া মিশিয়া যান।

পৃথিবীর মাঝখানে·····**বিরাজি**—পৃথিবীর মধ্যভাগে উদয় সমুদ্র হইতে অস্তসমুদ্র পর্যন্ত কবি নিজেকে ছড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। উচ্চতম পর্বতমালার অপার রহস্যময়তার মধ্যে তিনি বিরাজ করিতে চান।

ইচ্ছা করে মনে ·····**দুর্দম স্বাধীন**—পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির সহিত একাত্ম হইয়া মিশিয়া থাকিতে কবির ইচ্ছা করে। আরব দেশে আরব সন্তানরূপে দুর্দম স্বাধীন জীবন যাপন করিতে তাঁহার সাধ হয়।

তিব্বতের·····**বিচরণ**—তিব্বতের বৌদ্ধমঠ সুনির্জন। মনে হয় যেন বাহিরের জগৎ সম্পর্কে মঠগুলি উদাসীন। এই সকল নির্জন নিভৃত বৌদ্ধমঠে কবি বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন।

অ্যাকাপারী......ইচ্ছা করে—কবি এখানে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নির্দেশ করিয়াছেন। পারস্যের অধিবাসী আঙুর ফলের রস পান করিয়া গোলাপ বাগানে বাস করে। তাতার জাতি নির্ভীক—সর্বদা অশ্বে আরোহণ করিয়া থাকে, জাপানের অধিবাসী যেমন শিষ্টাচারী তেমনি সতেজ, চীনারা প্রবীণ প্রাচীন—সর্বদা কর্মে ব্যস্ত। কবি সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ করিতে ইচ্ছা করেন।

অরুগ্ন বলিষ্ঠ .....অকাতরে—আদিম হিংস্র বর্বর জাতির সহিতও কবি একাত্ম হইয়া থাকিতে চান। পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি আছে, যাহারা অরুগ্ন, বলিষ্ঠ, হিংস্র, নগ্ন, বর্বর। তাহারা কোন ধর্ম অধর্ম মানে না, কোন প্রথা মানে না। তাহাদের কোন বাধাবন্ধ নাই, কোন চিন্তাভাবনায় পীড়িত হয় না, তাহাদের জীবনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই। তাহাদের উন্মুক্ত জীবনস্রোতে কবি গা ভাসাইয়া দিতে চান।

পরিতাপ জর্জর .....কেও ভালোবাসি—আদিম দুর্দম জাতি কখনো কাজের জন্য পরিতাপ করে না—তাহারা বৃথা ক্ষোভে অতীতের পানে তাকায় না—মিথ্যা দুরাশায় ভবিষ্যতের পানে তাকায় না—তাহারা শুধু কঠোর বর্তমান লইয়াই কাজ করে, প্রচণ্ড প্রাণের উল্লাসে বর্তমানকে তাহারা মর্যাদা দেয়। কবি ইহাদের জীবনও ভালোবাসেন।

৪র্থ স্তবক

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—অরণ্যের হিংস্র ভয়াবহ ব্যাঘ্র।

দেহ দীপ্তোজ্জ্বল · বিদ্যুতের বেগে—অরণ্যের মধ্যে বাস করে প্রবল ব্যাঘ্র। সে অবহেলায় নিজের শরীর বহন করে। তাহার দেহ প্রদীপ্ত স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল। অগ্নিবজ্রের মতো দেহ লইয়া রুদ্রকণ্ঠে গর্জন করিয়া বিদ্যুতের বেগে ব্যাঘ্র ঝাঁপাইয়া পড়ে শিকারের উপর।

অনায়াস সে .....স্বাদ—ব্যাঘ্রের যে শারীরিক মহিমা, তাহার জন্য তাহাকে কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। সে মহিমা তাহার জন্মগত। শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার যে তীব্র আনন্দ যে দৃপ্ত গরিমা, কবি তাহার স্বাদ লইতে ইচ্ছা করেন।

ইচ্ছা করে···নব নব স্রোতে—বিশ্বের সর্বত্র আনন্দধারা বহিয়া যাইতেছে। এই আনন্দধারা যে কতরূপে প্রবাহিত তাহার ইয়ত্তা নাই। কবির ইচ্ছা জাগে, বিশ্বের সকল পাত্র হইতে আনন্দমদিরাধারা তিনি পান করেন।

৫ম স্তবক

প্রভাত রৌদ্রের......আনন্দ দোলায়—প্রভাতের সূর্যালোক যেমন দিক দিগন্তে ছড়াইয়া যায়। কবিও তেমনি নিজেকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে চান। সারা দিন অরণ্যের মধ্যে, পাহাড়ের উপরে কম্পমান পত্র পল্লবের উপর আলোর মতো নৃত্য করেন। প্রতিটি মুকুলকলিতে চুম্বনের স্পর্শ রাখিয়া তৃণক্ষেত্রের তরঙ্গের উপর আনন্দদোলায় নৃত্য করেন।

রজনীতে চুপে চুপে······সুস্নিগ্ধ আঁধারে—রাত্রিকালে পক্ষীকুল নীড়ে বাস করে। কবির ইচ্ছা করে, চুপে চুপে নিদ্রারূপে পশুপাখির নয়নে আকুল

ঘুমাইয়া দেন। প্রতি গুহা, গৃহে প্রবেশ করিয়া বিশাল একটি আঁচলের মতো বিশ্বকে ঢাকিয়া দেয়।

৬ষ্ঠ স্তবক

আমার পৃথিবী......সবুজমণ্ডল—কবি বসুন্ধরার সহিত আপন প্রাণের নিবিড় সংযোগ অনুভব করিয়াছেন। তিনি জানেন, বসুন্ধরা তাঁহাকে লইয়া অনন্তকাল ধরিয়া অশ্রান্তচরণে সৌরমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছে।

তাই আজি......তৃণাংকুর—কবি পদ্মাতীরে বসিয়া আনমনে সম্মুখপানে তাকাইয়া থাকেন। তাঁহার মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে বসুন্ধরার বিচিত্র দৃশ্যাবলী ফুটিয়া ওঠে। তিনি দেখেন, বসুন্ধরার মাটির মধ্য হইতে তৃণরাজি কেমন সুন্দরভাবে অঙ্কুরিত হইতেছে।

কুসুম মুকুল...... ওঠে হরষিয়া—কবি বসুন্ধরার পানে তাকাইয়া দেখেন, সুন্দর বৃক্ষের মুখে কি আনন্দের মধ্যে কুসুম মুকুল ফুটিয়া থাকে, প্রভাত কিরণে তৃণলতাগুল্ম অদ্ভুত আনন্দের আবেগে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে।

তাই আজি কোনদিন... মহাব্যাকুলতা—শস্যক্ষেত্রে যখন ফসল পাকিয়া থাকে, তাহার উপর পড়ে শরতের কোমল আলো, আলোকের মধ্যে নারিকেল গাছগুলি ঝিকমিক করিতে থাকে, তখন কবির অন্তরে জাগে মহাব্যাকুলতা। তিনি বসুন্ধরা নিবিড় সান্নিধ্যলাভের জন্য অস্থির হইয়া ওঠেন।

সে বিচিত্র...... পরিচিত রব—কবি তাঁহার চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে সাদর আহ্বান শুনিতে পান। এই পৃথিবীতে তাঁহার চিরদিনকার সঙ্গীরা সর্বদা আনন্দকলরবে মত্ত। কবি যেন তাহাদের আনন্দ খেলার পরিচিত ধ্বনি শুনিতে পান।

দূর করো সে বিরহ...... সন্ধ্যাকাশে—কবি বসুন্ধরার বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সহিত বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। সন্ধ্যার আলো অন্ধকারে তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে বিশাল প্রান্তর। দূর গোষ্ঠে—মাঠ পথে গাভীগুলি যখন ধূলি উড়াইয়া ফেরে, তরুঘেরা গ্রাম হইতে সন্ধ্যাকাশে ধোঁয়ার রেখা ভাসিয়া যায়।

মনে হয়... অন্তরে—বসুন্ধরার অসংখ্য রূপবৈচিত্র্য আপন মহিমায় উজ্জ্বল। কবি তাহাদের সান্নিধ্য লাভ করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার মনে হয়, তিনি একাকী নির্বাসিত হইয়া পড়িয়া আছেন। বসুন্ধরার সমস্ত বহির্বৈচিত্র্যকে তিনি অন্তরের মধ্যে টানিয়া লইতে চান। বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিঃশেষে নিজেকে মিলাইয়া দিতে তাঁহার সাধ হয়।

আমারে ফিরায়ে......তৃষিত পরাণি যত—কবি বসুন্ধরার বিচিত্ররূপের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছেন। যে স্থান হইতে শতসহস্ররূপে নবনব প্রাণ অঙ্কুরিত হইতেছে, শতলক্ষসুরে গান গুঞ্জরিত হইতেছে, অসংখ্য ভঙ্গীতে নৃত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, চিত্ত অপূর্ব ভাবস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, বসুন্ধরা যেখানে বৎসের মতো স্তন্যদায়িনী, তাহাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে অগণ্য তরুলতা পশুপাখি, কবি সেই সব স্থানে আপন হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া দিতে চান।

নিখিলের সেই···সকলের সনে—প্রকৃতি ও জীবজগৎ বসুন্ধরার আনন্দরস যেরূপে আস্বাদন করিতেছে, কবিও তাহাদের সহিত একাত্ম হইয়া বসুন্ধরার বিচিত্র আনন্দরস উপভোগ করিতে চাহিয়াছেন।

মোর মুগ্ধ ভাবে ·····গান—বসুন্ধরার রূপবৈচিত্র্য কবির প্রাণে গভীর মুগ্ধতার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে সৃষ্টিপ্রেরণা। তাঁহার হৃদয়ের রঙে আকাশ ও পৃথিবী রঙীন হইয়া উঠিবে। হৃদয়ের এই আনন্দ উপলব্ধি কবির লেখনীতে কবিতা হইয়া উঠিবে, প্রেমিকের চোখে স্বপ্ন হইয়া উঠিবে, আর পাখির কণ্ঠে গান হইয়া উঠিবে।

এইসব তরুলতা ··জীবনসমাজ—কবি বসুন্ধরার চোখ হইতে একদিন বিদায় লইবেন। কিন্তু বসুন্ধরার বুকে তখনও জাগিয়া থাকিবে তরুলতা, গিরি নদীবন সুনীল আকাশ, উদার সমীর, আলোকধারা, আর জীবনসমাজ। এগুলি কি তখনও কবিকে একইভাবে আকর্ষণ করিবে।

ফিরিব তোমারে ·····বুকে—কবি জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বসুন্ধরার বুকেই ফিরিতে চান। কীট পতঙ্গ পশু পাখি তরুলতা গুল্ম প্রভৃতি যে কোন্ একটি রূপে তিনি বসুন্ধরার বুকে স্থান পাইতে চান। বসুন্ধরা যেন তাহাকে স্নেহধারা ঢালিয়া কোলে তুলিয়া লন, ইহাই কবির প্রার্থনা।

তারপরে ধরিত্রীর ·····পথে—শৈশব পার হইবার পর বসুন্ধরার যুবক সন্তানরূপে কবি সুদুর্গম পথে বাহির হইতে চান—অতিদূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্ক সমাজে তিনি বিচরণ করিতে অভিলাষী।

তোমার আসন ···মুখ পানে চেয়ে—কবি বসুন্ধরার রূপবৈচিত্র্য নানা ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার পিপাসা মেটে নাই। বসুন্ধরার সুন্দর রূপ এখনও কবির চোখে স্বপ্ন জাগায়, এখনও বসুন্ধরার সব কিছু তাঁহার কাছে রহস্যপূর্ণ মনে হয়। তিনি স্তব্ধ বিস্ময়ে বসুন্ধরার বিশাল বৈচিত্র্যের পানে তাকাইয়া থাকেন। শিশু যেমন মাতার মুখের পানে শিশুর মতো তাকাইয়া থাকে, কবিও তেমনি শিশুর মতো বসুন্ধরার মুখপানে তাকাইয়া থাকেন।

জননী, লহো গো ·····দূরে—বসুন্ধরার বিপুল প্রাণের উৎসের কাছে কবি পৌঁছাইতে চান। তাঁহার বিপুল জীবনধারার গোপন গভীরে কবি নিজের স্থান করিয়া লইতে চান।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা

(১) **শুভ্র উত্তরীয় প্রায়**
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনার
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দ নিভৃতে। (স্তবক ১)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বসুন্ধরার অনন্ত বৈচিত্র্যের পটভূমিতে কবি আপন হৃদয়ের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন।

বসুন্ধরার অপরূপ রূপবৈচিত্র্য ও অনন্ত রহস্যময়তা কবিচিত্তকে আবিষ্ট করিয়া

রাখিয়াছে। তিনি বসুন্ধরার অনন্ত বৈচিত্র্যের সহিত নিজেকে একাত্ম করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। আপন সংকীর্ণ সীমিত গণ্ডীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি বসুন্ধরার অসংখ্য রূপের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। প্রাণের উল্লাসে তিনি স্বর্ণ শীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্র আঙুলের দ্বারা স্পর্শ করিতে চাহিয়াছেন। যেখানে যত পুষ্পদল ফুটিয়া থাকে, সেগুলিকে সুধাগন্ধে ও মধুগন্ধে ভরিয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন। মহাসিন্ধুর অনন্ত জলরাশি গাঢ় নীলিমায় পরিব্যাপ্ত করিয়া অনন্ত কল্লোলগীতে সিন্ধুর তীরে তীরে নৃত্য করিতে তাঁহার মনে সাধ হয়। মহাসিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় বাণী দূর হইতে দূরান্তরে ছড়াইয়া যান। শৈলশৃঙ্গে শুভ্র উত্তরীয়ের মতো তিনি নিজেকে বিছাইয়া রাখিতে চান। শৈলশৃঙ্গের ঊর্ধ্বভাগে নিষ্কলঙ্ক নীহারের নির্জনলোকে অবস্থিতি তাঁহার কাম্য। বসুন্ধরার অনন্ত বৈচিত্র্য তিনি দেহে মনে উপভোগ করিতে চান।

(২) চারিদিকে শৈলমালা
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি। (স্তবক-২)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বসুন্ধরার বিশাল বৈচিত্র্যের পটভূমিকায় কবি এই অংশে আপন মানস অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন।

বসুন্ধরার অপরূপ রূপ ও অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি নিজেকে নিঃশেষে মিশাইয়া দিতে চান। সংকীর্ণ গণ্ডীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি অনন্ত মুক্তির মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিতে চান। তাঁহার মন বারবার চলিয়া যায় সুদুর্গম দূরদেশে যেখানে কোন পথ নাই, তরু নাই। সেখানে শুধু বালুকাময় ধূ-ধূ প্রান্তর। অনন্ত পিপাসা সেখানে মত্ত উল্লাসে নিজেকে অনাবৃত করিয়া রাখে। রৌদ্রালোকে অনন্ত বালুকারাশি ঝকমক করিতে থাকে। বসুন্ধরা যেন এখানে জরতপ্ত দেহে পড়িয়া থাকে। কবি কতদিন মনে মনে চারিদিকে শৈলমালায় মধ্যবর্তী এক নীল সরোবরের ছবি দেখিয়াছেন। সেই সরোবরের জলরাশি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। শৈলমালার শিখরদেশে খণ্ড খণ্ড মেঘদল সংলগ্ন হইয়া আছে। শিশু মাতৃস্তন পান করিবার সময় মাতার দেহে যেমন সংলগ্ন হইয়া থাকে, খণ্ড মেঘদলও তেমনি পাহাড়ের শিখর দেশে সংলগ্ন হইয়া আছে। কবি মানসচোখে এই দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া যান।

(৩) রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কবি এখানে বসুন্ধরার বিশাল বৈচিত্র্যের কথা বলিয়াছেন।

কবি বসুন্ধরার অপরূপ ও বিশাল বৈচিত্র্যের সহিত একাত্ম হইতে চাহিয়াছেন। বসুন্ধরার অনন্ত বৈচিত্র্য তাহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি মনে মনে মহামেরুদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন—পৃথিবী সেখানে যেন অনন্তকুমারীব্রত গ্রহণ করিয়াছে। বসুন্ধরা সেখানে আদিম অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। মহামেরুদেশ চিরনিঃসঙ্গ, চিরনিঃস্পৃহ। এখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া রাত্রি বিরাজ করে। রাত্রির শেষে আসে দিন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। মেরুদেশের রাত্রি আসে। কিন্তু এই রাত্রিতে ঘুমাইবার কেহ নাই। এখানে কোন মানুষ নাই তাই এখানে কোন জীবনের প্রকাশ নাই। এখানে অনন্তকাল ধরিয়া অনিমেষ নয়নে বসুন্ধরা যেন জাগিয়া থাকে। পুত্রের মৃত্যু হইলে জননীর চোখের ঘুম চলিয়া যায়। জননী বিনিদ্র নয়নে শূন্য শয্যার উপর জাগিয়া থাকে। মেরুদেশে বসুন্ধরাও যেন পুত্রহারা জননীর মতো দীর্ঘরাত্রি জাগিয়া কাটায়।

(৪) ইচ্ছা করে সে নিভৃতে
গিরি ক্রোড়ে সুখাসীন ঊর্মিমুখরিত
লোক নীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। (স্তবক-৩)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। বসুন্ধরার অনন্ত বৈচিত্র্যের পটভূমিকায় কবি আপন হৃদয়ের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন।

কবি বসুন্ধরার অপরূপ রূপ ও অনন্ত বৈচিত্র্যের আস্বাদন করিতে চান। তাঁহার মানস কল্পনায় ফুটিয়া ওঠে বসুন্ধরার অগণ্য রূপবৈচিত্র্য। তিনি নূতন নূতন দেশের বর্ণনা পাঠ করেন, তাঁহার চিত্ত সবকিছু স্পর্শ করিবার জন্য অধীর হইয়া ওঠে। তিনি মনে মনে কল্পনা করেন পাহাড়ঘেরা ছোটো একটি গ্রামের কথা। সমুদ্রের তীরে নীলবর্ণ পর্বত সংকটে সেই গ্রাম। সমুদ্রের তীরে মাছ ধরিবার জাল শুকাইতেছে। জলের উপর দিয়া নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরিতেছে। কবি এই পাহাড়ঘেরা গ্রামের স্বপ্নে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি এখানে কোনদিন হয়তো উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তথাপি গ্রামখানিকে তাঁহার খুব আপন মনে হয়। তাঁহার ইচ্ছা করে, সেই পাহাড়ঘেরা গ্রামখানিকে হৃদয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া ধরেন। তাঁহার অধিবাসিদের সঙ্গে প্রাণের মিতালি পাতাইতে তিনি অভিলাষী।

(৫) ইচ্ছা করে বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পা হতে
আনন্দমদিরা ধারা নব নব স্রোতে। (স্তবক-৩)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। বসুন্ধরার বিশাল বৈচিত্র্যের পটভূমিকায় কবি এখানে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন।

বসুন্ধরার অপরূপ রূপ ও বৈচিত্র্যের কোন সীমা নাই। বসুন্ধরার জল স্থল অন্তরীক্ষে প্রকৃতিজগৎ ও জীবজগৎ অসংখ্য রূপে নিজেদের প্রকাশ করিতেছে।

কবি বসুন্ধরার অসংখ্য বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন দুর্গম মেরুদেশে বিচরণ করিতে চাহিয়াছেন, অন্যদিকে বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক, নির্ভীক তাতার, শিষ্টাচারী জাপান, প্রবীণ চীন—এই সকল জাতির ঘরে-ঘরে তিনি জন্মলাভের বাসনা জানাইয়াছেন। আদিম বর্বর উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারার আস্বাদন লাভের জন্যও তিনি সমান আগ্রহী। আদিম বর্বর জাতি অতীত লইয়া কোন চিন্তা করে না। তাহারা শুধু বর্তমান লইয়া উল্লাসে নৃত্য করে। বনের ব্যাঘ্র প্রকাণ্ড শরীর লইয়া অবহেলে শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। ব্যাঘ্রের সেই মহিমার স্বাদও কবি লাভ করিতে চান। বিশ্বের যেখানে যত আনন্দের উৎস আছে, সেই সকল আনন্দের উৎস হইতে আনন্দধারারাশি পান করিবার জন্য কবি মনের মধ্যে তীব্র ইচ্ছা অনুভব করেন। বিশ্বের সকল আনন্দধারায় তিনি নিজেকে মিশাইয়া দিতে চান।

(৬) ইচ্ছা করে মনে মনে—
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে। (স্তবক-৪)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। বসুন্ধরার বিশাল বৈচিত্র্যের পটভূমিকায় কবি আপন হৃদয়ের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন।

কবি বসুন্ধরার বিশাল বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে মিশাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে জাগিয়াছে অবারিত মুক্তির সঙ্গীত। নদীর দুই তীরে তীরে যাহারা আছে, তাহাদের জন্য পিপাসার জল দান করিতে তাঁহার মনে সাধ জাগে। উদয়সমুদ্র হইতে অস্তসমুদ্রের সীমানায় তিনি নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন। দুর্গম পাহাড়ের নিভৃতে যে সকল জাতি সংগোপনে বাস করিতেছে, তাহাদের তিনি স্বজন করিয়া তুলিবার কল্পনা করেন। পৃথিবীর যেখানে যত জাতি আছে, তাহাদের সকলের সহিত তিনি মিশিয়া থাকিতে চান। পৃথিবীর সকল জাতির সহিত তিনি অন্তরের নিবিড় সংযোগ অনুভব করেন। সকলেই যেন তাঁহার আত্মার আত্মীয়।

(৭) শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অজগর প্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্ব ভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে। (স্তবক-৫)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। বসুন্ধরার বিশাল রূপবৈচিত্র্যের পটভূমিকায় কবি আপন হৃদয়ের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন।

বসুন্ধরার পানে তাকাইয়া কবির প্রাণ বারবার প্রচণ্ড উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে। বসুন্ধরার রূপবৈচিত্র্য তাঁহার গভীরে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। বসুন্ধরার জীবজগৎ ও প্রকৃতিজগতের সহিত তিনি একাত্ম হইয়া থাকিতে চাহিয়াছেন।

বসুন্ধরার সমুদ্রমেখলা পরা কটিদেশ বক্ষের কাছে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছে। প্রভাতের রৌদ্র যেমন প্রকৃতির বুকে ছড়াইয়া পড়ে, কবিরও তেমনি প্রকৃতির সৃষ্টির উপর নিজেকে ছড়াইয়া দিতে সাধ জাগিয়াছে। রাত্রিকালে পশু পাখিরা যে যাহার ঘরে ফেরে। কবির ইচ্ছা করে, নিদ্রারূপে তিনি প্রতিটি পশু-পাখির চোখে হাত বুলাইয়া তাহাদের ঘুম পাড়াইয়া দেন। প্রতিটি নীড়, প্রতিটি গুহা, প্রতিটি গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি সকলের দেহে মনে শান্তির আবেশ ছড়াইয়া দেন। একটি বৃহৎ আঁচলের মতো নিজেকে বিস্তার করিয়া তাহা দিয়া এই বিশাল বিশ্ব ভূমিকে স্নিগ্ধ আঁধারে ঢাকিয়া রাখিতে তাঁহার মনে সাধ জাগে। রাত্রিকালে বসুন্ধরার বুকে নামিয়া আসুক স্নিগ্ধ প্রশান্তি, ইহাই কবির কাম্য।

(৮) ডাকে যেন মোরে—

অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন ; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব। (স্তবক-৬)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কবির প্রতি প্রতিনিয়ত বসুন্ধরার যে আহ্বানবাণী ধ্বনিত হইতেছে, তাহাই এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।

কবি বসুন্ধরার অপরূপ সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া উহার সহিত আপন প্রাণের নিবিড় সংযোগ স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। বসুন্ধরার জল স্থল অন্তরীক্ষের সকল কিছুর সহিত তিনি প্রাণের নিবিড় সাযুজ্য অনুভব করিয়াছেন। তিনি বসুন্ধরার সর্বত্র নিজেকে ছড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। শরতের কিরণ যখন শস্যক্ষেত্রের পাকা শস্যরাশির উপর পড়ে, কিংবা নারিকেল দলগুলি থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। তখন কবির হৃদয়ে জাগে মহাব্যাকুলতা। তাঁহার মনে পড়ে সেই দিনের কথা যখন তাঁহার মন ছিল জলে স্থলে সর্বব্যাপী হইয়া। আবার তিনি তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে বসুন্ধরার প্রবল আহ্বান বাণী শুনিতে পাইতেছেন। তিনি জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বসুন্ধরার বুকে বিভিন্ন রূপে খেলা করিয়াছেন। কখনো তিনি প্রকৃতিজগতে বাস করিয়াছেন, কখনো বাস করিয়াছেন জীবজগতে। এই সকল জগতের খেলাঘর হইতে তিনি তাহার চিরদিনের সঙ্গীদের আনন্দখেলার কলধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন। তাহারা তাঁহাকে নানাভাবে আহ্বান জানাইতেছে।

(৯) আনন্দের রস

কতরূপে হতেছে বর্ষণ, দিক হতে
ধ্বনিছে কল্লোলগীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন এক হয়ে
সকলের সনে। (স্তবক-৬)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গৃহীত।

হইয়াছে। বসুন্ধরার অনন্ত রূপবৈচিত্র্যের পটভূমিতে কবির আনন্দপ্রবণতা ও বিশ্বজনীন অনুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বসুন্ধরার বুকে যে অনন্ত বৈচিত্র্য আছে, তাহা কবিকে প্রতিমুহূর্তে নিগূঢ় আনন্দরসে ভরিয়া দিয়াছে। বসুন্ধরার বুকে অসংখ্য উৎস হইতে আনন্দরস অহরহ বর্ষিত হইতেছে। কবি বসুন্ধরার অগণ্য বৈচিত্রের সহিত একাত্ম হইতে চাহিয়াছেন। বসুন্ধরার বুক হইতে নিরন্তর যে আনন্দধারা উৎসারিত হইতেছে, বিশ্বের সকলে তাহার স্বাদ লাভ করিতেছে। কবি বিশ্বের সকলের সহিত একাত্ম হইয়া বসুন্ধরার আনন্দরস আস্বাদন করিতে চাহিয়াছেন। বসুন্ধরার অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি নিজেকে বিলীন করিয়া দিতে চান।

(১০) ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয় মাঝে; কীট পশু পাখি
তরু গুল্ম লতা রূপে বারংবার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে। (স্তবক-৬)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অংশে বসুন্ধরার কাছে কবির প্রার্থনাবাণী ধ্বনিত হইয়াছে।

বসুন্ধরার সহিত কবির জন্মজন্মান্তরের বন্ধন। বসুন্ধরার অপরূপ রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে কবি বারবার একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। বসুন্ধরার বুকে যত দেশ আছে, কবি সকল দেশে মানস ভ্রমণ করিয়াছেন। যত জাতি আছে, সকলের সহিত একপ্রাণ হইয়া গিয়াছেন। এই বসুন্ধরার সহিত বন্ধন তিনি ছিন্ন করিতে চান না। তিনি বসুন্ধরার তরুলতা গিরি নদী বন উপবন সুনীল আকাশ, উদার বাতাস, জাগরণপূর্ণ আলো আর সমাজের মধ্যে চিরদিন বিরাজ করিতে চান। তিনি বসুন্ধরাকে চিরদিন নিবিড় ভালোবাসার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে চান। কীট পশু পাখি তরুলতা গুল্ম প্রভৃতি বিচিত্র রূপের মধ্যে বারবার আত্মপ্রকাশ করিতে চান। বসুন্ধরার বুকে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন। বসুন্ধরার জীবনরসে তিনি যেরূপে নিজের জীবন পূর্ণ করিয়াছেন। তাহাতে বসুন্ধরার বুকেই তিনি বারবার ফিরিয়া আসিতে চান।

(১১) তারপরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশ মাঝে
অতিদূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্ক সমাজে
সুদুর্গম পথে। (স্তবক-৬)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অংশে কবি আপন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন।

কবি বসুন্ধরার বুকে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার সমস্ত-রূপ বৈচিত্র্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বসুন্ধরার নিবিড় স্নেহমমতা তাঁহার জীবন পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। কবি জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বসুন্ধরার বুকে নানা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার স্নেহের স্বাদ পাইতে চান। তাঁহার জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা বসুন্ধরা পূর্ণ করিয়া দিবে। বসুন্ধরা তাহাকে নিবিড় স্নেহের মধ্য দিয়া বড় করিয়া তুলিবে। কবি বারবার

বসুন্ধরার বুকেই জন্মগ্রহণ করিতে চান। বসুন্ধরার বুকে শৈশব কাটিয়া গেলে তিনি যুবক হইয়া দেশ দেশান্তরে দুর্গম পথে অভিযান করিতে চান। তাঁহার বাহুতে থাকিবে বল, বক্ষে থাকিবে সাহস। দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্ক সমাজে দুর্গম পথে তিনি বিজয় অভিযান করিতে চান। বসুন্ধরার বুকে যত অপরূপ বৈচিত্র্য সম্ভার আছে, তিনি তাহার পূর্ণ স্বাদ পাইতে চান। বসুন্ধরার বুকেই তিনি জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে অভিলাষী।

(১২) এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলই রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশু প্রায়,
মুখ পানে চেয়ে। (স্তবক-৬)

আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসুন্ধরা' কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বসুন্ধরার প্রতি কবির গভীর আসক্তির বিষয় প্রচারিত হইয়াছে।

কবি সারাজীবন ধরিয়া বসুন্ধরার অপরূপ রূপবৈচিত্র্য উপভোগ করিয়াছেন। বসুন্ধরার বিশাল বৈচিত্র্য তাঁহার প্রাণে আনন্দের হিল্লোল জাগাইয়া তুলিয়াছে। বসুন্ধরার প্রতিটি রূপের সহিত তিনি একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। নানাভাবে তিনি তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এখনো যেন তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। বসুন্ধরার সবকিছুই তাঁহার কাছে অনন্ত রহস্যপূর্ণ মনে হয়। বসুন্ধরার বৈচিত্র্যের দিকে তাকাইয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। শিশু যেমন চোখ ভরা বিস্ময় লইয়া মাতার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে কবিও তেমনি চোখভরা বিস্ময় ও মনভরা মুগ্ধতা লইয়া বসুন্ধরার পানে তাকাইয়া আছেন। বসুন্ধরার স্নেহরসে অভিষিক্ত হইবার জন্ত তাঁহার দেহমন আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'বসুন্ধরা' কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উত্তর। 'সারসংক্ষেপ' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২। 'বসুন্ধরা' কবিতার নামকরণের তাৎপর্য আলোচনা কর।

উত্তর। 'নামকরণ' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩। 'বসুন্ধরা' কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে মর্ত্য প্রীতির পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। 'বসুন্ধরা' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ মর্ত্যপ্রীতির পরিচয় উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি বসুন্ধরার অপরূপ রূপসম্ভার ও বিশাল বৈচিত্র্যের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। বসুন্ধরার সহিত তিনি জন্ম জন্মান্তরের নিবিড় সাযুজ্য অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার মনে হইয়াছে, তিনি সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে মাটির সহিত মিশিয়া আছেন এবং বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ নিজের জীবনধারার মধ্যে অনুভব করিয়াছেন। তরুলতা, আকাশ, মাঠ, বালুচর, নদী, সন্ধ্যাতারাকে তাঁহার পরমাত্মীয়, বলিয়া মনে

হইয়াছে। এগুলি তাঁহার অন্তরঙ্গ জীবনকে গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। তিনি এ সম্পর্কে 'ছিন্নপত্রে' লিখিয়াছেন—

"ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে, ওটাকে এমন ভালোবাসি। ওর এই গাছপালা, নদী, মাঠ, কোলাহল, নিস্তব্ধতা, প্রভাত, সন্ধ্যা, সমস্তটা শুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করে। মনে হয়, পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যেসব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম ?"

'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নিজের দেহমনকে নিঃশেষে প্রসারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। বিশ্ব প্রকৃতির সহিত তিনি একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। "রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশ্ব প্রকৃতির সহিত একাত্মতার অনুভূতি। এক চেতনা প্রথম বাষ্প নীহারিকা, তরুলতা সরীসৃপ, পশু পক্ষী প্রভৃতি বিচিত্র অভিব্যক্তির স্তরের মধ্য দিয়া বর্তমান মানবজীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছে। একই প্রাণ জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগতের মধ্যে বিকাশের স্তরে স্তরে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। মানুষ একদিন তৃণলতা ফল পুষ্প পশু পক্ষীর সহিত এক হইয়া একত্র জীবন কাটাইয়াছে, তাহাদের সহিত মানুষের একটা অন্তরের যোগ, একটা নাড়ীর টান বিদ্যমান, তাই বসুন্ধরার বুকের সমস্ত জিনিস তাহার অতো ভালো লাগে—তৃণ লতা গুল্ম ফল পুষ্পের আনন্দ চাঞ্চল্য, নদ নদী গিরি সমুদ্র আকাশের সৌন্দর্য ও সঙ্গীত মনকে অতো উতলা করে। কবি এই আবেগময় অনুভূতিকে কাব্যের ঐশ্বর্যদান করিয়াছেন।"

বসুন্ধরার সহিত কবির-প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক বলিয়া তিনি বারবার প্রাণের উল্লাসে বসুন্ধরার প্রতিটি রূপকে আকণ্ঠ উপভোগ করিতে চাহিয়াছেন—

যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে, নব পুষ্পদল
করি পূর্ণ সংগোপনে সুবর্ণ লেখায়
সুধা গন্ধে মধুবিন্দুভারে।

কবি জল স্থল অন্তরীক্ষের প্রতিটি রূপ সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া যাইতে চাহিয়াছেন। 'তৃণ গুল্ম, গাছপালা, নদী পর্বত, মেঘ, বৃষ্টির সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া দিয়া তিনি নিবিড় বৈচিত্র্যময় আনন্দ উপভোগ করিতে চান—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি উৎসুক হইয়া পড়িয়াছেন—

ইচ্ছা করে বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দ মদিরা ধারা নব নব স্রোতে।

'যে ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যের প্রাণরস ধরিত্রীর বক্ষ হইতে নিঃসারিত হইয়া ফল পুষ্প তরুলতা, নদ নদী পর্বত অরণ্যকে নিগূঢ় আনন্দরসে অভিষিক্ত করিতেছে, কবি সেই প্রাণশক্তিকে সারা দেহমন দিয়া অনুভব করিতেছেন। তাঁহার মনে পড়িতেছে, একদিন তিনি জলে স্থলে আকাশে পরিব্যাপ্ত ছিলেন। তাই এই রূপরসময় বিচিত্র ধরণী তাঁহাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে—তিনিও

তাঁহার সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। সেই সৌন্দর্য, প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের ধারা বসুন্ধরার বক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইতেছে, কবি তাহার সহিত যুক্ত হইতে চাহিতেছেন—

আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে, মুকুলিছে, মঞ্জুরিছে প্রাণ,
শতেক সহস্র রূপে—গুঞ্জরিছে গান
শত লক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে।

কবি সকলের সহিত একাত্ম হইয়া নিখিলের আনন্দ রসধারা আস্বাদন করিতে চান। 'বিশ্ব প্রকৃতির সহিত এক আত্মা, এক দেহ হইয়া অন্তহীন রসোপলব্ধির পিপাসা মিটাইতে তিনি উৎসুক। তিনি কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, তরুলতা হইয়া যুগে যুগে জন্মে জন্মে ধরিত্রীর শুভ্র রস সুধা পান করিবার জন্ত ব্যাকুল; নবনবরূপে জীবনের আস্বাদ তিনি পাইতে চাহেন—জ্যোতিষ্কলোকের তারায় তারায় নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিচরণ করিয়া তাহাদিগকে দেখিবার ও জানিবার আনন্দও তিনি লাভ করিবেন। নবনব রসাস্বাদনের জন্ত কবিচিত্তের ইহাই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা।'

বসুন্ধরার সহিত কবি প্রাণের বন্ধনে আবদ্ধ। তথাপি হয়তো প্রাকৃতিক নিয়মে এ বন্ধন একদিন ছিন্ন হইয়া যাইবে। সেই ভয়াবহ শূন্যতার কথা স্মরণ করিয়া কবিচিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর আলো হাসি গান আকাশ বাতাস স্নেহপ্রীতি প্রেম তাঁহার জীবন হইতে হারাইয়া যাইবে, ইহা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ। তাই তিনি বসুন্ধরার কাছে ব্যাকুল প্রশ্ন রাখিয়াছেন—

ছেড়ে দিবে তুমি
আমাকে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি—
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকা বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি?

কবি জানেন, বসুন্ধরার সঙ্গে এ বন্ধন ছিন্ন হইবার নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়া তিনি আবার নবজন্ম লাভ করিবেন, বসুন্ধরা আবার অপরিমেয় স্নেহ দিয়া তাঁহাকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে—

যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা,
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্য রস সুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।

বসুন্ধরা কবির জননী। কবি শিশুর মতো জননী বসুন্ধরার মুখপানে তাকাইয়া আছেন। বসুন্ধরার শ্যামল মাটির ক্রোড় তাঁহার শান্তির অক্ষয় স্বর্গ। বসুন্ধরার তরুলতা গিরি নদী বন সুনীল গগন, উদার সমীর, জাগরণ পূর্ণ আলো, জীবন

সমাজ—সকল কিছুর প্রতি কবির সুগভীর প্রীতির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য কবিতার ছত্রে ছত্রে কবি বসুন্ধরার প্রতি তাঁহার সুনিবিড় আকর্ষণের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রশ্ন ৪।—'বসুন্ধরা' কবিতায় বিশ্বানুভূতির যে পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর।—রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। বিশ্বজনীন অনুভূতি তাঁহার কবিমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৃষ্টি বিশ্বপ্রাণের দ্বারা প্রাণবান। সৃষ্টির প্রথমে এক আদি প্রাণের প্রবল উচ্ছ্বাস এই সৃষ্টিতে রূপায়িত হইয়াছিল। 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' তখন মানুষ ও প্রকৃতিতে কোন ভেদ ছিল না। এখন মানুষ ও প্রকৃতি ভিন্নরূপ ধারণ করিলেও উহাদের মধ্যে সমপ্রাণতা আছে। কারণ উহারা একই প্রাণের ভিন্ন রূপাভিব্যক্তি। তাই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবের প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক; ইহা মূল প্রাণের ঐক্যের যোগ। কবি তাই অত সহজে এই নিখিল বিশ্বের সঙ্গে নিজের প্রাণের গভীর বন্ধন অনুভব করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্ররূপকে কবি নিত্য আনন্দের অমৃতরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আলোচ্য 'বসুন্ধরা' কবিতাটি কবির বিশ্বজনীন অনুভূতির রঙে উজ্জ্বল। বসুন্ধরার বিভিন্ন দেশে প্রকৃতি জগৎ ও জীব জগৎ অপরূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া রাখিয়াছে। ইহার এক রূপে আছে বালুকাময় মরুভূমি— 'মহা পিপাসার মরুভূমি', অন্যরূপে 'মহামেরুদেশ'—

> যেখানে লয়েছে ধরা
> অনন্তকুমারী ব্রত, হিমবস্ত্র পরা
> নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্ব আভরণহীন;
> যেথা দীর্ঘ রাত্রি শেষে ফিরে আসে দিন
> শব্দশূন্য সংগীতবিহীন।

কবি বসুন্ধরার প্রতিটি স্থানের সহিত আপন হৃদয়ের নিবিড় নৈকট্য অনুভব করিয়াছেন। কোন স্থানই তাঁহার পর নহে, প্রতিটি দেশই তাঁহার স্বদেশ—সকল জাতি তাঁহার স্বজাতি—

> ইচ্ছা করে মনে মনে—
> স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
> দেশে দেশান্তরে।

কবি কখনো দুর্দম স্বাধীন আরব সন্তানের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন, কখনো 'নিজিত প্রস্তর পুরী' তিব্বতের বৌদ্ধমঠে বিচরণ করিয়াছেন। দ্রাক্ষাপায়ী গোলাপ কাননবাসী পারসিক, অশ্বারূঢ় নির্ভীক তাতার, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান, প্রবীণ প্রাচীন চীন—সকলের ঘরে ঘরে তিনি বারবার জন্মলাভ করিতে চাহিয়াছেন। শুধু সভ্য জাতির সহিত নয়, আদিম অসভ্য বর্বর জাতির সহিতও কবি হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ—তাহাদের জীবনস্রোতেও তিনি নিঃশেষে মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছেন—

> অকলুষ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
> নাহি কোন ধর্মাধর্ম, নাহি কোন প্রথা,

নাহি কোন বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর পর
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত—···
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উন্মাদি—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালোবাসি।

বিশ্বের বুকে নিরন্তর যে আনন্দধারা বহিয়া যাইতেছে, কবি সে আনন্দধারা আকণ্ঠ পান করিতে চান। বিশ্বের উদার সমুদ্র হইতে অন্ত সমুদ্রে নিজেকে প্রসারিত করিয়া তিনি বিশ্বের সকল রূপবৈচিত্র্যের অংশ হইতে চান—

ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দ মদিরা ধারা নব নব স্রোতে।

কবির সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তরের। বিশ্বের মাটির সহিত মিশিয়া তিনি যেন 'অনন্ত গগনে অশ্রান্ত চরণে সবিতৃমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহার মধ্যে তৃণ জন্ম লইয়াছে, ভারে ভারে পুষ্প ফুটিয়াছে। তাই আজও তিনি হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর আহ্বানবাণী শুনিতে পাইয়াছেন—

ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে
অনন্ত ভুবন; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব।

কবি চেতনায় বিশ্বের বিচিত্র আনন্দধারায় মধ্যে গভীর ঐকতান ধরা পড়িয়াছে। বসুন্ধরার 'শ্যাম কল্পধেনু' রূপটি তাঁহার মানস নয়নে বারবার ভাসিয়া উঠিয়াছে। অপরূপ রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে বসুন্ধরা 'শ্যাম কল্পধেনু' হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন তাহার চারিদিকে 'তরুলতা পশু পক্ষী কত অগণন তৃষিত পরানি যত।' অজস্ররূপে আনন্দরস বর্ষিত হইতেছে। কবি বিশ্বের সেই বিচিত্র আনন্দ একত্রে, সকলের সঙ্গে এক হইয়া আস্বাদন করিতে চান।

বিশ্বের বিচিত্র রূপসম্ভারের সহিত একাত্ম হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই কবি বসুন্ধরার সহিত বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। মহাকালের আঘাতে তিনি যখন বসুন্ধরার বক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইবেন। তখন কি বসুন্ধরা তাঁহাকে ত্যাগ করিবে? কবি কোনক্রমেই বসুন্ধরার সহিত তাঁহার প্রাণের সম্পর্কের ছেদ চান না। তিনি কীট পতঙ্গ পশুপাখি তরু লতা গুল্ম প্রভৃতি যে কোনরূপেই মাতা বসুন্ধরার বক্ষলগ্ন হইয়া থাকিতে চান। বসুন্ধরার স্নেহরস তাঁহার প্রাণমন গভীর ভাবে অভিষিক্ত করিয়াছে, কিন্তু—

এখনো মিটেনি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন।

কবি বসুন্ধরার সকল রূপ, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে মিশাইয়া দিতে চান। বিশ্বের বিচিত্র সুখের গোপন উৎসস্থানে তিনি নিজের স্থান করিয়া লইতে চান আলোচ্য কবিতায় কবিহৃদয়ের বিশ্বানুভূতি ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রশ্ন ৫। ইচ্ছা করে মনে মনে—
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব লোক সনে
দেশে দেশান্তরে।

প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর।—রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। তাঁহার কবিচেতনায় বিশ্বানুভূতি নিগূঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সংকীর্ণ দেশকালের গণ্ডির বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি বিশাল বসুন্ধরার—প্রতিটি স্থানের প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। বসন্তের আনন্দ যেমন সর্বব্যাপ্ত, কবিও তেমনি নিজেকে দিকবিদিকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন।

কবি একদিকে যেমন পথশূন্য তরুশূন্য ধূ ধূ বালুকাময় 'মহাপিপাসার রঙ্গভূমি' মরুভূমির সন্তানরূপে নিজেকে কল্পনা করিয়াছেন। অন্যদিকে মনে মনে ভ্রমণ করিয়াছেন মহামেরুদেশে—সেখানে বসুন্ধরা হিমবস্ত্র পরিহিত নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ সব আভরণহীন পর্বত সংকট মধ্যবর্তী ছোটো একখানি গ্রামের স্বপ্নে তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, 'গিরিক্রোড়ে সুখাসীন উর্মিমুখরিত সেই লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টন করিয়া ধরিবার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের যেখানে যাহা কিছু আছে, সবকিছুকেই একান্ত আপনার করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। পৃথিবীর মাঝখানে উদয়সমুদ্র হইতে অস্তসমুদ্র পর্যন্ত বিভিন্নস্থানে আপন সীমানা তিনি প্রসারিত করিতে চান। পৃথিবীর যেখানে যত জাতি আছে, সকলের সহিত কবি সাজাত্য অনুভব করিয়াছেন। কাহারও সহিত তাঁহার কোন পার্থক্য নাই। সকল জাতির সহিত তাঁহার অন্তরের নিবিড় সংযোগ। দেশ দেশান্তরের সকল জাতি সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গে তিনি একাত্ম হইয়া থাকিতে চান। প্রাচীন সুসভ্য জাতির সঙ্গে আদিম হিংস্র বর্বর জাতির সঙ্গে কবি অন্তরের সাধর্ম অনুভব করিয়া তাহাদের মধ্যে লীন হইতে চাহিয়াছেন।

প্রশ্ন ৬।—'বসুন্ধরা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বসুন্ধরার যে বিচিত্র রূপমূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দাও।

উত্তর।—'বসুন্ধরা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বসুন্ধরার অপরূপ রূপসজ্জার ও বিশাল বৈচিত্র্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার বিচিত্র রূপমূর্তির পরিচয় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কবিকল্পনায় 'বসুন্ধরা' প্রথমে মাতৃমূর্তিতে সমুদ্ভাসিত। তিনি মৃন্ময়ী মা। প্রকৃতিজগৎ ও জীবজগৎ তাহার সন্তান। নিবিড় স্নেহমমতায় তিনি সন্তানকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

(ইহার পর অন্য প্রশ্নের উত্তর লিখ)

ছন্দ

ছন্দ : সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য :

যে বিশেষ রীতিতে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় এবং মনের মধ্যে বিশেষ ভাব বা রসের সঞ্চার হয় তাহাকে ছন্দ বলে।

যতগুলি সুকুমার কথা আছে, ছন্দ তাহাদের সকলের প্রাণ। নাচের সময় পদবিক্ষেপ যদি এলোমেলো হয়, তবে মনে বিরক্তির সঞ্চার হয়, গানের সময়ও বিশেষ এক রীতি অবলম্বন না করিয়া গায়ক যদি এলোমেলোভাবে চীৎকার করে, তবে তাহার মধ্যে কোন মাধুর্য থাকে না। সুতরাং নাচ গান চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ একটি রীতি অবলম্বন করিয়া উপকরণগুলি সন্নিবেশিত করা হয় বলিয়া মনে রসের সঞ্চার ঘটে। এই বিশেষ রীতিপ্রকরণ ইংরাজীতে rhythm, বাংলায় ছন্দ নামে অভিহিত।

কবিতার মধ্যে ছন্দের লক্ষণগুলি সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়। ছন্দই কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলিতে গেলে ইহাই কাব্যের প্রাণ। ছন্দোযুক্ত বাক্য কাব্যের বাহন।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়—কোন এক দুপুরবেলায় গাড়ি দরজায় দণ্ডায়মান। হেমন্তকালের রৌদ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। এক ভিখারিণী অশথগাছের তলায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু কবির ঘর সরব।

ইহা নিছক গদ্যময় বর্ণনা। মনের মধ্যে ইহা দাগ কাটে না। কিন্তু এই বর্ণনাই যখন অন্যভাবে দেওয়া হয়—

> দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি ; বেলা দ্বিপ্রহর ;
> হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর,
> জনশূন্য পল্লীপথে ধূলি উড়ে যায়
> মধ্যাহ্ন বাতাসে ; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
> ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
> ঘুমায়ে পড়েছে ; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
> ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম—
> শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের—ঘুম।

তখন মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে হিল্লোল এবং মনে অনির্বচনীয় আনন্দ রসের সঞ্চার হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' সম্পর্কে তাই বলিয়াছেন "সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে নাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।"

ছন্দের ইতিহাস :

কাব্যের প্রাণ ছন্দ। ছন্দোবদ্ধ বাক্যই কাব্য। কাব্যসৃষ্টির ইতিহাসের মধ্যেই ছন্দসৃষ্টির ইতিহাস। জনশ্রুতি, মহামুনি বাল্মীকি একদা তমসা নদী হইতে ফিরিবার কালে দেখিতে পাইলেন, কোন ব্যাধ কামমোহিত ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চীর একটিকে বধ করিয়াছে, এবং আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইতেছে ক্রৌঞ্চীর ক্রন্দন। এই করুণ দৃশ্য বাল্মীকির অন্তর বিধুর করিয়া তুলিল। তাঁহার মুখ দিয়া অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল কয়েকটি ধ্বনি—

> মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
> যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম॥

এই ধ্বনিগুলি বাহির হইয়া আসিবার পর বাল্মীকি বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া অকস্মাৎ এসব কি বাহির হইয়া আসিল? ইহার স্বরূপ কি? তিনি বিস্মিতভাবে ইহা লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে নিজের অসামান্য প্রজ্ঞা দিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে যেহেতু তাঁহার মুখ দিয়া পদবদ্ধ বাক্য বাহির হইয়াছে, এবং শোকার্ত অবস্থায় ইহার জন্ম, তাই ইহার নাম 'শ্লোক'।

> 'পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
> শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা।'

(এই বাক্য পদবদ্ধ, ইহার প্রতি পদে সমাক্ষর, ছন্দের তন্ত্রী লয়ে ইহা আন্দোলিত, আমি শোকার্ত হইয়া ইহা উচ্চারণ করিয়াছি, ইহার নাম হোক শ্লোক।)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'। এক হাজার বৎসর পূর্বে রচিত এই বৌদ্ধ চর্যাগীতির মধ্যে বাংলা ছন্দের প্রাচীন রূপটি লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ চর্যাপদ ষোল মাত্রার সংস্কৃত 'পাদাকুলক' জাতীয় ছন্দের আদর্শে রচিত। এই 'পাদাকুলক' ছন্দের আদর্শেই পরবর্তীকালে বাংলায় 'পয়ার ছন্দ' সৃষ্ট হইয়াছে।

বাংলা কাব্যে পয়ার ছন্দের ব্যবহার সর্বাধিক। পয়ার ছন্দেই প্রাচীনকালে ও আধুনিক কালে অধিকাংশ কাব্য রচিত হইয়াছে। "সাধারণ কথাবার্তায় এবং গদ্যে আমরা যে রীতির ব্যবহার করি, সেই রীতি ইহাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী বজায় থাকে। কয়েক লাইন গদ্য বা নাটকীয় ভাষা লইয়া তাহার মাত্রা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে পয়ারের ও গদ্যের মাত্রা নির্ণয় একই রীতি অনুসারে হইতেছে। ...এই কারণে নাট্যকাব্যে, মহাকাব্যে চিন্তাগর্ভ কাব্যে এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়।"

আধুনিক কালেও পয়ার ভাঙিয়াই আধুনিক কবিতার ছন্দ নির্মিত হইয়াছে। মধুসূদন দত্ত পয়ার ভাঙিয়াই 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দেই যে আধুনিক গদ্য কবিতার সৃষ্টির প্রথম সূত্রপাত, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। পয়ার ছন্দ ভাঙিয়াই বাংলার অন্য ছন্দগুলি নির্মাণ করা হইয়াছে।

ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য

বাংলা ছন্দকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, (১) তান প্রধান ছন্দ (২) ধ্বনি প্রধান ছন্দ (৩) শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। ইহা ছাড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ নামে আর এক প্রকার ছন্দও আছে।

তান প্রধান ছন্দ

তান প্রধান ছন্দ পয়ার জাতীয় ছন্দ। এই ছন্দ 'অক্ষরমাত্রিক' বা 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ নামেও পরিচিত।

তান প্রধান ছন্দ বাঙালীর ছন্দ। কবিতা পাঠ করিবার সময় শুদ্ধ অক্ষরধ্বনি ছাড়াও একটি টানা সুরের প্রবাহ থাকে। 'এই টানটাই পয়ারের বিশেষত্ব।' অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান বা তান মিশিয়া থাকে। কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও ওঠে, এবং স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়'

সুতরাং বলা যায়, যে ছন্দের মধ্যে তান বা একটানা সুরধ্বনি প্রবাহিত হইয়া চলে, তাহাকে তান প্রধান ছন্দ বলে।

যেমন—

(১) মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥ (কাশীরাম দাস)

(২) হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ! (মধুসূদন দত্ত)

(৩) এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শা জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন-ধন-মান।
(রবীন্দ্রনাথ)

তান প্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য

তান প্রধান ছন্দে সাধারণ নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়।

(১) এই ছন্দে সাধারণত প্রতি Syllable বা অক্ষরকে একমাত্রা ধরা হয়। কোন শব্দের শেষে হলন্ত Syllable বা অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই মাত্রায় ধরা হয়।

(২) এই ছন্দে 'সাধু ভাষার' শব্দের প্রাধান্য দেখা গেলেও ইহার পাশাপাশি তৎসম ও অর্ধতৎসমও ব্যবহার করা হয়।

(৩) এই ছন্দে স্বরের হ্রস্ব বা দীর্ঘ বিচারের অবকাশ প্রায়শ থাকে না।

(৪) এই ছন্দে একদিকে যেমন যুক্তাক্ষর বর্জিত পঙক্তি রচনা করা যায়, তেমনি যুক্তাক্ষর বহুল পঙক্তি রচনায়ও কোন বাধা নাই।

(৫) এই ছন্দে তানপ্রবাহের জন্য লঘু গুরু অক্ষরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) তান প্রধান ছন্দ পয়ার জাতীয় বলিয়া পয়ারের শোষণ শক্তি ইহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

(৭) তান প্রধান ছন্দ ধীরলয়ের ছন্দ বলিয়া ইহার মধ্যে গতি মন্থরতা পরিলক্ষিত হয়।

ধ্বনি প্রধান ছন্দ

যে ছন্দে উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমানই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তাহাকে ধ্বনি প্রধান ছন্দ বলে।

ধ্বনি প্রধান ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ নামেও পরিচিত।

ধ্বনি প্রধান ছন্দ বিলম্বিত লয়ের ছন্দ। তান প্রধান ছন্দে যে সুরের টান থাকে, ধ্বনি প্রধান ছন্দে তাহা দেখা যায় না।

যেমন—

ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর
যা কিছু হারায়, গিন্নী বলেন কেষ্টা বেটাই চোর।

এই ছন্দে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব, এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষর ব্যবহার করিয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। যেমন—

চারমাত্রার পর্ব—

সে দিন ও দেহ / মধুনিশি প্রাণে গিয়ে / ছিল মিশি
মকুলিত / দশদিশি / কুসুম দ / লে,
দুটি সোহা / গের বাণী হতো যদি / কানাকানি
যদি ওই / মালাখানি / পরাতে গ / লে।

পাঁচমাত্রার পর্ব—

নাহি গো যদি / সে রূপ জ্যোতি / কি আছে তাহে / ক্ষতি বা ?
ও-হিয়া-মাঝে / স্নেহ তো রাজে / তেমনি।
বিগত তব / যত বিভব / অতীত তব / গরিমা
তবু তো তুমি / জনমভূমি / জননী।

ধ্বনি প্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য

ধ্বনি প্রধান ছন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়—

(১) এই ছন্দ বিলম্বিত লয়ের ছন্দ।

(২) এই ছন্দে যৌগিক অক্ষর দুইমাত্রার (দীর্ঘ), অন্য অক্ষর একমাত্রার (হ্রস্ব)। সময় বিশেষে যৌগিক স্বর দুই মাত্রার হইতে পারে।

(৩) এই ছন্দের মধ্যে গীতিধর্ম প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে।

(৪) এই ছন্দে যুক্ত ব্যঞ্জনের আগের স্বরটি দুইটি মাত্রার।

(৫) এই ছন্দে হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের স্বর দীর্ঘ।

(৬) এই ছন্দে খাসবায়ুর পরিমাণের খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে হয়।

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ 'বলবৃত্ত ছন্দ' বা 'ছড়ার ছন্দ' নামেও পরিচিত। যে ছন্দে প্রায় প্রত্যেক পর্বেই অন্ততঃ একটি করিয়া প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, তাহাকে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বলা হয়। এই ছন্দে ছড়া লেখা হয় বলিয়া ইহাকে ছড়ার ছন্দও বলা হয়। যেমন—

(১) বৃষ্টি পড়ে/টাপুর টুপুর/নদেয় এল/বান।
শিব ঠাকুরের/বিয়ে হবে/তিন কন্যা দান॥
এক কন্যা/রাঁধেন বাড়েন/আরেক কন্যা/খান।
আরেক কন্যা/গোসা করে/বাপের বাড়ী/যান॥

(২) আকাশ জুড়ে/চল্ নেমেছে/সূর্যি ঢলে/ছে।
চাঁচর চুলে/জলের কুঁড়ি/মুক্তো ফলে/ছে।

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়।

(১) এই ছন্দে প্রতি পর্বের গোড়ায় একটি করিয়া শ্বাসাঘাত বা stress পড়ে।
(২) এই ছন্দে প্রতি পর্বের চার মাত্রা এবং দুইটি করিয়া পর্বাঙ্গ থাকে।
(৩) এই ছন্দে প্রায় প্রতিটি পর্বে যুগ্ম ধ্বনি ব্যবহার করা হয়।
(৪) এই ছন্দে শ্বাসাঘাত থাকায় লয় দ্রুত হয়
(৫) এই ছন্দে শ্বাসাঘাত থাকায় যৌগিক অক্ষর হ্রস্ব বলিয়া পরিগণিত হয়।
(৬) এই ছন্দ স্বরধ্বনির পরিমিত সংখ্যার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল।
(৭) এই ছন্দে পয়ারের মত সুরপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অক্ষর

সাধারণ অর্থে অক্ষর হইল বিশেষ কোন বর্ণ বা হরফ। তবে ছন্দের ক্ষেত্রে 'অক্ষর' একটি বিশেষ অর্থ বহন করে।

বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'অক্ষর' বলা হয়। 'ইহাতে একটিমাত্র স্বরের (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) ধ্বনি থাকে, ব্যঞ্জনবর্ণ জড়িত থাকিয়া অবশ্য এই স্বরধ্বনিকে রূপায়িত করিতে পারে।' যেমন—জননী। 'জননী' এই শব্দের মধ্যে অক্ষর আছে তিনটি—জ+ন+নী। শরৎ—এই শব্দে অক্ষর আছে দুইটি—শ+রৎ। রাখাল—এই শব্দে অক্ষর দুইটি—রা+খাল্।

'বাংলা উচ্চারণের রীতিতে এক একটি অক্ষর হয় হ্রস্ব, না হয় দীর্ঘ। হ্রস্ব অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর দুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত হয়।'

মাত্রা বিচার করিবার জন্য বাংলা অক্ষরকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **স্বরান্ত অক্ষর** (২) **হলন্ত অক্ষর**। যে সকল অক্ষরের শেষে একটি স্বরধ্বনি থাকে, তাহাকে বলা হয় স্বরান্ত অক্ষর। যে সকল অক্ষরের শেষে একটি ব্যঞ্জন বা যুক্তস্বরের ধ্বনি থাকে, তাহাকে বলা হয় হলন্ত অক্ষর। উদাহরণ—

ডাকিছে দোয়েল/গাহিছে কোয়েল/তোমার কানন/সভাতে।
মাঝখানে তুমি/দাঁড়ায়ে জননী/শরৎকালের/প্রভাতে॥

দাঁড়ায়ে অনমী—এই পর্বে ৬টি স্বরান্ত অক্ষর আছে। ইহাদের মাত্রা সংখ্যা—৬।

শরৎকালের—এই পর্বটিতে রৎ ও লের—এই দুইটি রুদ্ধ অক্ষর। মোট মাত্রা—৬।

স্বরান্ত অক্ষর—বিবৃত (open) এ হলন্ত অক্ষর 'সংবৃত' (closed)। অক্ষরের মধ্যে আবার নানাধরণের শ্রেণীবিভাগ আছে। যথা—লঘু অক্ষর, গুরু অক্ষর, মৌলিক অক্ষর, যৌগিক অক্ষর, স্বভাব মাত্রিক অক্ষর, প্রভাব মাত্রিক অক্ষর।

লঘু অক্ষর—যে অক্ষর উচ্চারণকালে বাগযন্ত্রের স্বল্প আয়াস প্রয়োজন হয়, তাহকে লঘু অক্ষর বলা হয়। যেমন—খেলা, মেলা ইত্যাদি।

গুরু অক্ষর—যে অক্ষর উচ্চারণ কালে বাগযন্ত্রের অধিক আয়াসের প্রয়োজন হয়, তাহাকে গুরু অক্ষর বলে। যেমন—উত্তর, মন্দির প্রভৃতি।

মৌলিক অক্ষর—যে অক্ষরগুলিতে একটিমাত্র ধ্বনি থাকে, তাহাকে মৌলিক অক্ষর বলা হয়। যেমন—আলো, ভালো, হরি ইত্যাদি।

যৌগিক অক্ষর—যে অক্ষরগুলিতে একাধিক ধ্বনি থাকে, তাহাকে যৌগিক অক্ষর বলা হয়। যেমন—ঐ = অ + ই। ঔ = অ + উ।

স্বভাবমাত্রিক অক্ষর—যে অক্ষর অতি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করা যায়, তাহাকে স্বভাবমাত্রিক অক্ষর বলে। যেমন—সাজ, কাজ ইত্যাদি।

প্রভাব মাত্রিক অক্ষর—যে সকল অক্ষর বিশেষ রীতিতে জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাকে প্রভাবমাত্রিক অক্ষর বলে। যেমন—ভেরী, ব্যথা ইত্যাদি।

মাত্রা—

বাংলা ছন্দ বিশেষভাবে 'মাত্রাগত।'

মাত্রা প্রকৃতপক্ষে সময় বা কাল পরিমাণ। এক একটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময় অনুযায়ী অক্ষরের মাত্রা নির্ধারণ করা যায়। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'মাত্রা' সম্পর্কে বলিয়াছেন "বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। মাত্রার মূল তাৎপর্য duration বা কাল পরিমাণ। এক একটি অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে, তদনুসারে মাত্রা স্থির করা হয়।... সাধারণতঃ হ্রস্ব বা একমাত্রায় এবং দীর্ঘ বা দুই মাত্রায়—এই দুই শ্রেণীর অক্ষর গণনা করা হয়।...

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন অক্ষরের মাত্রা কত হইবে, তদ্বিষয়ে নির্দিষ্ট বিধি আছে, কিন্তু বাংলায় তত বাঁধাধরা নিয়ম নাই। অক্ষরের অবস্থান, ছন্দের প্রকৃতি ইত্যাদি অনুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়।"

'মাত্রা' সম্বন্ধে কয়েকটি মূলনীতি স্মরণ রাখা কর্তব্য।

(১) কোন পর্বাংশে একাধিক প্রভাব মাত্রিক অক্ষর থাকিবে না।

(২) একই পর্বাংশে স্বভাবমাত্রিক অক্ষরের সঙ্গে বিপরীত গতির অক্ষর বসিতে পারিবে না।

(৩) কবিতার 'স্বর' হিসাবে মাত্রা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) পর্বাঙ্গ বিভাগে যে রীতি আছে, মাত্রাবিচারে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) কোনরূপ সন্দেহ বা অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে ছন্দের আদর্শ অনুসারে মাত্রা নির্ধারণ করিতে হইবে।

চার মাত্রার ছন্দ—
জল পড়ে/পাতা নড়ে—৪+৪
পাঁচ মাত্রার ছন্দ—
গোপন রাতে/অচল গতে—৫+৫
নকর দ্বারে/এসেছে ধরে—৫+৫
ছয় মাত্রার ছন্দ—
নীরবে দেখাও/অঙ্গুলি তুলি—৬+৬
অকূল সিন্ধু/উঠেছে আকুলি—৬+৬
সাত মাত্রার ছন্দ—
পূরব মেঘ মুখে/পড়েছে রবি রেখা—৭+৭
তরুণ রথচূড়'/আর কি যায় দেখা—৭+৭

ছেদ

মানুষ একসঙ্গে অনর্গল একটানা কথা বলিতে পারে না। কথা বলিবার সময় মাঝে মাঝে থামিয়া বাগ্‌যন্ত্রকে বিশ্রাম দিতে হয়। 'যেখানে একটি বাক্যের শেষ হয়, সেখানে একটু বেশীক্ষণ থামিতে হয়; আর যেখানে একটি বাক্যাংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দ সমষ্টির শেষ হয়, সেখানে স্বল্পক্ষণ থামিতে হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ থামা বা উচ্চারণের বিরতিকে 'ছেদ বলে।'

ছেদ নানা ধরণের হইতে পারে। বাক্যের শেষে যেখানে বেশীক্ষণ থামিতে হয়, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ হয়। বাক্যের মধ্যে যেখানে এক একটি বাক্যাংশের শেষে স্বল্পসময় থামিতে হয়, সেখানে **অবিচ্ছেদ** বা **উপচ্ছেদ** হয়।

কাব্য হোক বা গদ্য হোক, ছেদ না দিয়া পড়িলে মূল বক্তব্য যথার্থ বোধগম্য হয় না। দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, ড্যাস প্রভৃতি দ্বারা ছেদের অবস্থান নির্দেশ করা হয়।

ছেদের উদাহরণ—

জাহাজের বাঁশী • অসীম বায়ুবেগে • থরথর করিয়া • কাঁপিয়া কাঁপিয়া • বাজিতেই লাগিল • •

যতি

'যতি'র অর্থ বিশ্রাম। কবিতার একটি চরণের যতটুকু অংশ এক একটি ঝোঁকে উচ্চারণ করা সম্ভব হয়, এবং সেই উচ্চারিত অংশের পর যে বিরতি আসিয়া পড়ে, তাহাকে 'যতি' বলা হয়। যেমন—

সাগর জলে। সিনান করি। সজল এলো। চুলে। এখানে 'সাগর জলে' বাক্যাংশের পর বাগযন্ত্র একটু বিশ্রাম করে বলিয়া এখানে 'যতি' পড়ে। এ ক্ষেত্রে ইহা 'অর্ধযতি'। 'চুলে' কথাটির পর বিশ্রাম দীর্ঘ বলিয়া এখানে 'পূর্ণযতি'।

'ছেদ ও যতি'র পার্থক্য

'ছেদ ও যতি'—উভয়েই মূলত বাগযন্ত্রের বিশ্রামার্থে প্রযুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

'ছেদ' প্রধানত অর্থ নির্ভর। বাক্যের অর্থ অনুযায়ী কবিতার চরণে ছেদ পড়ে।

'যতি' ঝোঁক নির্ভর। একভাবে কিছুক্ষণ পাঠের পর বাগযন্ত্র যখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে, তখনই 'যতি' পড়ে। 'যতি' পাতের সঙ্গে অর্থের কোন সম্পর্ক নাই।

পর্ব

কবিতার প্রথম পঙক্তি হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী যতি পর্যন্ত অংশকে **পর্ব** বলা হয়। পর্বের সাহায্যেই নানা ধরণের কাব্যের ছন্দ নির্মিত হয়।

'সাধারণত পর্ব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। শব্দ বলিতে মূল শব্দ বা বিভক্তি বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।' এক যতি হইতে অন্য যতি পর্যন্ত চরণাংশের, নাম পর্ব। যেমন—

সকাল বেলা। কাটিয়া গেল। বিকাল নাহি। যায়। এখানে চরণটি চারটি পর্বে বিভক্ত হইয়াছে।

পর্বাঙ্গ

পর্ব যখন ছোট ছোট কয়েকটি ভাগে বিভক্ত থাকে, তাহাকে **পর্বাঙ্গ** বলে।

আগের উদাহরণে 'সকাল বেলা' এই পর্বটি গঠিত হইয়াছে 'সকাল' ও 'বেলা' কথাটি লইয়া। এই দুইটি পর্বাঙ্গ।

চরণ

'চরণ' বলিতে কবিতার একটি পঙক্তি বুঝানো হয়। কিন্তু ছন্দোবিজ্ঞানে চরণ বলিতে পূর্ণ যতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি পর্বের সমষ্টি বুঝায়। যেমন—

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি
পূজার সময় এল কাছে।
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই
আনন্দে দুহাত তুলি নাচে।

এখানে পঙক্তি চারটি থাকিলেও 'চরণ' আছে দুইটি। বাংলা কাব্যে সাধারণত দুই হইতে পাঁচ পর্বের চরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্তবক

দুইটি কিংবা ইহার বেশী সংখ্যক চরণ যখন নির্দিষ্ট একটি আকৃতি লইয়া বিন্যস্ত হয়, তাহাকে চরণগুচ্ছ বা স্তবক বলে। যেমন—

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

শ্বাসাঘাত

কাব্য পাঠকালে বিশেষ কোন পদ শব্দ বা অক্ষরের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার নাম 'শ্বাসাঘাত'। এখানে সেই পদ, শব্দ, বা অক্ষরের উপর শ্বাসকার্যের ক্রিয়া বেশী হয় বলিয়া ইহার এই নাম। যেমন—

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যাও।

এখানে 'ঘুম' শব্দটির উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।

শ্বাসাঘাতের ফলে উচ্চারণ দ্রুত হয়। একই পর্বাংশে একাধিক শ্বাসাঘাত পড়ে না।

ছন্দোলিপি

['ছন্দোলিপি' করিতে হইলে পর্ব, চরণ, স্তবক, রীতি ও লয় নির্ণয় করিতে হইবে। প্রথমে কবিতাটিকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করিয়া মাত্রা নির্ণয় করিতে হইবে। তারপর চরণ ও স্তবকের বৈশিষ্ট্য লিখিতে হইবে। ইহার পর জাতি ও লয় নির্ণয় করিতে হইবে।]

। ॥ । ॥ । । । । ॥ ॥ ॥ । । ॥

(১) ভূতের মতন / চেহারা যেমন / নির্বোধ অতি / ঘোর

। । । । ॥ ॥ । । ॥ ॥ । । ॥ ॥

যা কিছু হারায় / গিন্নি বলেন / কেষ্টা বেটাই / চোর।

পর্ব—ষাণ্মাত্রিক

চরণ—চতুষ্পদিক

স্তবক—দুই মিত্রাক্ষর চরণযুক্ত

রীতি—ধ্বনি প্রধান

লয়—বিলম্বিত

(২) মন্দির : বাহির / কঠিন ক : পাট (৮+৭)

চলইতে : শঙ্কিল / পঙ্কিল বাট। (৮+৭)

পর্ব—অষ্ট মাত্রিক

চরণ—দ্বি পর্বিক —অপূর্ণপদী

স্তবক—সমপদী—দুই চরণ মিত্রাক্ষর

রীতি—ধ্বনি প্রধান

লয়—বিলম্বিত।

(৩) শঙ্কিত / নদীজল / ঝিলিমিলি / করে

জ্যোৎস্নায় / ঝিকিমিকি / বালুকায় / পরে।

পর্ব—চতুঃমাত্রিক

চরণ—চতুষ্পর্বিক অপূর্ণপদী

স্তবক—সমপদী—দুই চরণ মিত্রাক্ষর

রীতি—ধ্বনি প্রধান

লয়—বিলম্বিত

(৪) শরৎ ডাকে / ঘর ছাড়ানো ডাকা

কাজ ভোলানো সুরে।

চপল করে / হাঁসের দুটি পাখা

ওড়ায় তারে দূরে॥

পর্ব—পঞ্চ ও সপ্তমাত্রিক

চরণ—ত্রিপর্বিক

স্তবক—সমপদী—দুই চরণ মিত্রাক্ষর

রীতি—ধ্বনি প্রধান

লয়—বিলম্বিত

(৫) ওরে পান্থ চলো পথে / পথে বন্ধু আছে (৮+৬)

একা বসে ম্লান মুখে / সে যে সঙ্গ যাচে (৮+৬)

পর্ব—অষ্ট মাত্রিক

চরণ—দ্বিপদী পর্বিক—অপূর্ণ

স্তবক—সমপদী—দুই চরণ মিত্রাক্ষর
রীতি—তান প্রধান
লয়—বিলম্বিত

(৬) দেখ দ্বিজ মনসিজ / জিনিয়া মুরতি। (৮+৬)
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র / পরশয়ে শ্রুতি॥ (৮+৬)

পর্ব—অষ্ট মাত্রিক
চরণ—দ্বি পর্বিক—অপূর্ণপদী
স্তবক—সমপদী—দুই চরণ মিত্রাক্ষর
রীতি—তান প্রধান
লয়—ধীর

(৭) নমি তোমা নরদেব / কি গর্ব গৌরবে। (৮+৬+৬)
দাঁড়ায়েছো তুমি
সর্বাঙ্গে প্রভাত রশ্মি / শিরে চূর্ণ মেঘ (৮+৬+৬)
পদে শষ্পভূমি।

পর্ব—অষ্ট মাত্রিক মিশ্র
চরণ—ত্রি পর্বিক
স্তবক—সমপদী—দুই চরণ মিত্রাক্ষর
রীতি—তান প্রধান
লয়—ধীর

(৮) ছিল আশা মেঘনাদ / মুদিব অন্তিমে
এ নয়ন দ্বয় আমি / তোমার সম্মুখে;
সঁপি রাজ্য ভার পুত্র / তোমায় করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি / বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা / সে সুখ আমারে।

পর্ব—অষ্ট মাত্রিক
চরণ—দ্বি পর্বিক—অপূর্ণপদী

স্তবক—অমিত্রাক্ষর—সমপদী
রীতি—তান প্রধান
লয়—ধীরে।

(৯) দখিন হাওয়া / বললে তারে / উড়িয়ে নে যাই / চল্
গোলাপী রং / পরীর দেশে / চালবি পরি / বল ;
[illegible]র খাটে / মণির মালায় / তারার বাতি / জেলে
গাঁথবে তোমায় / চিকণ হারে / নীলার পালায় / ঢেলে

পর্ব—চতুর্মাত্রিক
চরণ—চতুষ্পর্বিক—অপূর্ণপদী
স্তবক—সমপদী—মিত্রাক্ষর—
রীতি—শ্বাসাঘাত প্রধান
লয়—দ্রুত

(১০) বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদেয় এলো / বান।
শিবঠাকুরের / বিয়ে হলো / তিন কন্যা / দান ॥
এক কন্যা / রাঁধেন বাড়েন / এক কন্যা / খান।
এক কন্যা / গোঁসা করে / বাপের বাড়ী / যান ॥

পর্ব—চতুর্মাত্রিক
চরণ—চতুষ্পর্বিক—অপূর্ণপদী
স্তবক—সমপদী মিত্রাক্ষর
রীতি—শ্বাসাঘাত প্রধান
লয়—দ্রুত

(১১) দিনের আলো / নিভে এলো / সূর্যি ডোবে / ডোবে।
মেঘের পরে / মেঘ জমেছে / চাঁদের লোভে / লোভে।

পর্ব—চতুর্মাত্রিক
চরণ—চতুষ্পর্বিক—অপূর্ণপদী
স্তবক—সমপদী মিত্রাক্ষর
রীতি—শ্বাসাঘাত প্রধান
লয়—দ্রুত

(১২) খোকা যাবে / মাছ ধরতে / ক্ষীর নদীর কূলে
ছিপ নিল / কোলা ব্যাঙে / মাছ নিয়ে গেল / চিলে

পর্ব—চতুর্মাত্রিক
চরণ—চতুষ্পর্বিক
স্তবক—দুই চরণে মিত্রাক্ষর
রীতি—শ্বাসাঘাত প্রধান
লয়—দ্রুত

ছন্দোলিপি/অনুশীলনী

(১) পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥

(২) একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান।
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান॥

(৩) কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

(৪) বিনুর বয়স তেইশ যখন রোগে ধরল তারে
ওষুধে ডাক্তারে।

(৫) সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃত ভাষিণি,
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষ কুলনিধি
রাঘবারি ?

(৬) কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥

(৭) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

(৮) গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে।
পিলে জ্বর আর পাণ্ডুরোগে॥

(৯) শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্মাইয়া পর্ণশালা॥
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে লক্ষ্মণ বাহির॥

(১০) হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

(১১) ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেবর॥

(১২) দুর্গম-গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!